আবু সাঈদ চৌধুরী

প্রবাসে মুক্তিযুদ্ধের দিনগুলি

বাংলাদেশের গৌরবোজ্জ্বল মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষে আন্তর্জাতিক জনমত সংগঠনে বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী মুখ্য ভূমিকা পালন করেন। বাঙালী জাতির মহান সন্তান বিচারপতি চৌধুরী মুক্তিযুদ্ধের সময়ে লন্ডনে তাঁর সদর দফতর স্থাপন করে পৃথিবীর দেশে দেশে প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারের প্রতিনিধিরূপে ছুটে বেড়িয়েছেন—সম্পন্ন করেছেন এক বিশাল কর্মযজ্ঞ। শত্রুরা তাঁর প্রাণের প্রতি হুমকি প্রদর্শন করেছে—তাঁর প্রাণহানির আশঙ্কায় স্কটল্যান্ড ইয়ার্ড সর্বক্ষণ তাঁকে প্রহরা দিয়েছে। কিন্তু এই অবিচলিত শান্ত ও সাহসী মানুষটির ছিল একটিই কথা : 'লন্ডনের রাস্তায় আমার শবদেহ পড়ে থাকবে তবু পাকিস্তানের সঙ্গে আপোস করে দেশে ফিরব না।'

মুক্ত স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের পর বাংলাদেশের দ্বিতীয় রাষ্ট্রপতির দায়িত্বভার অর্পণ করা হয় তাঁকে। প্রবাসে মুক্তিযুদ্ধের দিনগুলি গ্রন্থে তিনি বিবৃত করেছেন প্রবাসে একাত্তরের দিনগুলির স্মৃতিকথা। তাঁর অকপটতা ও সারল্য দিয়ে নির্মিত এই স্মৃতিকথা।

BDT 250.00 | INR 235.00 | USD 8.00

বাংলাদেশের দ্বিতীয় রাষ্ট্রপতি **আবু সাঈদ চৌধুরী**'র জন্ম ১৯২১ সালে, টাঙ্গাইলের নাগবারী গ্রামে। পিতা আবদুল হামিদ চৌধুরী পূর্ব পাকিস্তান আইন পরিষদের স্পীকার ছিলেন। কলিকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে স্নাতক ডিগ্রি লাভের পর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইতিহাসে এম এ ও আইন শাস্ত্রে স্নাতক ডিগ্রি অর্জন করেন। ১৯৪৬ সালে নিখিল ভারত ছাত্র ফেডারেশন বৃটেন শাখার সভাপতি ছিলেন। লন্ডনের লিংকন্স ইন্‌ হতে বার-এট-ল ডিগ্রি লাভের পরে হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দীর জুনিয়র হিসেবে পেশাগত জীবনের সূচনা। তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের এ্যাডভোকেট জেনারেল, ঢাকা হাইকোর্টের বিচারপতি এবং কেন্দ্রীয় বাংলা উন্নয়ন বোর্ডের সভাপতি এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের দায়িত্ব পালন করেন।

ছাত্রদের উপরে গুলীবর্ষণের প্রতিবাদে শেষোক্ত দায়িত্ব থেকে তিনি মুক্তিযুদ্ধের প্রাক্কালে পদত্যাগ করেন। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারের প্রতিনিধিরূপে বাংলাদেশের স্বাধীনতার সপক্ষে আন্তর্জাতিক জনমত গড়ে তোলায় মুখ্য ভূমিকা পালন করেন। বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে সর্বোচ্চ দেশীকোত্তম উপাধি এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সম্মানসূচক ডক্টর-অফ-ল ডিগ্রি-তে ভূষিত করে। ১৯৭৩ সালের ডিসেম্বর মাসে রাষ্ট্রপতির পদ ত্যাগ করার পর থেকে তিনি বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ফোরামে বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব করেন। ১৯৮৭ সালের ২রা আগস্ট তিনি লোকান্তরিত হন।

ISBN 978 984 506 072 1

দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড
রেড ক্রিসেন্ট হাউস
৬১ মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা
ঢাকা ১০০০, বাংলাদেশ
ফোন: (+৮৮০২) ৯৫৬৫৪৪১, ৯৮৫২১৮৯, ৯৮৫২১৯০
মোবাইল: ০১৯১৭৭৩৩৭৪১
E-mail: info@uplbooks.com.bd
Website: www.uplbooks.com.bd

সপ্তম মুদ্রণ ২০১৬
প্রথম প্রকাশ ১৯৯০

প্রচ্ছদ
সমর মজুমদার

ISBN 978 984 506 072 1

প্রকাশক: মহিউদ্দিন আহমেদ, দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, রেড ক্রিসেন্ট হাউস, ৬১ মতিঝিল বা/এ, ঢাকা ১০০০। মুদ্রণ: এএমএস এন্টারপ্রাইজ, ২৬২/ক ফকিরাপুল, ঢাকা-এর তত্ত্বাবধানে একতা অফসেট প্রেস, ১১৯ ফকিরাপুল, ঢাকা থেকে মুদ্রিত।

Probashey Muktijuddher Dinguli (The Days of Liberation War in exile), by Abu Sayeed Chowdhury, published by Mohiuddin Ahmed, The University Press Limited, Red Crescent House, 61 Motijheel C/A, Dhaka, Bangladesh.

উৎসর্গ

মুক্তিযুদ্ধে শহীদ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের
শিক্ষক, ছাত্র ও কর্মচারীবৃন্দের
পবিত্র স্মৃতির উদ্দেশে

সূচিপত্র

ছবি পরিচিতি

প্রকাশকের কথা

মুক্তিযুদ্ধ যে কোন জাতির জীবনে একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। এমন ঘটনা বারবার সংঘটিতও হয় না। তাই যে কোন জাতির মুক্তিযুদ্ধে অংশ গ্রহণ করা ব্যক্তি বিশেষের জন্যে হয়ে ওঠে একটি বিরল সৌভাগ্যের ব্যাপার। আবার যোগদানকারী সেই ব্যক্তি যদি মুক্তিযুদ্ধে অন্যতম নিয়ামকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হন, তবে তিনি প্রতিষ্ঠা পান ঐতিহাসিক চরিত্র হিসেবে।

বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী এমনিতেও বাংলাদেশের একজন প্রকৃত সজ্জন হিসেবে সর্বত্র সমাদৃত ব্যক্তিত্ব। তাঁর জীবন যেমন বর্ণাঢ্য, তেমনি পেশা, ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে তাঁর ছিল অনন্য কৃতিত্বপূর্ণ ভূমিকা। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি সংকট সময়ে উপাচার্য হিসেবে যোগদান করে ঐ পদকে তিনি সম্মানিত করেছিলেন শুধু নয়, শিক্ষক-শিক্ষার্থীদেরও গভীর আস্থার আশ্রয়স্থল হয়ে উঠেছিলেন। ব্যক্তিগত জীবনে এই নিরীহ, নির্বিবাদী, নিরহংকারী সজ্জন পণ্ডিত ব্যক্তিটিও বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে একজন অমিতবিক্রম আপোষহীন যোদ্ধায় রূপান্তরিত হয়েছিলেন। অত্যন্ত প্রতিকূল পরিস্থিতিতে ব্যক্তিগত সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি তোয়াক্কা না করে, দিবারাত্রি পরিশ্রম করে, বিদেশের মাটিতে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকে সংগঠিত করেছিলেন, বাংলাদেশের আপামর জনতার মুক্তির আকাঙক্ষা এবং বাংলাদেশে পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীর নিষ্ঠুর নিপীড়নের বিষয়টি বিশ্বের দরবারে অত্যন্ত সাফল্যের সঙ্গে তুলে ধরেছিলেন।

বিচারপতি চৌধুরীর এই আলেখ্যটি নানা কারণে আমাদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দলিল। এতে একাত্তরে প্রবাসকালীন তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের ঘটনাটিই বিবৃত নয়, এতে বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পেছনে নানা বিষয়, বহু পাত্র-পাত্রীর সন্ধান পাওয়া যায়। এমন অনেক ব্যক্তির প্রসঙ্গ এখানে উঠে এসেছে, যাঁদের ত্যাগ-তিতীক্ষার কথা জেনে শ্রদ্ধায় আমাদের মস্তক আপনা থেকেই অবনত হয়ে আসে। আজ জাতির এই ক্রান্তিলগ্নে বিভিন্ন মহল থেকে মুক্তিযুদ্ধের গুরুত্বকে হ্রাস করে দেখানোর একটা প্রচেষ্টা দেখা যায়। এই মুহূর্তে এই রচনাটি মুক্তিযুদ্ধ ও মুক্তিযুদ্ধের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বহু লব-কুশকে চিনতে ও চেনাতে সাহায্য করবে।

বিচারপতি চৌধুরীর এই রচনাটি *দৈনিক সংবাদে* ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়ে আসছিল, কিন্তু তাঁর আকস্মিক মৃত্যুতে তাতে ছেদ পড়ে। আমাদের অনুমান যে, বিচারপতি চৌধুরী তাঁর এই রচনাটিকে প্রায় সমাপ্তির কাছাকাছি এনে দাঁড় করিয়েছিলেন। অপরদিকে তিনি যতখানি লিখে যেতে পেরেছিলেন তার ঐতিহাসিক মূল্যও কম নয়। এসব বিচারে এ বইটি প্রকাশ করতে পেরে আমরা গর্ববোধ করছি।

বইটির পাণ্ডুলিপি প্রস্তুতিতে বাংলা একাডেমীর অন্যতম পরিচালক জনাব শামসুজ্জামান খানের সহায়তা আমরা পেয়েছি। *দৈনিক সংবাদের* সাহিত্য বিষয়ক সম্পাদক জনাব আবুল

হাসনাত আমাদের নানাভাবে সাহায্য করেছেন। বাংলাদেশ ফিল্ম আরকাইভস্-এর পরিচালক শিল্পী ও মুক্তিযোদ্ধা জনাব আবদুর রউফের কাছ থেকে কয়েকটি বিরল ফটোগ্রাফ আমরা পেয়েছি। আমরা এই সাহায্য ও সহযেগিতার জন্য তাঁদের অকুণ্ঠ কৃতজ্ঞতা জানাই।

আমাদের বিবেচনায় বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী তাঁর জীবদ্দশায় সকল দল, মত ও পথের উর্ধ্বে একজন প্রকৃত সৎ বুদ্ধিজীবীর স্তরে উত্তীর্ণ হতে সমর্থ হয়েছিলেন। তাঁর এই রচনাটির অন্যতম বৈশিষ্ট্য এই যে, তিনি তাঁর প্রতিপক্ষ সম্পর্কে কোন কটু মন্তব্য করতে সর্বদাই নিজেকে বিরত রেখেছেন। সর্বত্র নিজের ভূমিকার বর্ণনায় তিনি সংক্ষিপ্ত, নির্মোহ ও নির্লিপ্ত। আত্মজীবনীমূলক রচনায় এই নিরাসক্তি দুস্প্রাপ্য। সাহিত্যমূল্য হিশেবেও এই রচনাটির পাওনা মোটেও নগণ্য হতে পারেনা।

মহিউদ্দিন আহমেদ

কৃতজ্ঞতা

কোনো গ্রন্থের ঋণ স্বীকারের দায়ভার সম্পূর্ণ লেখকের নিজের। তাঁর অবর্তমানে স্ত্রী হিসেবে এই দায়িত্ব পালন করতে হচ্ছে আমাকে, যা খুবই কঠিন।

লেখক স্মৃতি নির্ভর হয়ে গ্রন্থটি রচনা করেছেন। ফলে প্রবাসে মুক্তিযুদ্ধের ন'মাসের ঘটনাবলী তথ্যভিত্তিক উপস্থিত করার জন্যে তাঁকে অনেকের সহযোগিতা গ্রহণ করতে হয়েছে। বিশেষ করে একাত্তরে মুক্তিযুদ্ধের সেই উত্তাল সময়ে বহিঃবিশ্বে বাঙালীদের কর্মতৎপরতার ওপর শেখ আবদুল মান্নানের লিখে রাখা নোট থেকে লেখক যথেষ্ট সাহায্য নিয়েছেন। আমীর আলী, আবদুল মতিন, আবদুল গাফ্ফার চৌধুরী, আসহাবুল হক (প্রাক্তন গণপরিষদ সদস্য), এ এইচ মাহমুদ আলী (রাষ্ট্রদূত), মহিউদ্দন আহম্মদ (কূটনীতিক), এনায়েতউল্লা (ব্রাডফোর্ড), ডঃ মোশাররফ হোসেন জোয়ার্দার, ব্যারিষ্টার শামসুল মোর্শেদ, কাজী রেজাউল হাসান, রাজিউল হাসান রঞ্জু প্রমুখ মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক বিভিন্ন গ্রন্থ ও উল্লেখযোগ্য পত্র-পত্রিকা প্রদান করে সহযোগিতা করেছেন।

আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধে বহিঃবিশ্বে বাঙালীরা যে গৌববোজ্জ্বল ভূমিকা পালন করেছেন তা সবার সামনে তুলে ধরার ব্যক্তিগত দায়বদ্ধতা ও প্রবল আত্মতাগিদের ফসল *প্রবাসে মুক্তিযুদ্ধের দিনগুলি*। গ্রন্থটি রচনায় লেখককে তাঁর ব্যক্তিগত বন্ধু ও শুভার্থীদের মধ্যে সবচেয়ে অনুপ্রাণিত করেছেন আবু সাইদ মুহম্মদ আবদুর রউফ, গোলাম মহিউদ্দীন চৌধুরী, মাহবুব আলী খান চৌধুরী, বেগম লুলু বিলকিস বানু, সুলতান শরীফ, ড. আশরাফ সিদ্দিকী, প্রফেসর কে এম মহিসন, ড. গওহর রিজভী, অধ্যাপক হারুনূর রশীদ, মাহবুব তালুকদার, শওকত আনোয়ার, মইনুল হাসান, মুজিবুর রহমান চৌধুরী, চৌধুরী হাবিবুর রহমান সিদ্দিকী, ব্যারিষ্টার শাহ্ ফেরদৌস এবং এ. জেড এম হায়দার।

গ্রন্থকারে প্রকাশের পূর্বে লেখাগুলো *দৈনিক সংবাদ*-এ ধারাবাহিকবাবে প্রকাশিত হয়। এই সময় *সংবাদ*-এর সাহিত্য সম্পাদক আবুল হাসনাত লেখককে নিরন্তর তাগাদা দিয়েছেন। এই গ্রন্থের আঙ্গিক রূপায়ণে সহযোগিতা করেছেন শামসুজ্জামান খান।

প্রফেসর আনিসুজ্জামান গ্রন্থটির ভূমিকা লিখে পারিবারিকভাবে আমাদের সবাইকে ঋণী করেছেন। অনুলিখনে সাংবাদিক আহমেদ মুসা লেখককে বিশেষভাবে সাহায্য করেছেন। নিরলস শ্রম ও আন্তরিকতার সঙ্গে শেষাংশের ঘটনাপঞ্জী তৈরী করে দিয়েছেন স্নেহাস্পদ ড. শামসুল ইসলাম খান।

স্নেহভাজন মাহবুব-উল আজাদ পাণ্ডুলিপি বিন্যাস ও মূল্যবান আলোকচিত্র সরবরাহ করে গ্রন্থটির সৌন্দর্য বৃদ্ধি করেছেন।

ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহিউদ্দিন আহমেদ এগিয়ে না এলে গ্রন্থটি বোধ হয় এতো দ্রুত প্রকাশ করা সম্ভব হতো না।

এর বাইরেও গ্রন্থটি প্রকাশে যাঁরা নানাভাবে সহযোগিতা করেছেন এবং যে সব প্রেস কর্মচারী নীরবে কাজ করেছেন সবাইকে গভীর কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

একটি জাতির রক্তাক্ত অভ্যুদয়ের পেছনে প্রবাসী বাঙালীদের অবদান কতখানি–এই সত্য জানার আগ্রহ নিয়ে আজ ও আগামী প্রজন্মের পাঠক যখন গ্রন্থটি হাতে তুলে নেবেন তখন মনে হবে লেখকের শ্রম সার্থক হয়েছে।

রোসেনডেইল
১১৬, কাজী নজরুল ইসলাম এ্যাভিনিউ
ঢাকা, ফেব্রুয়ারী ১৯৯০

খুরশীদ চৌধুরী

ভূমিকা

বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরীর নাম বাংলাদেশের ইতিহাসের অন্তর্গত হয়ে আছে। এই ইতিহাসসৃষ্টির অনেকখানি ভার তিনি নিজের হাতে তুলে নিয়েছিলেন। সে-সময়ে এই দায়িত্বগ্রহণের কোনো বাধ্যবাধকতা তাঁর ছিল না, ছিল না সাফল্যলাভের নিশ্চয়তা, ছিল না সামনে কোনো উজ্জ্বল ভবিষ্যতের হাতছানি। শুধু দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে, কর্তব্যবোধে পরিচালিত হয়ে, পাকিস্তানের অমানুষিক বর্বরতায় ক্ষুব্ধ হয়ে এই দায়িত্ব তিনি স্বেচ্ছায় গ্রহণ করেছিলেন। বিদেশ-বিভূঁয়ে সে দিন তাঁর কোনো সহায়-সম্বল ছিল না, ছিল প্রখর আত্মমর্যাদাবোধ ও গভীর প্রত্যয়। প্রবাসী বাঙালিদের সংগঠিত করেছিলেন তিনি, বিদেশে জনমত গঠন করেছিলেন, প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন প্রবাসে গঠিত বাংলাদেশ সরকারের। তাঁর সেই ভূমিকাই তাঁকে ইতিহাসে স্থায়ী আসন দিয়েছে।

অবশ্য একদিক দিয়ে দেখতে গেলে, আবু সাঈদ চৌধুরী এক ধরনের বিশিষ্টতা অর্জন করেছিলেন আগেই। তার খানিকটা তিনি লাভ করেছিলেন পারিবারিক সূত্রে। টাঙ্গাইলের এক সুপরিচিত পরিবারে তাঁর জন্ম হয় ১৯২১ সালের ৩১শে জানুয়ারি। তাঁর পিতা আবদুল হামিদ চৌধুরী পরে পূর্ব পাকিস্তান আইন পরিষদের স্পীকার নির্বাচিত হয়েছিলেন। আবু সাঈদ চৌধুরী মেধাবী ছাত্র ছিলেন, পাঠ্যাতিরিক্ত বিষয়েও তাঁর আগ্রহ ছিল যথেষ্ট। ১৯৩৯ সালে তিনি কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজ ছাত্র ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। ১৯৪০ সালে তিনি প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে বি এ পাশ করেন। পরে তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইতিহাসে এম এ এবং বি এল ডিগ্রি লাভ করেন। সম্ভবতঃ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র থাকার সময়েই তিনি একদিকে নিখিল বঙ্গ মুসলিম ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন, অন্যদিকে 'রূপায়ণ' নামে একটি সাহিত্যপত্র সম্পাদনা করেন। ১৯৪৭ সালে তিনি লন্ডনের লিংকনস্ ইন থেকে ব্যারিস্টারী পাস করেন। লন্ডনে পাঠদ্দশায় তিনি ছিলেন নিখিল ভারত মুসলিম ছাত্র ফেডারেশনের ব্রিটেন শাখার সভাপতি।

দেশে ফিরে এসে আবু সাঈদ চৌধুরী আইনব্যবসা শুরু করেন। ১৯৬০-৬১ সালে তিনি ছিলেন পূর্ব পাকিস্তানের অ্যাডভোকেট জেনারেল। ১৯৬১ সালে তিনি ঢাকা হাইকোর্টের বিচারপতি নিযুক্ত হন। সেই সঙ্গে তিনি অতিরিক্ত দায়িত্বও পালন করেন। ১৯৬৩ থেকে ১৯৬৪ সাল পর্যন্ত তিনি ছিলেন কেন্দ্রীয় বাংলা উন্নয়ন বোর্ডের সভাপতি। ১৯৬৯ সালে ব্যাংককে অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় বিশ্ব-বিচারক সম্মেলন ও আইনের মাধ্যমে শান্তি প্রতিষ্ঠা সম্পর্কিত চতুর্থ বিশ্ব সম্মেলনে তিনি পাকিস্তান প্রতিনিধিদলের নেতারূপে যোগ দেন। ১৯৬৯ সালের নভেম্বর মাসে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যায়ের উপাচার্য নিযুক্ত হন। ১৯৭১ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে জাতিসংঘের মানবাধিকার কমিশনের অধিবেশনে যোগ দিতে জেনেভায় গমন করেন।

তিনি যখন জেনেভায় তখন স্বদেশে আমাদের ইতিহাসের সর্বাধিক গৌরবময় ও সর্বাপেক্ষা নিষ্ঠুর অধ্যায়ের প্রথম বর্ণগুলির বিন্যাস শুরু হয়েছে। কর্তব্য স্থির করতে এক মুহূর্ত বিলম্ব হয়নি বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরীর। ১৫ মার্চ তারিখে প্রাদেশিক শিক্ষা-সচিবকে পত্র দিয়েছেন :

> আমার নিরস্ত্র ছাত্রদের ওপর গুলীচালনার পর আমার ভাইস চ্যান্সেলর থাকার কোন যুক্তিসংগত কারণ নেই। তাই আমি পদত্যাগ করলাম।

কিন্তু ঘটনাপ্রবাহ বা তাঁর নিজের উদ্যোগ এখানেই থেমে থাকতে পারেনি।

এরপর এসেছে ২৫ মার্চের কালরাত্রি। সে খবর তিনি পান পরের দিন সকালবেলায় বিবিসি বেতারের প্রতি ঘণ্টায় সম্প্রচারিত সংবাদে। খানিক পরই মানবাধিকার কমিশনের সভায় উপস্থিত হয়ে বিবৃত করলেন বিবিসিতে প্রচারিত সংবাদের কথা। বিদায় গ্রহণের অনুমতি চেয়ে ব্যক্ত করলেন লন্ডনে ফিরে যাওয়ার সংকল্প এবং সম্ভবপর হলে সেখান থেকে ঢাকায়।

তখনো তিনি জানতেন না যে, লন্ডনে তাঁর জন্যে কত কাজ অপেক্ষা করছিল এবং সে কারণে ঢাকায় ফিরে আসা তাঁর বিলম্বিত হবে। লন্ডনে পৌঁছোনোর পর কয়েকজন বাঙালির সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ স্থাপিত হয় এবং তারপর ব্রিটিশ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে গিয়ে ঢাকা থেকে সেখানে পাঠানো টেলেক্স পড়ে জানতে পারেন সমুদয় সংবাদ। ক্ষোভে, দুঃখে, বেদনায়, অপমানে বিহ্বল বিচারপতি বললেন ব্রিটিশ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের দক্ষিণ এশিয়া বিভাগের প্রধান ইয়ান সাদারল্যান্ডকে :

> এই মুহূর্ত থেকে পাকিস্তান সরকারের সঙ্গে আমার আর কোন সম্পর্ক রইল না। আমি দেশ থেকে দেশান্তরে যাব আর পাকিস্তানী সৈন্যদের এই নিষ্ঠুরতা-নির্মমতার কথা বিশ্ববাসীকে জানাব।

পরবর্তী নয় মাসে তিনি তাই করেছিলেন এবং আরো কিছু বেশি।

লন্ডনে ঘাঁটি করে মুক্তিযুদ্ধের দিনগুলিতে তিনি এবং তাঁর সহকর্মীরা প্রবাসে কী করেছিলেন, তার বিবরণ আছে বর্তমান গ্রন্থে। এর থেকে বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরীর কাজের দু'টি ধারা উপলব্ধি করা যায়। একদিকে যুক্তরাজ্যের নানা দলমতে বিভক্ত বাঙালি সমাজকে তিনি ঐক্যবদ্ধ করেছিলেন, মুক্তিসংগ্রামের জন্যে প্রয়োজনীয় সাংগঠনিক কাঠামোও গড়ে তুলেছিলেন। তেমনি করে প্রত্যয় ও ঐক্যের মন্ত্রে তিনি উদ্বুদ্ধ করেছিলেন ইউরোপ ও আমেরিকার প্রবাসী বাঙালিদের। ২৩ এপ্রিল তিনি প্রবাসে বাংলাদেশ সরকারের বিশেষ দূত নিযুক্ত হন এবং ২৭ আগস্ট লন্ডনে বাংলাদেশের দূতাবাস স্থাপন করেন। এর ফলে তাঁর সমগ্র কর্মধারাও একটি প্রাতিষ্ঠানিক ও প্রতিনিধিত্বমূলক রূপ লাভ করে। তাঁর কর্মের দ্বিতীয় ধারায় বাংলাদেশের প্রতিনিধিরূপে তিনি যুক্তরাজ্য ছাড়াও যুক্তরাষ্ট্র, নেদারল্যান্ড, পশ্চিম জার্মানী, সুইজারল্যান্ড, নরওয়ে, সুইডেন, ফিনল্যান্ড ও ডেনমার্কে গিয়ে সেসব দেশের সরকার, জনপ্রতিনিধি, বিচারক এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মকর্তা ও শিক্ষকদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করেন। তিনি সোভিয়েত ইউনিয়ন ও পূর্ব ইউরোপের দেশগুলির দূতাবাস এবং সাইপ্রাস, যুগোশ্লাভিয়া ও আয়ার্ল্যান্ডের রাষ্ট্রদূতদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। ব্রিটিশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী ও

মারিশাসের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনা করেন এবং আন্তর্জাতিক রেডক্রস, অ্যাসোসিয়েশন অফ কমনওয়েলথ ইউনিভার্সিটিজ, অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল, সোশালিস্ট ইন্টারন্যাশনাল, ইন্টারন্যাশনাল কমিশন অফ জুরিস্ট ও কমনওয়েলথ সচিবলয়ের মতো আন্তর্জাতিক সরকারী ও বেসরকারী সংগঠনের কাছে বাংলাদেশের পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করেন। সেপ্টেম্বর মাসে তিনি পনেরো সদস্যবিশিষ্ট বাংলাদেশ প্রতিনিধিদলের নেতারূপে জাতিসংঘে গমন করেন বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামের পক্ষে প্রচার চালাতে। জাতিসংঘ এই প্রচারকার্য চালাবার সময়েই বাংলাদেশের মুক্তিলাভের সংবাদ সেখানে পৌঁছোয়।

আবু সাঈদ চৌধুরী মুক্তিযুদ্ধের দিনগুলিতে যা করেছিলেন, তা ছিল দুরূহ ও আয়াসসাধ্য। একথা ঠিক যে, বাঙালি কূটনীতিক, রাজনৈতিক কর্মী ও সাধারণ মানুষের অনেকের সহায়তালাভ তাঁর কাজে খুব সহায়ক ছিল। এর মধ্যে তিনি শেখ আবদুল মান্নানের কথা বিশেষভাবে বলেছেন। এমন কি, তিনি যে তাঁর সম্পর্কে যথেষ্ট লিখতে পারেননি বর্তমান রচনায়, সেকথা দুঃখের সঙ্গে তাঁর পরিবারের সদস্যদের জানিয়েছিলেন। বইটি পরিমার্জনার সুযোগ পেলে তাঁর কথা আরো বেশি করে বলতেন। বাঙালিদের কেউ দূর ভেনেজুয়েলা থেকে তাঁকে অর্থসাহায্য করতে চেয়েছেন। কেউ লন্ডনে উপস্থিত হয়ে মুখোমুখী তেমন প্রস্তাব দিয়েছেন। বিদেশী কূটনীতিক, রাজনীতিবিদ ও বুদ্ধিজীবীর অনেকের সমর্থন তিনি পেয়েছিলেন। এক ইংরেজ অধ্যাপক বিনা ভাড়ায় তাঁকে নিজের বাসা ছেড়ে দিতে চেয়েছিলেন, বাংলাদেশের হয়ে কাজ করতে এগিয়ে এসেছিলেন অনেকে। অন্যদিকে পাকিস্তানীরা তাঁর কার্যকলাপ সম্পর্কে ব্রিটেনের কাছে কূটনৈতিকভাবে প্রতিবাদ করেছে। তাঁর সভা পন্ড করার চেষ্টা করেছে। তাদের হাতে তাঁর প্রাণহানির আশঙ্কায় স্কটল্যান্ড ইয়ার্ড সর্বক্ষণ তাঁকে চোখে চোখে রেখেছে। ১৯৭১ সালের সেপ্টেম্বর মাসে পাকিস্তানের সুপ্রীম জুডিসিয়াল কাউন্সিল তাঁর বিরুদ্ধে সংবিধান লঙ্ঘন ও অপরাধমূলক কাজের অভিযোগের দায়ে আইনানুগ ব্যবস্থাগ্রহণের উদ্যোগ নেয়। এর কিছুই তাঁকে বিচলিত করতে পারেনি।

তাঁর আত্মবিশ্বাস ছিল প্রবল, যে কাজে তিনি নিয়োজিত হয়েছিলেন তার দৃঢ় যুক্তি খুঁজে পেয়েছিলেন নিজের মনে। বাঙালির অন্তর্নিহিত শক্তি ও আন্তরিক ইচ্ছায় তার আস্থা ছিল অপরিসীম। তিনি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতেন, সত্যের জয় হবে। তাই অত জোরের সঙ্গে বলতে পেরেছিলেন :

> লন্ডনের রাস্তায় আমার শবদেহ পড়ে থাকবে তবু পাকিস্তানের সঙ্গে আপোস করে দেশে ফিরব না।

বর্তমান গ্রন্থে প্রবাসে মুক্তিযুদ্ধের দিনগুলিতে তাঁর অভিজ্ঞতার কথা লিখিত আছে। এই রচনাটি ১৯৮৬ সারের ১৬ ডিসেম্বর থেকে ১৯৮৭ সালের ৩ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত *দৈনিক সংবাদ*-এ ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। সর্বশেষ কিস্তির নিচে লেখা ছিল 'শেষ' বলতে, মনে হয়, ঘটনার বিবৃতির পরিসমাপ্তি বোঝানো হয়নি, যতটুকু তিনি লিখতে পেরেছিলেন, তারই সমাপ্তি ঘোষিত হয়েছিল। কিছু কিছু ঘটনাও এতে বাদ পড়েছে। যেমন, লন্ডনে ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎকারের কথা। অন্যান্য সূত্র থেকে যতদূর সংগ্রহ করা গেছে, মুক্তিযুদ্ধকালীন তাঁর সক্রিয়তার বিবরণ বর্তমান গ্রন্থের পরিশিষ্টরূপে যুক্ত হলো।

তার পরবর্তী কথা আমাদের জানা। স্বাধীন বাংলাদেশে তিনি ফিরে এলে ১৯৭২ সালের ১২ জানুয়ারী রাষ্ট্রপতির পদে অধিষ্ঠিত হন। এই বছরেই তিনি বিশ্বভারতী থেকে দেশিকোত্তম ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সম্মানসূচক ডক্টর অফ ল' উপাধি লাভ করেন। ১৯৭৩ সালের ২৪ ডিসেম্বর তিনি রাষ্ট্রপতির পদ ত্যাগ করেন। তারপর তিনি আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহে বাংলাদেশের বিশেষ প্রতিনিধির দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৭৫ সালে তিনি বাংলাদেশ সরকারের মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করেন এবং জেনেভায় অনুষ্ঠিত বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থায় ও জাতিসংঘের নবম অধিবেশনে বাংলাদেশ প্রতিনিধিদলের নেতারূপে যোগদান করেন। ১৯৭৮ সালে তিনি জাতিসংঘের সংখ্যালঘু বৈষম্য প্রতিরোধ ও অধিকার সংরক্ষণ কমিশনের সদস্য নির্বাচিত হন এবং তিন বছর মেয়াদী এই পদে পর পর তিনবার নির্বাচিত হন। ১৯৮৫-৮৬ সারে জাতিসংঘ মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন। ১৯৮৭ সালের ২ আগস্ট হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে লন্ডনে তাঁর মৃত্যু হয়, নিঃসঙ্গ অবস্থায়, আন্ডারগ্রাউন্ড ষ্টেশনে।

আবু সাঈদ চৌধুরীর মৃত্যু অত্যন্ত করুণ, অত্যন্ত শোকাবহ। তাঁর জীবন নানা কীর্তিতে পরিপূর্ণ। সে-জীবনের সবেচেয়ে বড় গৌরব, দেশের মুক্তিযুদ্ধে নিয়োজিত প্রবাসের দিনগুলি। এ বইতে নিজের হাতে সে দিনগুলির কথা তিনি লিখেছেন। লেখকের মতো এ বইও আমদের ইতিহাসের অন্তর্গত হবে।

আনিসুজ্জামান

বাংলা বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ফেব্রুয়ারী ১৯৯০

এক

সাত ঘণ্টায় বিবিসি খবর দিচ্ছিল, ঢাকা বাইরের জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে; গুরুতর কিছু ঘটেছে, কত গুরুতর সেটা বলা যাচ্ছে না।

একাত্তরের ছাব্বিশে মার্চ সকাল বেলা এই খবর পেল বিশ্ববাসী। আমি হয়ে গেলাম একেবারে স্তম্ভিত। প্রতি মুহূর্তে প্রত্যাশা করছিলাম ঢাকা থেকে আপোষ আলোচনার সন্তোষজনক সংবাদ।

মনে হলো সমস্ত জেনেভা শহর কাঁপছে। বরফে ঢাকা পাহাড় আর জেনেভা লেকের ওপর সূর্যের কিরণ কিছুই আজ চোখে পড়ছে না। কেবলই মনে হচ্ছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কথা, ছাত্র–ছাত্রী, শিক্ষক–শিক্ষিকাদের কথা। একটা দারুণ অস্থিরতা আমাকে পেয়ে বসল।

যথারীতি সাড়ে দশটায় জেনেভাস্থ জাতিসংঘ প্রাসাদে মানবাধিকার কমিশনের কাজ শুরু হলো। চেয়ারম্যানের অনুমতি নিয়ে সভার প্রারম্ভে বিবিসির খবরের কথা উল্লেখ করে বললামঃ "ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর হিসেবে আমি অত্যন্ত শঙ্কিত হয়ে পড়েছি। আমি এখনই আপনাদের কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছি। আজকেই লন্ডনে ফিরে যাব এবং সেখান থেকে সম্ভব হলে ঢাকায়। আজকের সন্ধ্যায় বর্তমান অধিবেশনের সমাপ্তি পর্যন্ত থাকতে পারছি না।"

সে বছর ভেনিজুয়েলার বিশিষ্ট কূটনীতিবিদ মিঃ এগিলার ছিলেন মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান। তিনি বললেন, "আমি আশা করি আপনি ভাল খবর পাবেন।"

আমি সেদিনই অপরাহ্নে প্লেনে করে লন্ডনে ফিরে এলাম। লন্ডনে আমার বড় ছেলে খালেদকে ফোনে খবর দিয়েছিলাম। সে বিমানবন্দরে হাবিবুর রহমানকে সঙ্গে নিয়ে উপস্থিত ছিল। বিমানে জেনেভা থেকে লন্ডনে পৌঁছাতে এক ঘণ্টা কয়েক মিনিট লাগে। কিন্তু এই কয়েক মিনিটেই অনেক কিছু ঘটে গেল। লন্ডনে নেমেই শুনলাম ইয়াহিয়া খানের দু'টি ঘোষণা—আওয়ামী লীগ বেআইনী সংগঠন আর শেখ মুজিব দেশদ্রোহী। এই ঘোষণার পরিণাম কি বুঝতে আমার বাকি রইল না।

হাবিবুর রহমান আমাকে বাসায় নিয়ে এলেন। তিনি বাঙালী। টাঙ্গাইলের গোপালপুর থানায় বাড়ী। সে সময় তিনি পাকিস্তান দূতাবাসে চাকরি করতেন। আমাদের সঙ্গে যোগাযোগের ফলে এর তিন সপ্তাহ পরে চাকরি চলে যায়।

আমার ছোট ছেলে এবং মেয়েসহ দিন পনের আগে আমার স্ত্রী জেনেভা থেকে লন্ডনে এসেছেন। আমি একদিনের জন্য এসে তাঁদের রেখে যাই। আমার পরম স্নেহভাজন আমির

আলী আমাদের জন্য একটি ফ্ল্যাট ভাড়া করে দিয়েছিলেন। উদ্দেশ্য ছিল যে, আমার স্ত্রী সপ্তাহ তিনেক বড় ছেলের সঙ্গে কাটিয়ে ছোট ছেলে খালেদ ও মেয়ে শিরীনসহ আমার সঙ্গে ঢাকায় ফিরে আসবেন। কাইসার বছরখানেক আগে লন্ডনে পড়াশুনা করতে এসেছে। আমার স্ত্রী তাকে দেখার জন্য ব্যগ্র হয়ে পড়েছিলেন। সে কারণেই তিনি আমার সঙ্গে জেনেভায় এসেছিলেন। আর তিনি এলেন বলেই খালেদ এবং শিরীনও সঙ্গে আসে। এইভাবে আমার পরিবার তখন লন্ডনে।

উনিশ শ' একাত্তর সালের সতেরই ফেব্রুয়ারী সন্ধ্যায় জেনেভা অভিমুখে আমরা ঢাকা ত্যাগ করি। দু'দিন করাচিতে অবস্থানের পর ফেব্রুয়ারীর বিশ তারিখে জেনেভায় পৌঁছালাম। একুশে ফেব্রুয়ারী থেকে মানবাধিকার কমিশনের অধিবেশনে যোগদান করি। মার্চ মাসের মাঝামাঝি ঢাকার নানা খবরে আমার মন উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ে। মার্চের দ্বিতীয় সপ্তাহের শেষের দিকে জেনেভার একটি পত্রিকায় বিশ্ববিদ্যালয়ের দু'জন ছাত্র নিহত হবার খবর পেলাম। আমি পনেরই মার্চ ঢাকায় প্রাদেশিক শিক্ষা সচিবের কাছে একটি পত্রে জানাই যে, "আমার নিরস্ত্র ছাত্রদের ওপর গুলী চালনার পর আমার ভাইস চ্যান্সেলর থাকার কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ নেই। তাই আমি পদত্যাগ করলাম এবং পত্রটি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট পৌঁছে দেওয়া হোক।" আমার মন তখন থেকে বিষিয়ে ছিল। সে অবস্থায় ছাব্বিশে মার্চের খবর পেলাম।

আমি লন্ডনের বাসায় পৌঁছার কিছুক্ষণ পর সুলতান শরীফ কয়েকজন বাঙালীসহ আমার সঙ্গে দেখা করেন। তাঁরা হাবিবুর রহমানের কাছে আমার আসার খবর পেয়েছেন। তাঁরাও আমারই মত শঙ্কিত। ঢাকার সঙ্গে কোন রকম যোগাযোগ করতে পারছেন না। আমি তখনই বৃটিশ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের দক্ষিণ এশিয়া বিভাগের প্রধান ইয়ান সাদারল্যান্ডের সঙ্গে টেলিফোনে কথা বলতে চেষ্টা করি। কিন্তু তখন তাঁকে পাইনি। বেশ রাতে তাঁকে পাই এবং আমার বিশেষ অনুরোধে পরদিন শনিবার ছুটির দিন হওয়া সত্ত্বেও তিনি পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে আসতে রাজি হন এবং শনিবার এগারটায় তাঁর সঙ্গে দেখা করতে বলেন।

কিছুদিন আগে (১২ নভেম্বর ১৯৭০) ভয়ংকর জলোচ্ছ্বাসে দেশের উপকূলীয় অঞ্চলে অসংখ্য লোকের ঘরবাড়ি ভেসে যায় এবং বহু প্রাণহানি ঘটে। সেই অবস্থা দেখার জন্য ঢাকায় এসেছিলেন বৃটেনের বৈদেশিক মন্ত্রী রিচার্ড উড। রিচার্ড উড কিছুদিন আগে লর্ড উপাধি লাভ করেছেন। বর্তমানে তাঁর নাম লর্ড হোল্ডারনেস। তিনি জলোচ্ছ্বাসের ক্ষয়-ক্ষতি দেখার উদ্দেশ্যে ঢাকায় এলে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রয়োজন সম্পর্কে আলোচনার জন্য আমার সঙ্গে দেখা করেন। রিচার্ড উড, বৃটিশ ডেপুটি হাইকমিশন ফ্রাঙ্ক সার্জেন্ট এবং সাদারল্যান্ডকে আমি আমার বাড়িতে নিমন্ত্রণ করেছিলাম। এভাবেই সাদারল্যান্ডের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়।

সাদারল্যান্ডের সঙ্গে কথা হবার পর আমি বৃটিশ পররাষ্ট্র মন্ত্রীর একান্ত সচিব ব্যারিংটনকে ফোন করলাম। তিনি পূর্বে ইসলামাবাদে বৃটিশ দূতাবাসের ফার্স্ট সেক্রেটারী ছিলেন। তখন ঢাকায় এলেই আমার সঙ্গে দেখা করতেন। সেভাবেই জানাজানি হয়। তাঁকে টেলিফোনে বললাম যে, পরের দিন শনিবার হলেও সাদারল্যান্ড এগারটায় আমার সঙ্গে দেখা করতে সম্মত হয়েছেন। আমার অনুরোধে তিনিও পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে আসতে রাজি হলেন।

দুই

পরের দিন সাতাশে মার্চ শনিবার সকালে ইয়াহিয়া খানের বেতার ভাষণের বিবরণী এবং ঢাকায় পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর আক্রমণের খবর বিভিন্ন সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। এর ফল ভয়াবহ হবার কথা সবগুলো কাগজই উল্লেখ করে। কেনেথ ক্লার্কের পাঠানো করাচী থেকে একটি রিপোর্টে বলা হয়, 'জিন্নার একতার স্বপ্ন রক্তে ধুয়ে-মুছে গেছে।' সেদিনকার লন্ডন টাইমস-এ শেখ মুজিব স্বাধীনতা ঘোষণা করেছেন বলে উল্লেখ করা হয়। ঘোষণাটি তাঁর পক্ষ থেকে পাঠ করেন মেজর জিয়া। সেকথাও ঐ দিনই ঐ পত্রিকাতেই ছিল। সম্পাদকীয়তেও তাঁরা যুদ্ধের আশঙ্কা প্রকাশ করেন। প্রায় সকল কাগজই বঙ্গবন্ধুর ছবিসহ বিভিন্ন প্রতিবেদন ছাপে এবং ইয়াহিয়া খান কর্তৃক শেখ মুজিবকে দেশদ্রোহী ঘোষণার অশুভ পরিণাম সম্পর্কে হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করে।

আমি সাতাশে মার্চেই নির্ধারিত সময়ে সকাল এগারটায় হাবিবুর রহমানের গাড়ীতে বৃটিশ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে উপস্থিত হলাম। লন্ডনের বিখ্যাত হোয়াইট হলে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অফিস। বিরাট প্রাসাদের মতো এই অফিসটি ছুটির দিন বলে ছিল নীরব-নিস্তব্ধ। হাবিবুর রহমানকে গাড়ীতে রেখে আমি ধীরে ধীরে অফিসে প্রবেশ করলাম। একজন স্টুয়ার্ড আমাকে সাদারল্যান্ডের রুমে নিয়ে গেল। খবর পেয়ে ব্যারিংটনও তৎক্ষণাৎ চলে এলেন। তাঁরা দু'জনেই আমাকে ঢাকায় দেখেছেন স্বাভাবিক অবস্থায়, কিন্তু সেদিন নিদারুণ শঙ্কা এবং উৎকণ্ঠা নিয়ে আমি তাঁদের কাছে উপস্থিত। জানতে চাইলাম ঢাকার খবর। তাঁরা বললেন, বিবিসি এবং সংবাদপত্র মারফত পাওয়া খবর ছাড়া সরকারী পর্যায়ে ঢাকাস্থ বৃটিশ ডেপুটি হাইকমিশন থেকে কোন সংবাদ পাননি। তাঁদের শনিবারটা নষ্ট করলাম, এই বলে দুঃখ প্রকাশ করে সোমবার সকালে আবার খবর নিতে আসব বললাম। তাঁদের কাছ থেকে বিদায় নিতে চাইলে তাঁরা আমাকে কফি খেতে অনুরোধ করেন। কফি এলো। এমন সময় সাদারল্যান্ডের সেক্রেটারী এসে বললেন যে, ঢাকা থেকে একটি টেলেক্স আসছে। ছুটির দিন হলেও সাদারল্যান্ড তাঁর সেক্রেটারীকে তাঁর অফিসে আসার কথা জানিয়ে তাঁকেও আসতে বলেছিলেন। সাদারল্যান্ড আমাকে বললেন, 'যাক ভাল হয়েছে আমরা এসেছি। কেননা এই বার্তাটি আমারও অবিলম্বে পাওয়া প্রয়োজন।' তারপর সেক্রেটারীকে পূরো বার্তাটি এসে গেলেই আমাদের কাছে নিয়ে আসতে বললেন। একটু পরে বেশ লম্বা টেলেক্সটি এনে সেক্রেটারী সাদারল্যান্ডের হাতে দিলেন। আমি অনিশ্চয়তা নিয়ে সাদারল্যান্ডকে টেলেক্স পড়তে দেখছিলাম। পড়ার মাঝখানেই বেদনা ও সহানুভূতি ভরা মুখ তুলে আমার দিকে

তাকালেন। ধীরে ধীরে বললেন, 'খবর খুব খারাপ। বহু লোক প্রাণ হারিয়েছেন। আপনার বিশ্ববিদ্যালয়ের বহু ছাত্র-ছাত্রী হতাহত হয়েছেন।' এই কথা বলে তিনি আবার পড়তে শুরু করলেন। পড়া শেষ হলে ধীরে ধীরে বললেন, 'পঁচিশে মার্চের দিবাগত রাতে ঢাকায় বৃটিশ ডেপুটি হাইকমিশনার একটি ভয়াবহ রাত যাপন করেন। পরের দিন তিনি গুলশান থেকে শহরের দিকে আসবার চেষ্টা করে রাস্তায় অনেক মৃতদেহ দেখে ফিরে যান। তাঁর একজন ফার্স্ট সেক্রেটারী সান্ধ্যআইন শিথিল করার পর অল্পক্ষণের জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যেতে পেরেছিলেন। তিনি দেখেন ইকবাল হলের সিঁড়ি বেয়ে রক্ত গড়িয়ে পড়ছে। তিনি জানতে পারেন জগন্নাথ হলের সামনের গণসমাধি খনন করে সেখানে নিহত ছাত্র-শিক্ষকদের শবদেহ ছুঁড়ে ফেলা হয়। আর যে সব ছাত্রকে গুলীর ভয় দেখিয়ে শবদেহ গণ কবরের সামনে আনতে বাধ্য করা হয় তাদেরকেও পরে গুলী করে সেই কবরেই ফেলা হয়। বৃটিশ ডেপুটি হাইকমিশনার ফ্রাঙ্ক সার্জেন্ট আরো লিখেছেন, পাকিস্তান রেডিও শেখ মুজিবকে বন্দী করেছে বলে দাবী করছে। একথার সত্যতা সম্বন্ধে তিনি কিছু বলতে পারছেন না।' সাদারল্যান্ড আরো বলেন যে, 'বৃটিশ নাগরিকদের ফিরিয়ে নেয়ার অনুরোধও টেলেক্সে রয়েছে এবং এরপরে আর কোন টেলেক্স দেওয়াও যাবে না বলে তাকে জানানো হয়েছে। কেননা প্রত্যেক দূতাবাসকে পাকিস্তান সরকার টেলেক্স ব্যবহার করতে নিষেধ করছে।'

ক্ষোভে, দুঃখে, বেদনায় ও অপমানে আমি তখন বিহ্বল। আমি সাদারল্যান্ডকে বললাম, 'এই মুহূর্ত থেকে পাকিস্তান সরকারের সঙ্গে আমার আর কোন সম্পর্ক রইল না। আমি দেশ থেকে দেশান্তরে যাব আর পাকিস্তানী সৈন্যদের এই নিষ্ঠুরতা-নির্মমতার কথা বিশ্ববাসীকে জানাব। তারা আমার ছেলে-মেয়েদের হত্যা করেছে। এর প্রতিবিধান চাই।'

আমার কেবলই মনে হতে থাকল আমি তাদের বলেছি আমি তোমাদের ছেলে ও মেয়ের মত ভালবাসি। সে কারণেই পরীক্ষার তারিখ বদলাবো না। সে তো আমার অন্তরের কথা ছিল। তার সত্যতা প্রমাণের দিন আজ উপস্থিত।

পাকিস্তানের সঙ্গে সকল সম্পর্ক ছিন্ন হওয়ার কথা বলার সময় আমি উত্তেজনায় কাঁপছিলাম। শুধু বাঙালী বলে অবাঙালীরা তাদের হত্যা করবে, আমার জাতীয় সম্মানে আঘাত লাগল। যে মানুষ নিজেকে বাঙালী মনে করে তার একটিমাত্র কর্তব্য মাথা উঁচু করে দাঁড়ানো, আর স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করা। মনে পড়ল দু'টি ঘটনা। জালিয়ানওয়ালাবাগে বৃটিশ সরকারের নির্মমতম হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে রবীন্দ্রনাথের 'নাইট' উপাধি ত্যাগ আর স্যার জন হার্বার্টের চক্রান্তে মন্ত্রিসভার অবসান ঘটলে অবিভক্ত বাংলার প্রধানমন্ত্রী ফজলুল হক বলেছিলেন, 'আমি গ্রাম থেকে গ্রামে, ঘর থেকে ঘরে যেয়ে এই অন্যায়ের কথা দেশবাসীকে জানাব।'—আমিও বললাম 'বিশ্ববাসীকে এই গণহত্যার কথা জানাব, চাইব প্রতিকার। বাংলাদেশকে স্বাধীন হতেই হবে।'

আমার উত্তেজনা ও বেদনার গভীরতা সাদারল্যান্ড এবং ব্যারিংটনকেও স্পর্শ করে। তাঁরা দু'জনেই সহানুভূতিপূর্ণ ব্যবহার করেন। আমি সাদারল্যান্ডকে পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে আমার দেখা

করার ব্যবস্থা করে দিতে অনুরোধ করি। তিনি আমাকে বলেন যে, পররাষ্ট্রমন্ত্রী স্যার এ্যালেক ডগলাস হিউম (লর্ড হিউম) তখন স্কটল্যান্ডে। ফিরে এলেই সাক্ষাতের ব্যবস্থা করে দেবেন। তবে তিনি বৈদেশিক মন্ত্রী (ওভারসিজ মিনিস্টার) রিচার্ড উডের সঙ্গে দেখা করার ব্যবস্থা শীগগিরই করবেন বলে জানান। আমি তাঁকে বলি যে, আমি পার্লামেন্টের পরিচিত এমপিদের সঙ্গে এবং বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলরদের সঙ্গে দেখা করব। সাদারল্যান্ড আমাকে বৃটিশ পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা হওয়ার আগে সংবাদপত্রে বিবৃতি না দিতে অনুরোধ করেন। কেননা তাহলে আমি তখন একজন বিদ্রোহী ব্যক্তি হিসেবে পরিগণিত হব। এতে পররাষ্ট্রমন্ত্রীর পক্ষে আমার সঙ্গে দেখা করার ব্যাপারে প্রটোকলের দিক থেকে বাধা আসতে পারে। আমি তাঁদের দু'জনকেই বললাম, আমার ছাত্রদের সঙ্গে আমার সম্বন্ধ ভাষা দিয়ে প্রকাশ করতে পারব না। আমি নানা অনুষ্ঠানে তাদেরকে আমার হীরের টুকরো ছেলে এবং লক্ষ্মী মেয়ে বলে সম্বোধন করেছি এবং এই সম্বন্ধকে আমি অন্তর দিয়ে বিশ্বাস করেছি। আমি তাঁদের আরো বললাম, তারা আমাকে এত ভালবাসত, আমার ওপরে তাঁদের এত নির্ভরতা ছিল যে, আমার কেবল মনে হচ্ছে যে তাদের সেই পরম দুঃসময়েও তারা আমার কথা মনে করেছে। তারা নিশ্চয়ই ভেবেছে যে, আমাদের ভাইস চ্যান্সেলর যদি আজ বিশ্ববিদ্যালয়ে উপস্থিত থাকতেন, তিনি এসে আমাদের পাশে দাঁড়াতেন। আজ আমার একটি মাত্র কর্তব্য দেশ স্বাধীন করে পাকিস্তানের হানাদার বাহিনীর সমুচিত শাস্তির ব্যবস্থা করা। করতেই হবে। কথাগুলো বলে আমি ক্লান্ত হয়ে পড়ি। দু'তিনদিনের মধ্যেই সাদারল্যান্ডের সঙ্গে আবার দেখা করব বলে ধীরে ধীরে বিদায় নিই। সাদারল্যান্ডের রুম থেকে বেরুলে ব্যারিংটন আমার হাত ধরে তাঁর রুমে নিয়ে গেলেন। সেখানেও কয়েক মিনিট কথা হলো। তিনি ব্যক্তিগতভাবে কোনরূপ সাহায্য করতে পারলে আনন্দিত হবেন জানালেন। হোয়াইট হল থেকে বেরিয়ে এসে দেখলাম হাবিবুর রহমান গাড়ীতে রেডিও ছেড়ে দিয়ে চুপ করে শুনছেন। আমি গাড়ীতে উঠলে তিনি রেডিও বন্ধ করে দিলেন। আমার সঙ্গে সাদারল্যান্ড আর ব্যারিংটনের যে সব কথা হয় সেগুলো তাঁকে সংক্ষেপে বললাম। জানালাম আমার সিদ্ধান্তের কথা। তারপর হাবিবুর রহমানকে বললাম, 'চলুন, আমাকে পৌঁছে দেবেন। এখন তো যুদ্ধ শুরু হয়েছে। আর এক মুহূর্তও নষ্ট করা চলে না।' আমি যখন মনের দিক থেকে এমন একটা অবস্থায় এসে দাঁড়ালাম, তখনও জানিনা যে, আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ কি করছেন, কোথা আছেন-কি অবস্থায় আছেন। তাঁদের ভারতে পৌঁছার সংবাদ তখনও আমরা পাইনি। সেদিনই বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতা ঘোষণা কাগজে বেরিয়েছে। সাড়ে সাত কোটি বাঙালী এই ঘোষণাকে সফল করবেই, সত্যের জয় হবেই।

হাবিবুর রহমান আমাকে নিয়ে বাসার দিকে চললেন। চুপ করে বসে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কথা ভাবছিলাম। মনে পড়ল নানা স্মৃতি, নানা হৃদয়স্পর্শী ছবি। হঠাৎ হাবিবুর রহমানের গাড়ীর রেডিওটা বিবিসি পরিবেশিত খবর দিতে শুরু করল। তাতে বলা হচ্ছে-পাকিস্তান রেডিও যদিও ঘোষণা করেছে যে, শেখ মুজিবকে বন্দী করা হয়েছে, একটি অজ্ঞাত রেডিও থেকে বলা হয়েছে শেখ মুজিব মুক্ত। তিনি দেশকে মুক্ত করে ছাড়বেন।

এই খবর শুনে আমরা যেন সেই ঘন অন্ধকারেও আশার আলো দেখতে পেলাম। সমস্ত

শরীরে সেদিন যে শিহরণ অনুভব করি তাকে প্রকাশ করতে পারি এমন জোর আমার কলমে নেই।

বাসায় ফিরে আমার স্ত্রীকে ঢাকার ভয়াবহ খবর ও বৃটিশ ডেপুটি হাইকমিশনারের পাঠানো টেলেক্সের কথা বললাম। তাঁকে আরো বললাম, বৃটিশ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে পাকিস্তান সরকারের সঙ্গে আমার সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করার সিদ্ধান্ত জানিয়ে এসেছি। তিনি শান্ত কণ্ঠে বললেন, 'এছাড়া আর কোন সিদ্ধান্ত নিতে পারো না।'

তিন

সাতাশে মার্চ বিকেলেই শিল্পী আবদুর রউফ, মোহাম্মদ হোসেন মঞ্জুসহ বেশ কয়েকজন যুব নেতা আমার সঙ্গে দেখা করেন। তাছাড়া বৃটেনস্থ বাংলাদেশ মেডিক্যাল এসোসিয়েশনের নেতৃবৃন্দ আবদুল হাকিম, জাফরুল্লাহ চৌধুরী ও মোশারফ হোসেন জোয়ারদার সেদিনই দেখা করেন। তাঁদের কাছ থেকেই বুঝতে পারি যে, সবাই স্বাধীনতা অর্জনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। তাঁদের মধ্যে দেখি দৃঢ়প্রত্যয়। কিন্তু নেতৃত্ব নিয়ে দলাদলি আছে। তাই তাদেরকে সংঘবদ্ধ কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব গঠন করতে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে বলি। কেন্দ্রীয় কমিটি গঠিত না হওয়া পর্যন্ত আমি ব্যক্তিগতভাবে স্বাধীনতা আন্দোলনের জন্য কাজ করে যাবার কথাও বলি। ডাক্তারদের মধ্যে কোন দলাদলি নেই লক্ষ্য করে আনন্দিত হলাম। দেশবাসীর দুর্দিনে কিভাবে তাঁরা সাহায্য করতে পারেন তাই বিশেষ করে জানতে চান। সে বিষয়ে আলোচনা করে তাঁদেরকে বৃটেনের সর্বস্তরের প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তিদের সঙ্গে দেখা করতে বলি। আমি নিজেও ভাইস চ্যান্সেলর, শিক্ষাবিদ, পার্লামেন্ট সদস্যদের সঙ্গে দেখা করার সিদ্ধান্ত তাঁদের জানাই। আমি সেদিন থেকেই বিভিন্ন ঘরোয়া বৈঠকে যোগদান করি এবং তাঁদেরকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে স্বাধীনতা সংগ্রামে এগিয়ে যেতে বলি।

উনিশ শ' উনসত্তর সালে বঙ্গবন্ধু লন্ডনে এসেছিলেন। সে সময় যুক্তরাজ্যে আওয়ামী লীগ প্রতিষ্ঠিত হয়। তিনি চলে যাওয়ার পরে এই প্রতিষ্ঠানটিও বিভক্ত হয়ে পড়ে এবং লন্ডন আওয়ামী লীগের জন্ম হয়। লন্ডন আওয়ামী লীগ যুক্তরাজ্য আওয়ামী লীগের শাখা হলে কোন অসুবিধা হতো না। কিন্তু এই সমিতিটি নিজস্ব সত্তা দাবী করায় প্রতিদ্বন্দ্বী প্রতিষ্ঠানের মতো দেখায়। তাছাড়া আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা চলাকালে বৃটেনস্থ বাঙালীগণ নিজেদেরকে খুবই উৎপীড়িত এবং অত্যাচারিত বলে মনে করেন। স্বভাবতই স্বাজাত্যবোধ তাঁদের অনুপ্রাণিত করে। তাঁরা প্রায় প্রত্যেক অঞ্চলেই গণতন্ত্রের জন্য সংগ্রাম করার ইচ্ছে নিয়ে প্রতিষ্ঠান স্থাপন

করেন এবং সেভাবে কাজও হচ্ছিল। পঁচিশে মার্চের কালরাত্রিতে হত্যাযজ্ঞ শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তারা প্রতিবাদে মুখর হয়ে ওঠেন। তাঁদের মধ্যে সেই অভাবিত শক্তি, সাহস এবং স্বাজাত্যবোধ দেখে আমি আনন্দিত ও গর্বিত হই। কিন্তু মুশকিল হয় এই যে, কোন বড় সভা করতে হলে অথবা শোভাযাত্রা বের করতে হলে একটি কেন্দ্রীয় কমিটির প্রয়োজন। প্রতিদিন এ নিয়ে বৈঠক হলেও কোন সন্তোষজনক পরিসমাপ্তিতে পৌঁছানো যাচ্ছিল না। আমাকে সন্ধ্যার পরে একেক দিন একেক দলীয় বৈঠকে নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু একতাবদ্ধ করার প্রচেষ্টা প্রায় প্রতিদিনই ব্যাহত হচ্ছিল। অবশ্য সাতাশে মার্চেই লন্ডনস্থ পাকিস্তান দূতাবাসের সামনে বাঙালী ছাত্ররা বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন। এই বিক্ষোভের ফলে কয়েকজন ছাত্রকে গ্রেফতার করা হয়।

প্রবাসী বাঙালীদের সঙ্গে ঘরোয়া বৈঠক করা ছাড়াও আমি ৩০শে মার্চ মঙ্গলবার অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটির ভাইস চ্যান্সেলর এবং সেন্ট ক্যাথিরিন কলেজের অধ্যক্ষ লর্ড এলেন বুলেকের সঙ্গে দেখা করি। তাঁকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র এবং শিক্ষকদের হতাহতের কথা জানাই। এত কম সময়ের নোটিশে আমার সঙ্গে দেখা করায় আমি তাঁকে ধন্যবাদ দেই। তিনি আমাকে গভীর সহানুভূতি জ্ঞাপন করেন। আমি তাঁকে রক্তক্ষয় বন্ধ করার জন্য এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষক হত্যার প্রতিবাদ জানিয়ে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জেনারেল ইয়াহিয়া খানের নিকট টেলিগ্রাম করতে অনুরোধ করি। তিনি বলেন, এরূপ আলাদাভাবে টেলিগ্রাম না দিয়ে কমনওয়েলথভুক্ত দেশগুলোর সকল বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে একটি টেলিগ্রাম দিলে ভাল হয়। তিনি আমাকে কমনওয়েলথ ইউনিভার্সিটিজ এসোসিয়েশনের সেক্রেটারী জেনারেল স্যার হিউ স্প্রিংগারের সঙ্গে দেখা করতে বলেন।

স্যার হিউ স্প্রিংগারের সঙ্গে আগে আমার একবার দেখা হয়েছিল এবং সে বছরই তাঁর ঢাকা আসার কথাও ছিল। আমি তাঁকে টেলিফোন করতেই তিনি আমার সঙ্গে দেখা করতে আগ্রহী হন। তিনি ইতোমধ্যেই খবরের কাগজের মারফত বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে, বিশেষ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যে হত্যাযজ্ঞ শুরু হয়েছে তা জানতেন। তাঁকে প্রতিবাদসূচক টেলিগ্রাম দিতে বলায় তিনি তৎক্ষণাৎ রাজি হন। তিনি ইয়াহিয়া খানের নিকট সেদিনই প্রতিবাদ জানিয়ে টেলিগ্রাম করেন এবং অবিলম্বে রক্তক্ষয় বন্ধ করে বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে শান্তি স্থাপন করতে অনুরোধ জানান।

ইতোমধ্যে ইয়ান সাদারল্যান্ড আমাকে রিচার্ড উডের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা করে দেন। এপ্রিল মাসের প্রথম সপ্তাহেই তাঁর সঙ্গে দেখা করি এবং পররাষ্ট্রমন্ত্রীর অনুপস্থিতিতে আমার মনের আবেগ আমি তাঁর কাছেই ব্যক্ত করি। তাঁর সঙ্গে দেখা করার সময় সাদারল্যান্ড উপস্থিত ছিলেন। সেদিন তিনি আমার এবং রিচার্ড উডের কথাবার্তার একটি নোট রাখেন। আমি সদ্য আঘাতপ্রাপ্ত মানুষ। নিদারুণ শোকে বিহ্বল। রিচার্ড উডের সঙ্গে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে বধ্যভূমিতে পরিণত করার কথা বলতে যেয়ে আমি অশ্রু সংবরণ করতে পারিনি। রিচার্ড উডকে অবিলম্বে রক্তক্ষয় বন্ধ এবং শেখ মুজিবের মুক্তির জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করতে অনুরোধ করি। তিনি বলেন যে, বৃটিশ গভর্ণমেন্ট ইতোমধ্যেই পাকিস্তানস্থ বৃটিশ

হাইকমিশনারের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করেছেন এবং একটি বন্ধুরাষ্ট্রকে যতটা চাপ দেওয়া সম্ভব তা তারা নিশ্চয়ই দেবেন। আমার কাছ থেকে সব কথা শুনে তিনি আন্তরিকভাবেই ব্যথিত হয়েছিলেন। তিনি কয়েক মাস আগে যখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আসেন তখন বেশ কয়েকজন অধ্যাপকের সঙ্গেই তাঁর পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলাম। তাঁকে বললাম, 'সে সব শিক্ষকদের মধ্যে ক'জন বেঁচে আছেন আমি জানি না।'

রিচার্ড উড অত্যন্ত সহানুভূতিশীল মানুষ এবং একটি পরিশীলিত মনের অধিকারী। তাঁর পিতা বৃটিশ আমলে ভারতের বড়লাটরূপে মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে যে চুক্তি সম্পাদন করেন তা গান্ধী-আরউইন প্যাক্ট নামে পরিচিত। সেই প্যাক্টকে এই উপমহাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ বলা হয়। লর্ড আরউইনই মহাত্মা গান্ধীকে জানান যে, বৃটিশ সরকার ভারতের স্বাধীনতার লক্ষ্যে পৌঁছানোর কর্মপন্থা গ্রহণের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন। আমি রিচার্ড উডকে এই উপমহাদেশের সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিগত সম্বন্ধের কথা উল্লেখ করে বলি যে, সরকারী পর্যায়ে তো বটেই ব্যক্তিগতভাবেও তিনি আমাদের সাহায্য করবেন, এই আশা আমরা করি।

চার

এরপর ইয়র্ক বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর লর্ড জেমসকে টেলিফোন করি। তিনি আমার টেলিফোন পেয়েই আমাকে ইয়র্ক বিশ্ববিদ্যালয়ে যাওয়ার জন্য আমন্ত্রণ করেন। আমি তাঁকে বলি যে, তাঁর সঙ্গে দেখা করার উদ্দেশ্যেই আমি ফোন করেছি। তারপর ঠিক হলো আমি ৬ই এপ্রিল দুপুরে তাঁর সঙ্গে মধ্যাহ্নভোজে যোগদান করব। লন্ডন থেকে নির্ধারিত দিনে ট্রেনে ইয়র্ক স্টেশনে পৌঁছলাম। সেখানে বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন অফিসার লর্ড জেমসের পক্ষ থেকে আমাকে অভ্যর্থনা জানান এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়ে যান। আমি গাড়ি থেকে নামলেই লর্ড জেমস আমাকে হলঘরে নিয়ে যান। সেখানে জন পনের অধ্যাপক উপস্থিত ছিলেন। তাঁদের সঙ্গে আলাপ হলো। লর্ড জেমস এবং অন্যান্য অধ্যাপকের সঙ্গে আমি বিশ্ববিদ্যালয়ে নরহত্যার কথা বলি। তাঁরা সবাই সহানুভূতি জানালেন। পরে খেতে বসেও সামগ্রিক অবস্থা তাঁদের কাছে তুলে ধরি। আমরা সংসদীয় গণতন্ত্র চেয়েছিলাম, সংবাদপত্র ও বিচার বিভাগের স্বাধীনতা চেয়েছিলাম মাত্র। এক অংশ আরেক অংশ থেকে বারশ' মাইল দূরে। মাঝখানে ভারত। তবুও আমরা বাঙালীরা মনে প্রাণে পাকিস্তান চেয়েছি। আমাদেরই নেতা ফজলুল হক পাকিস্তান প্রস্তাব উত্থাপন করেন উনিশ শ' চল্লিশ সালে। কিন্তু পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর আমরা

বৈষম্যমূলক ব্যবহার পেয়ে আসছি। সকল ভারী শিল্প পশ্চিম পাকিস্তানে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। অথচ পাট রপ্তানি করে যে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জিত হয় তা প্রায় পুরোপুরি ব্যয় হয় পশ্চিম পাকিস্তানে শিল্প প্রতিষ্ঠায়। কেন্দ্রে সরকারী চাকরির ব্যাপারে পশ্চিম পাকিস্তানের প্রয়োজন মিটিয়ে পরে কিছু উচ্ছিষ্টের মতো পূর্ব পাকিস্তানকে দেওয়া হয়। আমরা তীব্র প্রতিবাদ জানালে তারা আমাদের হত্যা করতে শুরু করেছে। তাই আমাদের সম-অধিকারের দাবী আজ স্বাধীনতার দাবীতে রূপান্তরিত হয়েছে। আজ আমরা স্বাধীনতা অর্জনের জন্য দৃঢ়সংকল্প। জীবনে কখনো রাজনীতির সঙ্গে সম্পর্ক ছিল না। কিন্তু একজন আত্ম-সম্মানবোধসম্পন্ন বাঙালীরূপে আমিও সে সংগ্রামে যোগদান করেছি।

খাওয়ার টেবিলে লর্ড জেমস বললেন, পশ্চিম পাকিস্তানীরা শিগ্‌গিরই বুঝতে পারবে তারা কি ভুল করছে। পূর্ব পাকিস্তানকে উপনিবেশরূপে ব্যবহার করতে গিয়ে আজ তারা সম্পূর্ণ পূর্ব পাকিস্তানই হারাতে বসেছে। তিনি বেশ দৃঢ়তার সঙ্গে বলেন যে, ছয় মাসের মধ্যে পূর্ব পাকিস্তান স্বাধীন বাংলাদেশ রূপে প্রতিষ্ঠিত হবে। আমি ধন্যবাদ দিয়ে বললাম যে, তিনি আমাদের অবস্থাটা পুরোপুরি উপলব্ধি করেছেন। খাওয়া শেষ হলে তাঁকে হিউ স্প্রিংগারের অনুরূপ একটি চিঠি পাঠাতে অনুরোধ করি। হিউ স্প্রিংগার টেলিগ্রাম পাঠিয়েছেন শুনে তিনি বললেন, 'তিনি তো আমাদের সকলের হয়েই কথা বলেছেন। তবে যদি প্রয়োজন হয় নিশ্চয়ই পরে একটি বিবৃতি দেবেন' বলে জানালেন। লর্ড জেমসের কাছ থেকে বিদায় নিতে গেলে তিনি আমার সঙ্গে কেউ আছে কিনা জানতে চাইলেন। বললাম, 'একা এসেছি।' উত্তরে বললেন, 'পাকিস্তানের মতো একটি রাষ্ট্রকে শত্রুতে পরিণত করে একা ঘোরাফেরা করা কাজের কথা নয়।' তারপর আরো বললেন, 'কোনো কোনো সময় শুধু বেঁচে থাকাটাও একটা দেশ সেবা।'

লর্ড জেমসের কাছ থেকে বিদায় নেবার পর অধ্যাপক জি, এস, মুডি আমাকে তাঁর রুমে নিয়ে গেলেন। সেখানেও তিনি ঢাকার হত্যাযজ্ঞের জন্য আন্তরিক সহানুভূতি জানালেন। তারপর তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন আমি কোথায় কিভাবে আছি। আমি তাঁকে বললাম, নিতান্তই সাময়িকভাবে লন্ডনে একটা বাসায় উঠেছি। তিনি বললেন, ইয়র্কে তাঁর দুটো বাড়ি আছে। একটাতে তিনি থাকেন, অন্যটা ভাড়া দেয়া হয়। তাঁর দ্বিতীয় বাড়িটি থেকে ভাড়াটে সপ্তাহখানেক আগে উঠে গেছে। আমি যদি থাকি তিনি সেই বাড়িটি ছেড়ে দিতে পারেন। আমাকে কোনো ভাড়া দিতে হবে না। আমি যতদিন প্রয়োজন সেখানে থাকতে পারি। আমি অবাক হয়ে ভাবলাম পৃথিবীর নানা প্রান্তে কত মহানুভব ব্যক্তি ছড়িয়ে আছেন। উত্তরে বললাম, 'আপনার বিবেচনা ও সহানুভূতির জন্য আমি চিরদিন কৃতজ্ঞ থাকব। আমার কর্মস্থল লন্ডন। সেখানে থেকেই সংগ্রাম করতে হবে। যদিও আপনার বাড়িতে থাকতে পারছি না, আপনার এই প্রস্তাবের কথা কখনো ভুলব না।'

ভুলিও নাই। তিনি বর্তমানে ইয়র্ক বিশ্ববিদ্যালয়ে রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের প্রধান। দেশ স্বাধীন হবার পর ঢাকা থেকে আমি তাঁকে চিঠি লিখেছি। পরে লন্ডনে অবস্থানকালে মাঝে মাঝে তাঁকে ফোন করেছি। বছর তিনেক আগে একবার ইয়র্কে গিয়েছিলাম তাঁর সঙ্গে দেখা করতে।

লর্ড জেমসের সঙ্গেও আমার যোগাযোগ আছে। লন্ডনে আমরা মাঝে মাঝে পরস্পরের আতিথ্য গ্রহণ করে থাকি। বৃটেনে তিনি একজন সম্মানিত শিক্ষাবিদ। শিক্ষাসংক্রান্ত অনেক কমিশনের চেয়ারম্যান রূপে তাঁকে কাজ করতে হয়েছে। এমনি একটি শিক্ষা কমিশনের চেয়ারম্যান রূপে উনিশশ' সত্তর সালে ঢাকায় এলে আমি তাঁর সম্মানার্থে একটি ভোজসভার আয়োজন করি। সেখানে বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক অধ্যাপক উপস্থিত ছিলেন। বর্তমানে তিনি অবসর জীবন যাপন করছেন। মাঝে মাঝে লর্ড সভার অধিবেশনে যোগদানের জন্য লন্ডনে আসেন।

পাঁচ

এপ্রিলের দ্বিতীয় সপ্তাহেই আমি কমনওয়েলথ-এর সেক্রেটারী জেনারেল আর্নল্ড স্মীথের সঙ্গে দেখা করি। স্মীথকে আমি চিনতাম না। তার সেক্রেটারিয়েটে উইলিয়াম পিটার্স তখন ডাইরেক্টর। পিটার্স একজন বৃটিশ কূটনীতিবিদ। তিনি এককালে ঢাকাস্থ বৃটিশ দূতাবাসের ফার্স্ট সেক্রেটারী ছিলেন। সে সময় আমাদের সঙ্গে খুব ঘনিষ্ঠতা হয়। আর্নল্ড স্মীথের সঙ্গে অনেক আলোচনা হলো। বাংলাদেশ কেন স্বাধীনতা সংগ্রামে লিপ্ত হয়েছে তার পুরো ইতিহাসটা তাঁকে বললাম। আমরা নিয়মতান্ত্রিক পন্থায় সমান অধিকার দাবী করি। কিন্তু পাকিস্তানের সামরিক সরকার আলোচনা একতরফাভাবে বন্ধ করে যখন ২৫শে মার্চের রাত্রিতে আমাদের হত্যা করতে শুরু করলো তখন বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। আমরা তখন দেয়ালে পিঠ লাগিয়ে এক মরণপণ সংগ্রামে লিপ্ত। সেদিন প্রায় ঘন্টা দেড়েক তার সঙ্গে ছিলাম। সেই সাক্ষাতেই বন্ধুত্ব হয়ে গেল। একটি কমনওয়েলথ দেশের বেদনার কাহিনী তার হৃদয়কে স্পর্শ করে। তিনি স্বীকার করলেন, ইয়াহিয়া খানের কাছে একটি ব্যক্তিগত চিঠি দিয়ে বঙ্গবন্ধুকে মুক্তি ও রক্তপাত বন্ধ করার জন্য অনুরোধ জানাবেন। কথা প্রসঙ্গে বললেন, ইসলামাবাদে কর্মরত একজন বাঙ্গালী শিক্ষাবিদকে কমনওয়েলথ সেক্রেটারীয়েটে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদে নিযুক্ত করেছেন; কিন্তু পাকিস্তান সরকার তাঁকে আসতে দিচ্ছে না। এই ব্যবহার থেকেই পাকিস্তানীদের বৈষম্যমূলক আচরণের উদাহরণ তিনি পেয়েছেন। আমার কাছ থেকে তিনি তাদের মনোবৃত্তির সঠিক বিশ্লেষণ পেলেন।

আমাদের যুদ্ধ ছিল সত্য প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম। তাই এতে বাক্যের কৌশল বা কূটনৈতিক দক্ষতার প্রয়োজন ছিল না। সত্য সরল গতিতে এগিয়ে চলে। এরপরে ঐ নয় মাসে নানা সময়ে আমাকে আর্নল্ড স্মীথের সঙ্গে দেখা করতে হয়েছে। কিছুদিন পরে তিনি মনের দিক

থেকে একেবারেই আমাদের আপনজন হয়ে পড়েন। আর্নল্ড স্মীথ কানাডার নাগরিক। সেক্রেটারী জেনারেল পদে নির্বাচিত হবার আগে অধ্যাপনা করতেন। ঐ পদ থেকে অবসর গ্রহণের পর কানাডায় ফিরে গিয়ে আবার অধ্যাপনার কাজ শুরু করেছেন। আমার দিনগুলি এই সব দেখা-সাক্ষাৎ এবং বিদেশীদের কাছে অবস্থার বিশ্লেষণ করে কাটছিল। বাঙ্গালীদের সঙ্গে নানা ঘরোয়া বৈঠকেও যোগদান করেছিলাম। তাঁরা প্রত্যেকে তাঁদের সমিতিতে যোগদানের জন্য পীড়াপীড়ি করছিলেন। কিন্তু আমি এ ব্যাপারে একেবারে অটল ছিলাম। ঐক্যবদ্ধ কেন্দ্রীয় কমিটি গঠিত না হওয়া পর্যন্ত আমি কোনো দলীয় প্রতিষ্ঠানে যোগদান করব না। আমি স্পষ্ট অনুভব করলাম যদি কোনো দলীয় প্রতিষ্ঠানে যোগদান করি তাহলে আমি এই সব প্রতিষ্ঠানের পারস্পরিক কোন্দলে জড়িত হয়ে পড়ব। বিদেশীদের কাছে আমি ব্যক্তিগতভাবে যে স্বাধীনতা ঘোষণার কারণ বিশ্লেষণ করে যাচ্ছি, কোন্দলে জড়িয়ে পড়লে আসল কাজ পাবে বাধা। কিন্তু যারা আমাকে প্রত্যহ এই সব ঘরোয়া বৈঠকে নিয়ে যেতেন এবং মাঝরাতে আমাকে বাসায় পৌঁছে দিতেন তারা তাদের দলে আমার যোগদানের অস্বীকৃতির কারণ পুরোপুরি উপলব্ধি করতে পারতেন বলে মনে হয়নি।

ছয়

জনমত সম্পাদক ও ছাত্রনেতা ওয়ালী আশরাফ আমার সঙ্গে দেখা করলে তাঁকেও তার কাগজের মারফত এবং ব্যক্তিগতভাবে ঐক্য প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে বলি। ছাত্রনেতা মোশাররফ হোসেন, মানিক চৌধুরী, রাজিউল হাসান রঞ্জু এবং অন্যান্য ছাত্রনেতা আমি লন্ডনে পৌঁছানোর পরেই দেখা করেন। এনামুল হক (বর্তমানে যাদুঘরের মহাপরিচালক) প্রথম থেকেই আমার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ স্থাপন করেন। তাঁদের সঙ্গে কর্মপদ্ধতি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। এরা সকলেই নয় মাস অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন।

বাঙ্গালীদের সংঘবদ্ধ করার ব্যাপারে একজন বৃটিশ যুবক সাংবাদিকের প্রবন্ধ অনেক সাহায্য করেছিল।

সাংবাদিকতাকে আমি চিরদিন শ্রদ্ধা করি। একে আমি একটি মহৎ পেশা মনে করি। এই কারণে করি যে, সাংবাদিকগণ অনেক সময় নিজেদের প্রাণের ঝুঁকি নিয়েও সত্য প্রতিষ্ঠায় সহায়তা করেন। জনমত গণতন্ত্রের ভিত্তি আর সাংবাদিকতা তার সোপান। সঠিক, নির্ভুল ও বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ সরবরাহ করে তাঁরা জনগণকে করেন সচেতন আর ইঙ্গিত করেন বাঞ্ছিত পথের।

এই আদর্শে উদ্বুদ্ধ সাইমন ড্রিঙ্ক পঁচিশে মার্চের দিবাগত রাতে ছিলেন ঢাকার ইন্টারকন্টিনেন্টাল হোটেলে। তিনি আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন লন্ডনের ডেইলি টেলিগ্রাফের প্রতিনিধিরূপে ঢাকায় এসেছিলেন। তাঁর রিপোর্টে তিনি ঢাকার অবস্থা বর্ণনা করেছেন। ডেইলি টেলিগ্রাফের ৩০শে মার্চের কাগজে এটাই প্রধানতম সংবাদ যাকে লিড নিউজ বলা হয়। আমি তাঁর এই বিবরণী কেটে ব্রিফকেসে রেখেছিলাম এবং যখনই কোনো বিশিষ্ট ব্যক্তির সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছি তাঁকে একটি করে ফটোকপি দিয়ে এসেছি। অবসর সময়ে ভাল করে পড়তে অনুরোধ করেছি।

বাঙ্গালীদের জাতীয় বৈশিষ্ট্য নিয়ে গৌরব করার অনেক কিছু আছে। যেমন, আমাদের সহজ-সরল মনোভাব, আতিথেয়তা, প্রচন্ড বিপদে সাহসিকতা ও কঠোরতা, পারস্পরিক সহমর্মিতা, শান্তির প্রতি স্বাভাবিক আনুগত্য, ক্ষমাশীলতা ইত্যাদি। তেমনি পরশ্রীকাতরতা, এবং আত্মবিস্মৃতি আমাদের অন্যমত জাতীয় বৈশিষ্ট্য। তাই দেশ স্বাধীন হবার পরেও সাইমন ড্রিঙ্ক-এর এই প্রতিবেদনটি বাংলাদেশ সরকারের প্রেস থেকে পুনর্মুদ্রণ করে অনেককে দিয়েছি। নিয়মতান্ত্রিক পন্থায় আমরা ছ' দফার আলোচনা চাচ্ছিলাম। বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন যে, তিনি যুক্তিপূর্ণ পন্থায় সকল সমস্যার সমাধান চান। পার্লামেন্টের একজন সদস্যও যদি যুক্তিসঙ্গত কথা বলেন তা নিশ্চয়ই বিবেচনা করা হবে। কিন্তু সব বন্ধ করে যখন হত্যা করা শুরু হলো তখনই স্বাধীনতা ঘোষণা করা হয়। সে অবস্থাটা মনে রাখার জন্যই এই প্রতিবেদনটির পুনমুদ্রণ প্রয়োজন বোধ করি।

পঁচিশে মার্চের রাতে সাইমন ড্রিঙ্ক ইন্টারকন্টিনেন্টাল হোটেলের ছাদে লুকিয়ে ছিলেন। তাঁরপর বহু কষ্টে তিনি পাকিস্তানী সৈন্যদের দৃষ্টি এড়িয়ে এসোসিয়েটেড প্রেস-এর ফটোগ্রাফার মিশেল লরেন্টকে সঙ্গে নিয়ে জ্বলন্ত শহর দেখে আসেন এবং তিনি যা নোট করেছিলেন সেটাও বহু কষ্টে বিমানবন্দরে তল্লাশী থেকে রক্ষা করেন। এভাবে ব্যাংককে পালিয়ে গিয়ে সেখান থেকে 'ডেইলি টেলিগ্রাফ'—এ যে প্রতিবেদনটি টেলেক্স করেন সেইটিই বোধ করি বহির্বিশ্বে পৌঁছানো ঢাকার প্রথম বিস্তারিত খবর আমি আগেই বলেছি এটি ৩০শে মার্চ ছাপা হয়।

সাতাশ বছর বয়সের এই যুবক সাংবাদিকের প্রতিবেদনের সাধারণ সারমর্ম এখানে তুলে ধরছি। সাইমন ড্রিঙ্ক বলেন যে, "ঐক্যবদ্ধ পাকিস্তানের নামে ঢাকাকে একটি বিধ্বস্ত এবং ভীতসন্ত্রস্ত নগরে পরিণত করা হয়েছে। চব্বিশ ঘন্টার নিষ্ঠুর-নির্মম শেলিং-এর দ্বারা পাকিস্তানী সেনাবাহিনী অন্তত সাত হাজার লোককে হত্যা করেছে, বিস্তীর্ণ জায়গা করেছে ধূলিসাৎ এবং বর্বরতার দ্বারা। পূর্ব পাকিস্তানের স্বাধীনতা আন্দোলনের সমাপ্তি আনবার চেষ্টা করেছে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান সামরিক সরকারের পক্ষ থেকে দাবী করেছেন, অবস্থা শান্ত, কিন্তু আসলে দেখা যাচ্ছে হাজার হাজার মানুষ গ্রামাঞ্চলে পালিয়ে যাচ্ছে। শহরগুলো হয়ে যাচ্ছে পরিত্যক্ত এবং প্রদেশের নানা জায়গায় চলছে হত্যাযজ্ঞ।" তিনি আরো লেখেন, "এখন পর্যন্ত বাঙ্গালীদের দেখলেই গুলী করা হচ্ছে এবং অট্টালিকাগুলোকে ধ্বংস করা হচ্ছে সমানে। পাকিস্তানের সামরিক বাহিনী পূর্ববঙ্গের স্বাধিকার আন্দোলনকে নস্যাৎ করতে

দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। মফস্বলের শহরগুলোর খবর যতদূর পাওয়া যাচ্ছে, তাতে মনে হচ্ছে অন্ততঃ ১৫ হাজার লোক নিহত হয়েছে সেইরাতে।" তিনি আরো লেখেন ঃ 'সামরিক বাহিনীর নির্মমতা এ থেকে বোঝা যাবে যে, ছাত্রদের হোস্টেলে তাদের বিছানায় গুলীবিদ্ধ অবস্থায় দেখতে পাওয়া গেছে। দোকানীরা মৃত অবস্থায় পড়ে আছে দোকানে। স্ত্রীলোক এবং শিশুদের জীবন্ত পুড়িয়েছে তাদের গৃহের অভ্যন্তরে। বহু লোককে ঘর থেকে বের করে নিয়ে একসঙ্গে গণহত্যা করা হয়েছে। বাজারগুলি ভস্মীভূত। আর প্রত্যেক বিল্ডিংয়ে উড়ছে পাকিস্তানী পতাকা।" তিনি আরও উল্লেখ করেন ঃ "অনেক রাজনৈতিক কর্মীকে গ্রেফতার ও হত্যা করা হয়েছে এবং শেখ মুজিবের আন্দোলন সমর্থনকারী দু'টি সংবাদপত্রের অফিস ধ্বংস করা হয়েছে। আক্রমণের প্রথম শিকার হয়েছে ঢাকার ছাত্রবৃন্দ। রাত এগারটার দিকে সামরিক বাহিনী সাঁজোয়া গাড়ী এবং ট্যাংকসহ বেরিয়ে আসে। এগারটার পর গুলী শুরু হয়। অসহায় নাগরিকবৃন্দ তাড়াতাড়ি প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টির জন্য গাড়ী উল্টিয়ে রাখে রাস্তায়, গাছ ফেলে দেয়, আসবাবপত্র স্তূপীকৃত করে। শেখ মুজিবকে টেলিফোনে সতর্ক করা হয় এবং অবস্থা সম্বন্ধে অবহিত করা হয়। কিন্তু তিনি তার গৃহত্যাগ করতে অস্বীকার করেন। তিনি বলেন, 'আমি যদি পালিয়ে থাকি তারা আমাকে খুঁজে বের করার জন্য সমস্ত ঢাকা শহর পুড়িয়ে দেবে।' সাইমন ড্রিঙ্ক প্রতিবেদনটিতে আরো জানান যে, "ঐ রাতেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একমাত্র ইকবাল হলেই দু'শো ছাত্রকে হত্যা করা হয়। রুমগুলো বন্দুকের গুলীতে ছিন্নবিচ্ছিন্ন, দু'দিন পরেও শবদেহগুলোকে পুঁততে দেখা যায়, আর কিছু নিকটস্থ পুকুরে ভাসতে থাকে। সাতজন শিক্ষক নিহত হন আর বারজনের একটি পরিবারকে বন্দুকের গুলিতে শেষ করে দেওয়া হয়। সৈন্যরা বহু মৃতদেহ সরিয়ে ফেললেও তখন পর্যন্ত অনেকগুলো পড়েছিল। অনুরূপভাবে অন্য একটি হলে বহু ছাত্রকে হত্যা করে তাদের মৃতদেহ একটি গর্তে ফেলে বুলডোজার দিয়ে সমান করে দেয়া হয়। ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ এবং নিকটবর্তী মসজিদেও বাজুকা নিক্ষেপ করে আগুন ধরিয়ে দেয়া হয়।

বিশ্ববিদ্যালয় আক্রমণের সময়ই সৈন্যবাহিনী রাজারবাগ পুলিশ হেড কোয়ার্টার আক্রমণ করে। ট্যাংকগুলো থেকে অবিরাম বোমাবর্ষণ করে পুলিশদের ঘুমন্ত অবস্থায় হত্যা করা হয়। ঠিক কতজন মারা গেছে জানা না গেলেও এগার শ' পুলিশের মধ্যে খুব কমসংখ্যকই মৃত্যুকে এড়াতে পেরেছেন।

ঠিক এই সময়ই শেখ মুজিবুর রহমানের বাড়িও আক্রমণ করে সৈন্যরা। তাঁর সাথে শেষ যোগাযোগ হয় রাত একটার সময়। তিনি তখন বলেন যে, তাঁর উপর যে কোনো মুহূর্তে আক্রমণ হবার আশংকা করছেন এবং তিনি গৃহভৃত্য এবং গৃহরক্ষী ব্যতীত সবাইকে বাড়ির বাইরে নিরাপদ স্থানে পাঠিয়ে দিয়েছেন। পরে একজন প্রতিবেশীর কাছ থেকে জানা যায় যে, একটা দশ মিনিটে একটি ট্যাংক ও একটি সাঁজোয়া গাড়ী বাড়ির সামনে এসে পৌঁছায়। একজন অফিসার উচ্চস্বরে শেখ মুজিবকে নীচে নেমে আসতে বলে। শেখ মুজিব উত্তরে বলেন, আমি প্রস্তুত। গুলী চালাবার প্রয়োজন নেই। এত কিছু না করে টেলিফোন করলেই আমি পৌঁছে যেতাম। অফিসারটি তখন বাড়িতে ঢুকে গিয়ে বলে, 'আপনাকে গ্রেফতার করা

হলো।' এরপর তিনজন গৃহভৃত্য এবং একজন সঙ্গী ও দেহরক্ষীসহ তাঁকে নিয়ে চলে যায়। তাঁকে নিয়ে যাবার পর পাকিস্তানী সৈন্যরা আবার বাড়িতে প্রবেশ করে সমস্ত কাগজপত্র ইত্যাদি নিয়ে যায়। যাবার আগে তারা সেই বাড়িতে উড্ডীন বাংলাদেশের পতাকা লক্ষ্য করে গুলী চালায়। সেই রাতেই ঢাকা শহরের সর্বত্র আগুন জ্বলতে দেখা যায়। সৈন্যবাহিনী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সম্পূর্ণরূপে দখল করে নিয়েছে এবং আশপাশে গুলী করে বহু লোক হত্যা করেছে। তারা স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা নামিয়ে ফেলে পাকিস্তানের পতাকা তুলেছে। বর্তমানে গুলী করা কিছুটা হ্রাস পেয়েছে। ইন্টারকন্টিনেন্টাল হোটেলেও একদল সৈনিক প্রবেশ করে এবং তারা ঢাকার 'দি পিপল' দৈনিক পত্রিকা অফিসটিকে পুড়িয়ে ধূলিসাৎ করে। সকালের একটু আগে জনসাধারণের ওপর গুলী করা কিছুটা কমে আসে। কিন্তু সূর্য ওঠার পরে সমস্ত শহরে একটা অভূতপূর্ব স্তব্ধতা নেমে আসে। মনে হয়, বাড়িঘর পরিত্যাগ করে সবাই চলে গেছে। কিন্তু সবচেয়ে খারাপ খবরটি তখনো এসে পৌঁছায়নি। পরের দিন ছাব্বিশে মার্চ দুপুরে সৈন্যরা শহরের বিভিন্ন এলাকায় প্রায় পাঁচ লাখ লোকের আবাসস্থলে ঢুকে পড়ে।

পরবর্তী এগার ঘন্টাব্যাপী তারা পরিকল্পিত পন্থায় ধ্বংসকার্য চালায়। ইংলিশ রোড, ফ্রেঞ্চরোড, নয়াবাজার, সিদ্দিক বাজার এবং নামহীন বাজারগুলোকেও পুড়িয়ে ফেলে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দেয়া হয়। নয়া বাজারের একটি লোক সাইমন ড্রিঙ্ককে বলেন যে, তারা হঠাৎ এসে উপস্থিত হয় এবং চলে যাবার সময় বাড়ি ঘরে আগুন দিয়ে যায়। এই সময় যারা বাড়িগুলি থেকে বের হবার চেষ্টা করে তখন তাদের গুলী করে হত্যা করে। যারা রইল তাদের পুড়িয়ে মারলো এবং যারা মুক্তির কামনায় পালাতে চাইল তাদেরকেও গুলী করে হত্যা করা হল। সৈন্যরা পেট্রোলের ক্যানসহ ঘুরেছে এবং পেট্রোল দিয়ে বাড়িগুলিতে আগুন দিয়েছে। একজন পুলিশ ইন্সপেক্টর বলেন যে, তিনি অনেক চেষ্টা করে ত্রিশটি মৃতদেহ আনতে পেরেছেন। ঢাকার গণহত্যায় সবচেয়ে বড় আঘাত লেগেছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে। সৈন্যরা ছাত্রদের ওপরে গুলী করে এবং বাজুকা নিক্ষেপ করে আগুন জ্বালায়। সেই আলোতে পাকিস্তানের হানাদার বাহিনী তাদের কাজ সমাধা করে।

ঢাকা নগরীতে কিছুটা স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে আসার সঙ্গে সঙ্গে এক ত্রাসের সৃষ্টি হয়। উনত্রিশে মার্চ সোমবার সকাল দশটার দিকে লোক ফিরতে শুরু করার পরপরই সন্ত্রাসের সঞ্চার হয়। বেলা দশটার মধ্যে দেখা গেল, নানা অঞ্চলে বিরাট বিরাট ধোঁয়ার কুন্ডলী আকাশে উঠছে আর মানুষ পালিয়ে যাচ্ছে। ছাব্বিশে মার্চ দুপুরের মধ্যে দেখা গেল গাড়ীতে, রিক্সায় বা পায়ে হেঁটে যেভাবে পারছে লোকজন শহর ছেড়ে পালাচ্ছে। পাকিস্তানের হানাদার বাহিনীর ধ্বংসলীলা দেখতে দেখতে তারা নীরবে চলে গেল। দেখলেই বোঝা যায়, কাজটি তারা পরিপাটি করেই করেছে। সতর্কতার সঙ্গে পরিকল্পনা করা হয় এবং নিখুঁতভাবে সে অনুযায়ী কাজ সমাধা করা হয়। তারা দেখছিল আর হেঁটে যাচ্ছিল। সমস্ত সরকারী অফিস খালি করে কর্মচারীরা গ্রামের দিকে ছুটেছে। যারা পলায়নও করতে পারল না তারা ইতস্তত উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘুরে ঘুরে তাদের ধ্বংসস্তূপে পরিণত বাড়িঘর দেখছে। রাস্তায় অনেকগুলি রেডক্রসের গাড়ী ঘুরতে দেখা গেল ।

"ঢাকার রেসকোর্সের কাছে একটি হিন্দু মন্দির সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস এবং এর ভিতরের, সবাইকে হত্যা করা হয়।" সাইমন ড্রিঙ্ক তার দীর্ঘ প্রতিবেদনে আরো উল্লেখ করেন যে, "একজন পাঞ্জাবী মিলিটারী অফিসার অহংকার করে বলছিল, কেউ আমাদের বিরুদ্ধে কথা বলতে পারে না। যদি করে তবে আমরা তাকে হত্যা করব। তারা অনেক কথা বলেছে, তারা দেশদ্রোহী, আমরা নই। আমরা যুদ্ধ করছি আল্লাহর নামে এবং ঐক্যবদ্ধ পাকিস্তানের নামে।"

সাইমন ড্রিঙ্ক উপসংহারে বলেন যে, "শেখ মুজিবের আন্দোলনের ধ্বংসাবশেষ থেকে যদি কিছু শিখবার থাকে সেটা এই যে—পাকিস্তান সেনাবাহিনীকে কখনোই যেন ছোট করে দেখা না হয় এবং ইয়াহিয়া খান যতরকম করেই বক্তৃতা করুন না কেন এ কথা যেন উপলব্ধি করা হয় যে, তাদের কখনো ক্ষমতা হস্তান্তরের ইচ্ছা ছিল না।"

এই প্রতিবেদনটি ত্রিশে মার্চ 'ডেইলি টেলিগ্রাফ'-এ প্রকাশিত হবার পর প্রবাসী বাঙ্গালীরা দুঃখ ও বেদনায় বিহ্বল হয়ে পড়েন এবং নিজ নিজ অঞ্চলে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন। তাঁরা এই পত্রিকা কিনে নিজেদের সঙ্গে রাখতেন এবং বিদেশীদের দেখাতেন।

সাত

আমি এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহে বৃটিশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী স্যার আলেক ডগলাস হিউমের সঙ্গে দেখা করে তাঁকে বঙ্গবন্ধুর মুক্তি ও রক্তক্ষয় বন্ধ করার জন্য চেষ্টা করতে অনুরোধ জানাই। সাইমন ড্রিংয়ের বিস্তৃত বিবরণটির প্রতি তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করি। তাঁর সঙ্গে ঘন্টাদেড়েক কথা হয়। সে সময় সাদারল্যান্ড ও ব্যারিংটন উপস্থিত ছিলেন। স্যার আলেক আগে লর্ড হিউম নামে পরিচিত ছিলেন। কিন্তু রক্ষণশীল দল তাকে প্রধানমন্ত্রী করার ইচ্ছে প্রকাশ করলে তিনি হাউজ অব কমন্সের সদস্য নির্বাচিত হবার সময় লর্ড উপাধি ত্যাগ করেন এবং প্রধানমন্ত্রী হন। পরবর্তীকালে রক্ষণশীল দলের নেতা এডোয়ার্ড হীথ নির্বাচিত হলে হীথ মন্ত্রিসভায় স্যার আলেক পররাষ্ট্রমন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণ করেন। আমাদের স্বাধীনতা আন্দোলন চলাকালে পুরো সময়টাই তিনি পররাষ্ট্রমন্ত্রী ছিলেন। তিনি স্কটল্যান্ডের খুবই অভিজাত পরিবারের মানুষ। হিউম পরিবারের তিনি চতুর্দশ লর্ড। বর্তমানে তিনি আবার লর্ড উপাধি গ্রহণ করে হাউস অব লর্ডস-এ যোগদান করেছেন। তার সঙ্গে একাত্তর সালে অনেকবার আমার দেখা হয়েছে। তিনি খুবই বিনয়ী, নম্র মানুষ। সুরুচি ও স্বাধীনতাবোধ তার মধ্যে লক্ষণীয়। তিনি বেশ কিছু বইও লিখেছেন।

আমি ঐদিন তাঁকে আমাদের স্বাধীনতা আন্দোলনের কারণসমূহ ব্যাখ্যা করি এবং বলি যে সাড়ে-সাত কোটি বাঙালীই স্বাধীনতা অর্জনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। আলোচনার ভিত্তিতে আমরা

চেয়েছিলাম সংসদীয় গণতন্ত্র। আমাদের দাবী ছিল কেন্দ্রীয় পরিষদের সদস্য সংখ্যা জনসংখ্যার অনুপাতে ধার্য হবে। আর কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে থাকবে দেশ রক্ষা, পররাষ্ট্র বিষয় এবং মুদ্রা ব্যবস্থা। আমরা দেশের দু'টি অংশের দু'টি মুদ্রা ব্যবস্থা চেয়েছিলাম। কিন্তু সবই ছিল আলোচনা সাপেক্ষ। রাজস্ব থাকবে প্রাদেশিক সরকারের নিকট। বৈদেশিক মুদ্রার আয়ের হিসেব আলাদা করে দেখাতে হবে এবং তার ওপর কর্তৃত্ব থাকবে প্রাদেশিক সরকারের। আর তাছাড়া আমরা একটি প্যারা-মিলিটারী দল গঠন করতে পারব। আমি স্যার আলেককে আরো বলি যে, পরিষদ বসতে শুরু করলে আলোচনার মাধ্যমে একটি গ্রহণযোগ্য শাসনতন্ত্র রচিত হতে পারতো, কিন্তু সব কিছু বন্ধ করে ইয়াহিয়া খান শুরু করলেন ইতিহাসের নির্মমতম গণহত্যা।

বঙ্গবন্ধুর প্রাণরক্ষার জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালাতে অনুরোধ করি পররাষ্ট্রমন্ত্রীকে। তিনি আমাকে বলেন যে, বৃটিশ সরকার এব্যাপারে যতদূর সম্ভব চাপ দেবেন। তিনি আরো জানান যে, বঙ্গবন্ধু সুস্থ আছেন এবং তার প্রাণহানির আশংকা সে সময় পর্যন্ত ঘটেনি। আমি বলি, বৃটেন বাক-স্বাধীনতা ও কর্মের স্বাধীনতার জন্য বিখ্যাত। আমরা নিয়মতান্ত্রিকভাবে শৃঙ্খলা রক্ষা করে পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীর নৃশংসতা এখান থেকেই বিশ্ববাসীকে জানাবো। কেননা আমাদের বিশ্বাস স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের লড়াইয়ে ঐতিহ্যবাহী বৃটেন আমাদের বাধা দিতে পারে না। আমি এখানে একটি কথা স্পষ্ট করে বলতে চাই যে, আমি একবারও তাঁর কাছে আন্দোলন চালানোর অনুমতি চাইনি। আমি শুধু তাঁর সম্মুখে ঘোষণা করার মতো করে বলেছি যে, তার দেশে আমরা প্রধান কার্যালয় স্থাপন করে সারা পৃথিবীতে কাজ করব। তিনি আমাদের কাজ করতেও বলেননি, নিষেধও করেননি। আমার কথার সময় তাঁর মৃদু হাসিটিকেই সম্মতিসূচক ইঙ্গিত মনে করেছি।

তিনি এক পর্যায়ে আমাকে বললেন যে, পাকিস্তানের হাইকমিশনার তাঁর অনুপস্থিতিতে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে এসে জানিয়ে গিয়েছেন যে, বাঙালীরা এখন চুপচাপ হয়ে গিয়েছে এবং পাকিস্তানী শাসনের প্রতি কোনো বিরোধিতা নেই। তার উত্তরে আমি বলি যে, বঙ্গবন্ধু স্বয়ং স্বাধীনতা ঘোষণা করেছেন, সেটা যদি বিরোধিতা না হয়, তাহলে তো তাদের উচিত বঙ্গবন্ধুকে মুক্তি দেয়া। আমি আরো বলি, 'আসল কথা কি জানেন ? এমন নির্মমতা ও বর্বরতার সঙ্গে আক্রমণ হবে তা আমরা ভাবতেও পারিনি। তাই প্রথম আক্রমণের পরেই প্রতিআক্রমণ করা সম্ভব হয়নি। কিন্তু যে শাসনকে সাড়ে সাত কোটি বাঙালী প্রত্যাখ্যান করেছে তার নিশ্চয়ই পরিসমাপ্তি ঘটবে।'

আমি জানি না কোত্থেকে আমি এত আত্মবিশ্বাস ও দৃঢ়তা পেয়ে এমনভাবে বললাম যে, মনে হলো বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েই গেছে। এটা কোনো কূটনৈতিক কৌশল নয়। প্রথম থেকেই সত্যের জয় হবেই এই পরম বিশ্বাস আমার মনে বদ্ধমূল হয়ে গিয়েছিল আর এই মনোভাবের প্রকাশ ছিল আমার প্রতিটি কথায়।

আমি ইচ্ছে করেই পররাষ্ট্রমন্ত্রীর কাছে বৃটেনে থাকার জন্য কোনরূপ ভিসা চাইনি। হঠাৎ তিনি নিজেই আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, আমি কোথায় থাকব। আমি তাঁকে বললাম, আমি ঠিক করেছি যে, আমার দেশ স্বাধীন না হওয়া পর্যন্ত বৃটেনে অবস্থান করব আর স্বাধীনতার

জন্য সংগ্রাম চালিয়ে যাব। এর উত্তরেও তিনি কিছু না বলে একটি প্রীতিপূর্ণ হাসি উপহার দিলেন। কথার শেষে লিফট পর্যন্ত আমাকে সহাস্যে বিদায় দিলেন এবং নিজে থেকেই বললেন, কোনো প্রয়োজন হলে আমি যেন তাকে জানাই। তাঁকে ধন্যবাদ দিয়ে সেদিনকার মতো বিদায় নিলাম। পররাষ্ট্রমন্ত্রী যে আপনজনের মতো করে আমাকে প্রথম দিনেই গ্রহণ করলেন তার পেছনে সাদারল্যান্ড ও ব্যারিংটনের যথেষ্ট অবদান ছিল সে কথা বলবই। আমিও লর্ড হিউমের মধ্যে সভ্যতা ও সংস্কৃতির একটি সূক্ষ্ম প্রকাশ দেখতে পাই এবং তাঁর মাধুর্যমন্ডিত হৃদয় আমাকে গভীরভাবে আকর্ষণ করে। তাই এখনও যখনই লন্ডনে যাই তাঁর সঙ্গে একটি প্রীতিপূর্ণ সন্ধ্যা কাটাই। প্রায় প্রতিবারেই আমরা আতিথ্য গ্রহণ করি।

আট

পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে বেরিয়ে এসে একটা ট্যাক্সি নিয়ে বিবিসি'তে উপস্থিত হলাম। সেখানে যাওয়ার আগেই জানানো হয়েছিল যে, পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ শেষ করেই বিবিসি'তে আসব। সেখানে সিরাজুর রহমান ও শ্যামল লোধ প্রস্তুত হয়েই ছিলেন। তাঁরা আমার একটি সাক্ষাৎকার নিলেন। এই সাক্ষাৎকারে আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ও শিক্ষক হত্যার কথা বলতে যেয়ে স্বভাবতই ভেঙ্গে পড়ি এবং আমি বিশ্ববাসীকে এই অত্যাচারের কাহিনী জানাবো বলি। আর দেশ স্বাধীন না হওয়া পর্যন্ত দেশে ফিরব না, সে কথাও উল্লেখ করি। ডেইলি টেলিগ্রাফের রিপোর্টার পিটার গিল আমার একটি সাক্ষাৎকার নেন। পরবর্তীকালে আমি বহু সাক্ষাৎকার দিয়েছি সাংবাদিকদের। কিন্তু ঐ দিনের এই দু'টি সাক্ষাৎকারই প্রথম। এই সাক্ষাৎকার বিবিসি সেদিনই প্রচার করে এবং তার ফলেই আমার দেশবাসী জানতে পারেন যে, পাকিস্তান সরকারের সঙ্গে আমি সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করে স্বাধীনতার জন্য কাজ করে যাচ্ছি। এই দু'টি সাক্ষাৎকারের পরে আমি যখন বিবিসি ত্যাগ করছিলাম সে সময় সিরাজুর রহমান আমার সঙ্গে পাকিস্তান দূতাবাসের সেকেন্ড সেক্রেটারী মহিউদ্দিন আহমদকে পরিচয় করিয়ে দেন। তিনি সিরাজুর রহমানের সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন। মহিউদ্দিন আমাকে বললেন, 'স্যার, আমি কিন্তু নির্দেশের অপেক্ষায় আছি। আপনারা ডাকলেই আমাকে পাবেন।' উত্তরে আমি তাকে অশেষ ধন্যবাদ দেই। কিন্তু তখন পর্যন্ত প্রবাসী সরকার গঠিত হয়নি। আমাদের নিজেদেরও কোনো সংগঠন দাঁড়ায়নি। তাই তাকে চাকরি ছেড়ে দিয়ে আমাদের সঙ্গে যোগদানের কথা বলিনি।

অবশ্য ৬ই এপ্রিল পাকিস্তানের দু'জন কূটনৈতিক অফিসার পাকিস্তানের সঙ্গে সকল সম্পর্ক ছিন্ন করেন। তারা হলেন খান মোহাম্মদ শিহাবউদ্দিন এবং আমজাদুল হক। এরা দু'জনেই বাঙালী। শিহাবউদ্দিন দিল্লীর পাকিস্তানী দূতাবাসের সেকেন্ড সেক্রেটারী আর আমজাদুল হক প্রেস এ্যাটাচি ছিলেন। এদের আগে আর কোনো সরকারী কর্মচারী পাকিস্তান সরকারের সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ করেননি। আমরা যখনই সময় পেতাম দিল্লীর রেডিও ধরার চেষ্টা করতাম। ৬ই এপ্রিল রাতে ইয়র্ক থেকে ফিরে হঠাৎ দিল্লী রেডিও থেকে শিহাবউদ্দিন ও আমজাদুল হকের কণ্ঠেই স্বাধীনতা সংগ্রামে যোগদানের কথা শুনলাম। এই সংবাদটি বাঙালী মহলে আমরা প্রচার করি এবং এতে খুব উৎসাহের সৃষ্টি হয়। বর্তমানে শিহাবউদ্দিন পোল্যান্ডে বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত। আমজাদুল হকও বিদেশে সিনিয়র কূটনীতিবিদ। তাঁদের দেশপ্রেম ও সাহসিকতা অন্য কূটনীতিবিদদের অনুপ্রেরণা যোগায়।

নয়

এই সময়টায় আমি যে বাসায় ছিলাম তার টেলিফোন নম্বর পাকিস্তান দূতাবাস সংগ্রহ করেছিল। পাকিস্তানের হাইকমিশনার সালমান আলী আমাকে ডিনারে আমন্ত্রণ জানান। অসম্মতি জানালেও অনুরূপ টেলিফোন পেতে থাকি। যেসব বাঙালী আমার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করছিলেন তাঁরা আমার পক্ষে সেই বাড়িতে বসবাস আর নিরাপদ মনে করলেন না। ঢাকা যাদুঘরের পরিচালক এনামুল হক এবং আইনের ছাত্র শামসুল মোর্শেদ অন্য একটি বাসস্থান খুঁজছিলেন। তাঁদের চেষ্টায় এক সপ্তাহের জন্য ফিনচলিতে একটি ফ্ল্যাটে ওঠবার ব্যবস্থা হলো। শামসুল মোর্শেদের ভাগ্নে ফরিদ হাসান লন্ডনে চাটার্ড একাউন্টেন্সি করছিলেন। এই ফ্ল্যাটটি তাঁর তত্ত্বাবধানে ছিল। আমার বেশ মনে আছে, সন্ধ্যার দিকে ট্যাক্সি ডেকেছি, জিনিসও কিছু উঠেছে, ঠিক সেই মুহূর্তে আমার টেলিফোন বেজে উঠলো। রিসিভার তুলতেই এক্সচেঞ্জ থেকে বলল যে, কলকাতা থেকে মিঃ চৌধুরীকে চাচ্ছে। আমিই মিঃ চৌধুরী, একথা বলায় লাইন দিল। টেলিফোনের ওপার থেকে বলতে শোনা গেল, 'আমি রহমত আলী, আমাকে চিনতে পেরেছেন ?' বললাম, 'ঠিকমত চিনতে পারছি না।' তখন তিনি বললেন, 'স্যার আমি ব্যারিস্টার আমিরুল ইসলাম। এখানে সকল কাগজে বিবিসি'তে প্রদত্ত আপনার বিবৃতিটি বেরিয়েছে এবং সবাই খুব আনন্দিত হয়েছেন। এখানে শিগগিরই অস্থায়ী সরকার গঠিত হচ্ছে। জনাব তাজউদ্দীন প্রধানমন্ত্রী হচ্ছেন। তিনি আপনাকে বিদেশে প্রবাসী সরকারের বিশেষ প্রতিনিধি নিযুক্ত করতে চান। আমাকে আপনার সম্মতি নিতে বলা হয়েছে। আমীর

আলীর কাছ থেকে আপনার টেলিফোন নম্বর পেয়েছি।' আমি বললাম যে, 'আপনাদের সঙ্গে কোনরূপ যোগাযোগ না হলেও আমি স্বাধীনতা আন্দোলনে ব্যক্তিগতভাবে কাজ করে যাচ্ছি। আমি ধন্যবাদের সঙ্গে বিশেষ প্রতিনিধিরূপে কাজ করার সম্মতি জানাচ্ছি। আপনি নেতৃবৃন্দকে আমার সালাম জানাবেন এবং বলবেন যে, স্বাধীনতা সংগ্রামে আমার সাধ্যমতো সাহায্য করব।' আমিরুল ইসলাম বললেন, 'শিগগিরই শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান হবে এবং তার পরেই আপনার নিয়োগপত্র পাঠিয়ে দেয়া হবে।' তিনি আরো বললেন যে, বঙ্গবন্ধুর অনুপস্থিতিতে ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতি হবেন সৈয়দ নজরুল ইসলাম। আমি তাঁকে বললাম, 'আমি কয়েকদিনের জন্য অন্য একটা ফ্ল্যাটে উঠে যাচ্ছি। আপনি দু'তিন মিনিট পরে ফোন করলেই আমাকে পেতেন না।' সৌভাগ্যক্রমে নতুন ফ্ল্যাটের টেলিফোন নম্বর আমার কাছে ছিল। সেটা আমিরুল ইসলামকে দেই। তিনি বলেন যে, কলকাতায় তাঁকে রহমত আলী নামে চেনে। আমি ব্যাপারটি বুঝে গেলাম এবং তারপর থেকে আমি তাঁকে রহমত আলী বলেই সম্বোধন করেছি। টেলিফোনে কথা শেষ হবার পরই দু'টো ট্যাক্সি নিয়ে ফিনচলির ফ্ল্যাটে চলে এলাম। এনামুল হক এবং শামসুল মোর্শেদ সঙ্গে এলেন। এটি তাঁদের এক বন্ধুর ফ্ল্যাট।

তিনি ইংল্যান্ডের বাইরে বেড়াতে গেছেন। আমরা সাতদিন সেই ফ্ল্যাটে থাকতে পারি এবং তার মধ্যেই অন্যত্র উঠে যেতে হবে। আমার কয়েকজন সহকর্মী খুব কম ভাড়ায় কোথায়ও আমার জন্য একটি বাসস্থানের চেষ্টা করছিলেন। শেষ পর্যন্ত খোঁজাখুঁজি করে ইস্ট এ্যাক্টনে একটি ছোট বাড়ি পাওয়া গেল। বাড়ির মালিক ভাড়া দিতে পারার নিশ্চয়তা চান। আমি কমনওয়েলথ সেক্রেটারীয়েটের ডিরেক্টর উইলিয়াম পিটার্সকে ফোন করলে তিনি বাড়িওয়ালাকে ফোনে আমাকে বাড়ি দিতে অনুরোধ করলেন। এরপরে বাড়িওয়ালা আমাকে ভাড়া দিতে সম্মত হন। আমি প্রতিশ্রুত সময়ের মধ্যে ফিনচলির ফ্ল্যাটটি ছাড়তে পেরে খোদাকে অশেষ ধন্যবাদ জানাই।

দশ

এই ফিনচলির ফ্ল্যাটে থাকতেই হঠাৎ একদিন একটা টেলিফোন এলো। আমি রিসিভার তুলতেই অপর দিক থেকে একজন ইংরেজ বললেন, 'আমি কি জাস্টিস চৌধুরীর সঙ্গে কথা বলছি ?' আমি বললাম, 'হ্যাঁ, বলুন।' তিনি বললেন, 'আমার নাম ল্যাঙ্গলী, আমি স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের একজন অফিসার। আপনার সঙ্গে কিছু কথা বলা দরকার। শিগ্‌গির একটা সময় দিলে ভাল হয়।' স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের নাম শুনে আমি শঙ্কিত হলাম যে, হয়তো আমাকে ইংল্যান্ড ত্যাগ

করতেও বলা হতে পারে। কেননা আমি প্রতিদিন বাঙালীদের নিয়ে বৈঠক করছি। আমি ভাবলাম অনিশ্চয়তার মধ্যে থাকার চেয়ে কথাটা শুনে ফেলাই ভাল। যদি দুঃসংবাদই হয় তবে কিছু করার নেই। নিজেকে অত্যন্ত শান্ত রেখে বললাম, 'কখন আসতে চান বলুন। আমি অবশ্য আজ বাড়িতেই আছি। যদি আজ আসতে চান আসতে পারেন।'

ল্যাঙ্গলী বললেন, দু'ঘণ্টা পরে আসছি।' ঠিক দু'ঘণ্টা পর আমার কলিংবেল বেজে উঠল। আমি নিজে গিয়ে দরজা খুলে দিলাম। দু'জন ভদ্রলোক প্রবেশ করলেন। ল্যাঙ্গলী তার হাত এগিয়ে দিয়ে বললেন, 'স্যার, আমি ল্যাঙ্গলী আর ইনি আমার সহকর্মী ওয়াকার।' আমি তাঁদের ড্রইংরুমে নিয়ে এসে বসতে বললাম। ল্যাঙ্গলী সময়ক্ষেপণ না করে বলতে শুরু করলেন, 'আমরা দু'জনেই স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের অফিসার। ছাব্বিশে মার্চ লন্ডনে আসার পরেই পাকিস্তান সরকারের বিরুদ্ধে তারা যোগ দেয়ার কথা ইতিমধ্যে জেনেছে। আমরা আপনাকে বলতে এসেছি যে, পাকিস্তান সরকার সুবিধে পেলেই অপহরণ করে আপনাকে পাকিস্তানে নিয়ে যাবে। এই জন্য পাকিস্তানের সামরিক বাহিনীর কয়েকজন অফিসার সাদা পোশাকে লন্ডনে এসেছেন।' আমি বললাম, 'আপনারা কি আমাকে ভয় দেখাচ্ছেন ? উত্তরে বললেন, 'একেবারেই না স্যার, বরং উল্টোটা। আপনি নিয়মতান্ত্রিকভাবে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে আন্দোলন করুন, আমাদের তাতে আপত্তি নেই। আমরা আপনাকে বলতে এসেছি, আপনি যেন সাবধানে চলাফেরা করেন।' আমি অনুতপ্ত হৃদয়ে তখনই অনুভব করলাম যে, ভয় দেখানোর কথাটা আমার পক্ষে বলা উচিত হয়নি। এখানে বলতে পারি যে, নয় মাস আমাকে অসংখ্য লোকের সঙ্গে কথা বলতে হয়েছে, সাক্ষাৎকার দিতে হয়েছে, কিন্তু আর কোথায়ও কোনো কথা বলে আমার একথা মনে হয়নি যে, কথাটা ওভাবে বলা উচিত হয়নি। আমি ল্যাঙ্গলীকে বললাম, 'আপনারা যে কষ্ট করে একথা আমাকে জানাতে এসেছেন তার জন্য আন্তরিকভাবে আমি কৃতজ্ঞতাবোধ করছি।' তিনি বললেন, আমাদের সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে, যুক্তরাজ্যে অবস্থানকালে আপনাকে যাতে কেউ অপহরণ করতে না পারে তার জন্য সাধ্যানুযায়ী সকল ব্যবস্থা অবলম্বন করা হবে। তবে আমার এই কথা থেকে আপনি কিছুতেই যেন মনে না করেন যে, আমরা আপনার কাজ অথবা আন্দোলনকে সমর্থন করছি। আমরা সমর্থনও করছি না, বাধাও দিচ্ছি না। আপনি তো জানেন যতক্ষণ কেউ কোনো আইন ভঙ্গ না করছেন, তাঁর চিন্তা ও কর্মের স্বাধীনতা আমাদের দেশে রয়েছে। আমাদের দেশে আপনাকে অপহরণ করলে আমাদের অপমান হয়। শুধু সে কারণেই আমরা চেষ্টা করব যাতে আমাদের দেশে কেউ আপনাকে অপহরণ না করতে পারে। আমি আবার তাঁদের ধন্যবাদ জানালাম। ল্যাঙ্গলী বলতে শুরু করলেন, 'কিছু যদি মনে না করেন সতর্কতামূলক ব্যবস্থা সম্বন্ধে আপনাকে কিছু বলতে চাই। আমি গত কয়েকদিন লক্ষ্য করেছি আপনি সাধারণতঃ আন্ডার গ্রাউন্ড ট্রেনে ঘুরে বেড়ান এবং প্ল্যাটফর্মে একেবারে প্রথম দিকে দাঁড়িয়ে থাকেন। আপনি তো জানেন, আমাদের রেল লাইনগুলো বিদ্যুৎচালিত। আপনাকে ধাক্কা দিলে আপনি তৎক্ষণাৎ লাইনে পড়ে যাবেন এবং তড়িতাহত হয়ে এক মুহূর্তেই আপনার মৃত্যু হতে পারে। সেইজন্য প্ল্যাটফর্মের পেছনের দিকে দাঁড়াবেন যাতে ধাক্কা দিলেও সামলে উঠতে পারেন। যদি

হাতে সময় থাকে তাহলে আন্ডার গ্রাউন্ডে চলাফেরার চাইতে বাসে চলাফেরা করা অধিকতর নিরাপদ।' আমি বললাম, 'আপনারা যেমন বলছেন তেমনই করব।' তারপর ল্যাঙ্গলী আরো বললেন, 'আপনার বাসার টেলিফোন নম্বর অত্যন্ত আপন লোক ছাড়া কাউকে দেবেন না এবং কাকে কাকে দিলেন তার লিষ্ট আমাকে দিতে হবে।' আমি বললাম, 'দেখুন, আমি একটা আন্দোলনে যোগ দিয়েছি, অনেক লোকের সঙ্গে আমার কাজ করতে হচ্ছে। তাঁদেরকে আমার ফোনের নম্বর না দিলে কাজ করব কি করে ?' তার উত্তরে তিনি বললেন, আপনাদের তো নিশ্চয়ই একটি কার্যালয় থাকবে, সেখানকার নম্বর দেবেন। তিনি আরো বললেন যে, বাইরে কেউ কলিং বেল টিপলেই দরজা খুলে দেবেন না। আগে জানালা দিয়ে দেখবেন কে বেল টিপছেন, তারপর বাইরের দরজা খুলবেন। তিনি আমাকে জানালেন, 'এখন থেকে আপনার গতিবিধি আমরা লক্ষ্য করব। আপনি একেবারেই বুঝতে পারবেন না। কিন্তু আপনি আমাদের দৃষ্টির বাইরে থাকবেন না। তথাপি আপনি যদি কোনো সন্দেহজনক কিছু দেখতে পান যে কোনো ফোন থেকে এই নম্বরে ফোন করলে অমনি মিনিটের মধ্যে সাহায্য পৌঁছে যাবে।' আমি আবার তাকে ধন্যবাদ দিলাম। তিনি চলে গেলেন।

এরপর সংগ্রামের নয় মাসই ল্যাঙ্গলী এবং তাঁর বিভিন্ন সহকর্মী আমার সঙ্গে দেখা করে আমার নিরাপত্তার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন। আমি যখনই কোনো সভায় যোগদান করেছি, ইউনিফর্ম পরিহিত পুলিশ ছাড়াও তাঁরা উপস্থিত থাকতেন।

এগার

ব্যারিস্টার আমিরুল ইসলামের সঙ্গে কথার পর আরো দৃঢ়ভাবে অনুভব করি যে, আমার পক্ষে কোনো দল বা সমিতিতে যোগ দেওয়া উচিত হবে না। আমি বাংলাদেশ সরকারের প্রতিনিধি হিসেবে বিভিন্ন দলের সংগ্রামী স্পৃহা ও প্রচেষ্টাকে সমন্বিত করে যাব। ভাবলাম, এখন আমি নির্দলীয় ব্যক্তি হিসেবে স্বাধীনতার জন্য কাজ করব। তারপর বাংলাদেশ সরকারের প্রতিনিধি হওয়ার কারণে কোনো দল বা সমিতিতে যোগদান এড়াতে পারব।

রাতে বাঙালীদের সঙ্গে বৈঠক আর দিনে কয়েকজন সমমনা বাঙালীসহ পার্লামেন্ট হাউসে গিয়ে সহানুভূতিশীল সদস্যদের সঙ্গে দেখা করছিলাম। এভাবেই প্রথম দিকের দিনগুলি কাটছিল। পিটার শোর, ব্রুস গলডগলাসম্যান ও মাইকেল বার্নসের সঙ্গে প্রায়ই দেখা হতো। তাঁরা বাংলাদেশের হত্যাযজ্ঞের সংবাদে খুবই মর্মাহত ছিলেন। তাঁরাও সকল দলের কর্মপ্রবাহের সমন্বয় সাধনের উপর খুব জোর দেন। স্টোন হাউসের সঙ্গে কিছু পরে দেখা হয়। কেননা,

তিনি আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দের কলকাতা পৌঁছানোর সংবাদ শুনেই কলকাতা চলে যান। তিনি কলকাতায় যাচ্ছেন শুনে আমি তাঁকে ফোন করি। তিনি বলেন, অক্সফাম কলকাতায় আগত শরণার্থীদের সাহায্য করতে চায়। অবিলম্বে তার ব্যবস্থা করার জন্য তিনি কলকাতা যাচ্ছেন।

আমি এপ্রিলের দ্বিতীয় সপ্তাহের প্রথম দিকে অধ্যাপক জিনকিনের সঙ্গে দেখা করি। তিনি ভারতীয় সিভিল সার্ভিসের (আই সি এস) সদস্য ছিলেন। এখন অবসর জীবন যাপন করছেন। তিনি রক্ষণশীল দলের কমনওয়েলথ গ্রুপের সেক্রেটারী। তাঁর সঙ্গে রাজিউল হাসান দেখা করে আমার সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা করেন। রাজিউল হাসানকে সবাই রঞ্জু বলে চেনে। যতদূর মনে পড়ে তখন তিনি চার্টার্ড একাউন্টেন্সী পড়ছিলেন। অত্যন্ত উৎসাহী যুবক। পরবর্তীকালে তিনি আমার অবৈতনিক একান্ত সচিব রূপে কাজে সাহায্য করেছেন। বর্তমানে তিনি বাংলাদেশ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ফার্স্ট সেক্রেটারী।

প্রফেসর জিনকিন আমাকে রক্ষণশীল দলের পার্লামেন্টের সদস্যবৃন্দের সামনে বক্তৃতা দিতে আমন্ত্রণ জানান। আমি তাঁর আমন্ত্রণ সানন্দে গ্রহণ করি। তবে এমন সভা আয়োজন করতে লম্বা নোটিশ দিতে হয়। এই সভাটি প্রায় মাসখানেক পরে রক্ষণশীল দলের প্রধান কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়। লর্ড সেলকারক্ এই সভায় সভাপতিত্ব করেন। সভায় প্রায় ঘন্টাখানেক আমাদের স্বাধীনতা আন্দোলনের কারণ এবং সাম্প্রতিক ঘটনাবলীর কথা তুলে ধরি। আমার বক্তৃতার পর লর্ড সেলকারক্ একটি সহানুভূতিপূর্ণ ভাষণ দান করেন। উপস্থিত সদস্যবৃন্দের অনেকেই আমাকে প্রশ্ন করেন। প্রশ্নের ধারা থেকে বেশ বোঝা যাচ্ছিল যে, তাঁরা আমাদের আন্দোলনকে সমর্থন করেন। তবে পাকিস্তানের অপপ্রচার সম্বন্ধে আমাদের কি বলার আছে সেটা তাঁরা ভালোভাবে জানতে চেয়েছিলেন। সভাটি খুবই ফলপ্রসূ হয়। বৃটেনের লেবার পার্টি সাধারণতঃ মানুষের অধিকার অর্জনের আন্দোলনের সমর্থনে অগ্রণী ভূমিকা নিয়ে থাকে। কিন্তু এই সভায় পার্লামেন্টের রক্ষণশীল দলেরও সমর্থনের আশ্বাস পেয়ে আমাদের কর্মীগণ খুব উৎসাহিত হন।

বার

আমাদের একটি কেন্দ্রীয় কমিটি গঠন প্রচেষ্টায় ষোলই এপ্রিল একটি গুরুত্বপূর্ণ দিন। সে দিন ব্যারিস্টার রুহুল আমীন কয়েকজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিকে তাঁর বাসায় নিমন্ত্রণ করেন। তিনি নিজে এসে আমাকে তার বাড়িতে নিয়ে গেলেন। সেখানে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন

লন্ডনস্থ আওয়ামী লীগের বর্ষীয়ান নেতা গউস খান, ব্যারিস্টার শাখাওয়াত হোসেন, শেখ আবদুল মান্নান, ডঃ হারুন, আমীর আলী এবং বিভিন্ন গ্রুপের নেতৃবৃন্দ। সেখানে প্রত্যেকেই স্বাধীনতা আন্দোলনের জন্য স্বতন্ত্রভাবে তাঁদের দল যা করতে পেরেছেন, জানান। আমি তাদের কাছে পুনরায় ঐক্যবদ্ধ কেন্দ্রীয় কমিটি গঠনের জন্য আবেদন জানাই। তাঁরা যথাসাধ্য চেষ্টা করার প্রতিশ্রুতি দেন। কিন্তু ঐ রাতে কমিটির কাঠামো তৈরী করা সম্ভব হলো না। রাত দু'টোর দিকে যখন রুহুল আমীন আমাকে বাসায় রেখে গেলেন, আমি তাঁর কাছে আমার মনের হতাশা ব্যক্ত করি। তিনি অবশ্য আমাকে বলেন, 'আজ সবাই উপলব্ধি করেছেন যে, আর দেরী করা ঠিক হবে না। অতএব, আশা করা যায় শিগগিরই একটা কিছু হবে।' পরের দিন আরেকটি সভা হলো। তাতেও আমি আগের কথারই পুনরাবৃত্তি করি। ঐদিন আমি বেশ চেষ্টা করে রুক্ষতার অভিনয় করি এবং বলি যে, কেন্দ্রীয় কমিটি গঠনের ব্যাপারে একমত না হলে আমি আর ঘরোয়া বৈঠকে যোগদান করবোনা। আমি তাঁদেরকে বলি যে, আমরা সকলেই যেখানে কেন্দ্রীয় কমিটির প্রয়োজনীয়তা তীব্রভাবে অনুভব করছি সেখানে শুধুমাত্র কার্যকর সংসদে কারা সদস্য হবেন সেই ব্যাপারে একমত হতে পারছি না, এটা খুবই লজ্জার বিষয়। আর তাছাড়া সমন্বয়ের অভাবে একই সময়ে দুটি দল একই অঞ্চলে সভা বা শোভাযাত্রার ব্যবস্থা করলে প্রতিযোগিতার মনোভাব থেকে বৈরিতা দেখা দেওয়া স্বাভাবিক। বাঙালীরা বাইশ এবং তেইশে এপ্রিল দু'টি সভা করেন। এই সভা দু'টিতে স্থির হয় যে, কভেন্ট্রি শহরে আহুত সভায় একটি কেন্দ্রীয় কমিটি গঠিত হবে। বাইশ এবং তেইশ তারিখে লন্ডনে অনুষ্ঠিত কর্মীদের দু'টি বৈঠকে আমি যোগদান করিনি। কেন্দ্রীয় কমিটি গঠিত না হলে আমি যে তাঁদের সঙ্গে কাজ করব না, সেটা বোঝাবার জন্যই অনুপস্থিত থাকলাম।

তের

যাইহোক, তেইশে এপ্রিল আমাকে খবর দেওয়া হয় যে, কভেন্ট্রির সভায় কমিটি গঠিত হবে এবং আমার উপস্থিতি সকলেরই কাম্য। তেইশে এপ্রিলেই রকিবউদ্দীন আমাকে ফোন করে জানান যে, তিনি অল্পক্ষণ আগে কলকাতা থেকে এসে পৌঁছেছেন। তাঁর সঙ্গে সদ্য গঠিত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার বহির্বিশ্বে তার প্রতিনিধিরূপে আমার নিয়োগপত্র পাঠিয়েছেন। তাঁর টেলিফোনের আগেই কলকাতা থেকে ব্যারিস্টার আমিরুল ইসলাম টেলিফোন করে বলেছিলেন প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদের নির্দেশ অনুসারে আমাকে জানাচ্ছেন যে, আনুষ্ঠানিকভাবে মুজিবনগর সরকার সতেরই এপ্রিল শপথ গ্রহণ করেছেন এবং তাঁরা বহির্বিশ্বে

স্বাধীনতা আন্দোলন পরিচালনার দায়িত্ব আমার উপর অর্পণ করেছেন। একুশে এপ্রিল অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি এই নিয়োগপত্রে স্বাক্ষর করেছেন। সেদিন একই সঙ্গে আওয়ামী লীগ নেতা আবদুল মান্নানের সঙ্গে কথা হয়। তিনি আমার স্বাধীনতা আন্দোলনে যোগদানে আনন্দ প্রকাশ করেন। তিনি পরবর্তীকালে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হয়েছিলেন। আর লন্ডনে বসবাসরত বাঙালী ব্যবসায়ী রকিবের মারফত পত্রটি পাঠানো হয়েছে। তেইশে এপ্রিল দুপুরে এনামুল হকসহ আমি রকিবের রেষ্টুরেন্টে গেলাম। তিনি মধ্যাহ্ন ভোজনের সময় নিয়োগপত্রটি দেন। আমি তাঁকে বলি যে, চব্বিশে এপ্রিল কভেন্ট্রি শহরে বাঙালীদের যে সভা হচ্ছে তিনি যেন তাতে যোগদান করেন এবং এই নিয়োগপত্রটি সেখানে পড়ে শোনান। তাহলে কোনো বিশেষ দলে যোগদান না করেও সরাসরি সরকারের প্রতিনিধি হিসেবে আন্দোলনের সমন্বয় করতে পারব।

চৌদ্দ

চব্বিশে এপ্রিল শনিবার কভেন্ট্রি শহরের একটি মিলনায়তনে সভার কাজ শুরু হয়। সভার শুরুতেই সকল দলের পক্ষ থেকে আমাকে সভাপতিত্ব করতে বলা হয়। আমি চিন্তা করে দেখলাম, যদি এই সভা কোনো কারণে কেন্দ্রীয় কমিটি গঠনে ব্যর্থ হয় অথবা গঠিত হলেও যদি ভেঙ্গে যায় তবে ইউরোপীয় বা অন্যদের কাছে বাঙালীদের হয়ে কথা বলার অধিকার কিছুটা বাধা পাবে। আমি অসম্মতি জ্ঞাপন করে বেগম লুলু বিলকিস বানুর নাম সভানেত্রী হিসাবে উল্লেখ করি। তিনি লন্ডনে থাকেন এবং একটি স্কুলের শিক্ষয়িত্রী। পঁচিশে মার্চের পর থেকে তিনি আমাদের সঙ্গে কাজ করছেন। তিনি ইংরেজী ও বাংলা ভাষায় অনর্গল বক্তৃতা করেন। তাঁর ভাষণ সহজ, সরল এবং হৃদয়স্পর্শী। তাছাড়াও তিনি ব্যক্তিত্বসম্পন্না মহিলা। আমার কথায় তিনি রাজী হয়ে গেলেন। সভার কাজ আরম্ভ হবার পরে সকল দলের সমর্থনপুষ্ট এবং সকলের বিশ্বাসভাজন একটি কেন্দ্রীয় কমিটি গঠনের জন্য আবেদন জানাই। আমি বলি যে, 'নানা অঞ্চলে হয়ত আঞ্চলিক সমিতিগুলি সভা বা শোভাযাত্রা বের করে স্বাধীনতা আন্দোলনকে সমর্থন জানাতে পারেন। কিন্তু লন্ডন বা অন্যকোথাও সকল দলের সমর্থনসহ সভা বা শোভাযাত্রা করতে হলে কেন্দ্রীয় কমিটির প্রয়োজন। তাছাড়া অন্যান্য দেশে যোগাযোগ স্থাপন করার জন্যও কেন্দ্রীয় কমিটি অত্যাবশ্যক।' আমার এই বক্তৃতার আগেই রকিবউদ্দীন বাংলাদেশ সরকারের নিয়োগপত্রটি পড়ে শোনান। বক্তৃতায় আমি বলি যে, প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকেই কেন্দ্রীয় কমিটি গঠনের আহবান জানাচ্ছি। এরপর নীতিগতভাবে আমার আবেদন সমর্থন করে সবাই বক্তৃতা দেন। কিন্তু কমিটির সদস্যদের তালিকা প্রস্তুত করার ব্যাপারে তুমুল বাক-বিতন্ডার সৃষ্টি হয়।

এই সময় একজন তরুণ বাঙালী আধ ঘণ্টার জন্য সভার কাজ স্থগিত রাখতে অনুরোধ করেন। তিনি বলেন যে, ঘরোয়াভাবে বসে একটি পাঁচ সদস্য বিশিষ্ট স্টিয়ারিং কমিটি নির্বাচন করা হবে। লুলু বিলকিস বানু সভার অনুমতি নিয়ে আধঘণ্টার জন্য সভা স্থগিত ঘোষণা করেন। ঘোষণার পূর্বে সর্ব–সম্মতিক্রমে একটি কমিটি গঠনের জন্য সভানেত্রী স্বাধীনতার নামে, বাংলাদেশের নিপীড়িত জনগণের নামে অত্যন্ত যুক্তিপূর্ণ ও আবেগময়ী ভাষায় আহবান জানান। সভা স্থগিত হলে আমি গউস খান এবং মিনহাজ উদ্দিনকেও ঘরোয়া আলোচনায় যোগদান করতে অনুরোধ করি। আধ ঘণ্টার কিছু পরে সভার কাজ পুনরায় শুরু হয়। বিদেশে স্বাধীনতা সংগ্রামের সবচেয়ে সন্তোষজনক এবং গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গৃহীত হলো তখনই। শেষ পর্যন্ত সকলের সম্মতিতে পাঁচটি নাম গ্রহণ করে কয়েকটি প্রস্তাব গৃহীত হয়। ১. গ্রেটবৃটেনে কেন্দ্রীয়ভাবে একটি সমিতি গঠন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হলো এবং এই সমিতির নাম রাখা হলো 'যুক্তরাজ্যে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের এ্যাকশন কমিটি'। ২. অতি অল্প সময়ের নোটিশে সম্মিলিত হবার সুবিধার্থে পাঁচজন সদস্য বিশিষ্ট একটি শক্তিশালী কমিটি গঠন করা হলো, এর নাম হলো 'এ্যাকশন কমিটির স্টিয়ারিং কমিটি' এবং উক্ত কমিটিকে সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়ার সম্পূর্ণ অধিকার দেওয়া হলো। ৩. অন্য এক প্রস্তাবে প্রয়োজনবোধে আরো সদস্য নেওয়ার ক্ষমতা দেওয়া হয় স্টিয়ারিং কমিটিকে। ৪. কমিটির পাঁচজন সদস্যের নাম হচ্ছে ঃ (১) আজিজুল হক ভূঁইয়া, (২) কবির চৌধুরী, (৩) মনোয়ার হোসেন, (৪) শেখ আবদুল মান্নান ও (৫) শামসুর রহমান। সভার ৫ নম্বর প্রস্তাবে বলা হয় স্টিয়ারিং কমিটির প্রথম অধিবেশন এই সভার সভানেত্রীর আহবানে অনুষ্ঠিত হবে এবং ঐ সভায় একজন আহবায়ক নিযুক্ত করা হবে। আরেকটি প্রস্তাবে গ্রেট বৃটেনে যত কমিটি আছে সেসব কমিটি এই কমিটির শাখা সমিতি হিসেবে কাজ করবে বলে উল্লেখ করা হয়।

এই কমিটির চেয়ারম্যান হওয়ার জন্য প্রায় সকলের নিকট থেকেই আমাকে অনুরোধ জানান হয়। কিন্তু বাংলাদেশ সরকারের বিশেষ প্রতিনিধি হিসেবে কোনো পদ গ্রহণ করা আমি অনুচিত বিবেচনা করি। কোনো কারণে এই কমিটি কাজে বাধাপ্রাপ্ত হলে বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে সেটা ব্যর্থতা বলে পরিগণিত হবে। তবে ঐ সভায় স্থির হয় কমিটি আমার সঙ্গে পরামর্শ করে কাজ করবেন। স্টিয়ারিং কমিটির প্রথম সভায় এই প্রস্তাব গৃহীত হয় যে, কমিটি স্বাধীনতা সংগ্রাম পরিচালনায় আমার পরামর্শ মতো কার্যনির্বাহ করবেন। নয় মাস সেভাবেই কাজ হয়েছে।

পনের

কভেন্ট্রির ঐতিহাসিক সমাবেশে ঐক্যের যে অনুপ্রেরণা সৃষ্টি হয় তা আমাদের কাজকে সহজ করে তোলে এবং দ্রুতগতিতে কার্যকর ব্যবস্থা গৃহীত হতে থাকে। তাই লন্ডনের বিভেদকে এড়িয়ে পঁচিশে এপ্রিল এই শহরের সকল দলকে নিয়ে স্টিয়ারিং কমিটির সঙ্গে সহযোগিতার উদ্দেশ্যে লন্ডনে একটি শাখা সমিতি গঠন সম্ভব হয়। এই সভাতেও আপোষের জন্য শেখ আবদুল মান্নানসহ কয়েকজন কর্মী যথেষ্ট পরিশ্রম করেন। সভায় লন্ডনস্থ আওয়ামী লীগ নেতা গউস খান সভাপতি, মিনহাজ উদ্দিন সহ-সভাপতি ও ব্যারিষ্টার শাখাওয়াত হোসেন সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। প্রথমে মিনহাজ উদ্দিনের নাম সভাপতিরূপে প্রস্তাব করা হয়। কিন্তু শেখ আবদুল মান্নান এবং আরো কয়েকজন বাঙালী নেতার অনুরোধে মিনহাজউদ্দীন সহ-সভাপতি হতে সম্মত হন। এভাবে কভেন্ট্রি সম্মেলনের মনোভাব রক্ষিত হয়।

স্টিয়ারিং কমিটির প্রথম সভা হয় একুশ নম্বর রোমিলি স্ট্রীটে। সভাপতিত্ব করেন বেগম লুলু বিলকিস বানু। সে সভায় আমি জরুরী ভিত্তিতে একটি অফিস স্থাপনের প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করি। সকল সদস্যকে অফিসের জন্য স্থান খোঁজ করতে অনুরোধ জানানো হয়।

স্টিয়ারিং কমিটির কাজ শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই পাকিস্তান থেকে ক্রিকেট টেস্ট ম্যাচ খেলার জন্য একটি টিম এলো। টিমের সকল খেলোয়াড়ই পশ্চিম পাকিস্তানী। বাংলাদেশে হত্যাযজ্ঞ চলছে, এই অবস্থায় স্টিয়ারিং কমিটির সদস্যবৃন্দ এবং কয়েকটি স্থানীয় কমিটি ক্রিকেট টিমের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শনের সিদ্ধান্ত নিলেন। আটাশে এপ্রিল মে-ফেয়ারের ডার্টমথ হাউসে খেলোয়াড়দের অভ্যর্থনার আয়োজন করা হয় উদ্যোক্তাদের পক্ষ থেকে। সেই হলের সামনে দাঁড়িয়ে বাঙালীরা বিক্ষোভ প্রদর্শন করলেন। শুধু তাই নয়, খেলোয়াড়দের ডার্টমথ হাউসের প্রবেশ পথ অবরোধ করে দাঁড়িয়ে থাকার ফলে তারা প্রবেশ করতে অসমর্থ হয়। এক পর্যায়ে ধস্তাধস্তি শুরু হলে কয়েকজন বাঙালীকে পুলিশ গ্রেফতার করে। এই বিক্ষোভ যাতে শান্তিপূর্ণভাবে পালিত হয়, সেই বিষয়ে আমি আগেই পরামর্শ দিয়েছিলাম। কিন্তু ঘটনাস্থলে বিক্ষুব্ধ অবস্থায় অনেক সময় এমন উত্তেজনার সৃষ্টি হয় যে, পূর্ব নির্ধারিত কর্মসূচী অনুসৃত হয় না। ঘটনা এগিয়ে চলে তার নিজস্ব গতিতে। এখানেও তাই হলো। ডার্টমথ হাউসের সামনে এক হাজার বাঙালী সমবেত হয়েছিলেন। এতে উৎসাহিত বোধ করার কারণ থাকলেও আমি স্পষ্ট অনুভব করি যে, শান্তি-শৃংখলা ভঙ্গ করলে ইংল্যান্ডের জনসাধারণের সহানুভূতি হারাবার আশংকা আছে। এদিনের অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতে পরের খেলাগুলোতে আমাদের বিক্ষোভ প্রদর্শন যাতে শান্তিপূর্ণ হয় সে সম্পর্কে আমাকে যথেষ্ট

সতর্কতা অবলম্বন করতে হয়েছে। আমি সে বিষয়ে যথাস্থানে উল্লেখ করব।

তিরিশে এপ্রিল শেখ আবদুল মান্নানের বাড়িতে স্টিয়ারিং কমিটির দ্বিতীয় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সকল সদস্যই উপস্থিত ছিলেন। সেখানে শেখ আবদুল মান্নানের প্রস্তাব অনুসারে আজিজুল হক ভূঁইয়া কমিটির আহবায়ক নিযুক্ত হন। এই সভায় বিভিন্ন অঞ্চলের বাঙ্গালীদের সঙ্গে যোগাযোগ ঘনিষ্ঠতর করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। আমরা পুনরায় পহেলা মে শেখ মান্নানের বাড়িতে মিলিত হই। সেখানে স্কটল্যান্ডের গ্লাসগো এ্যাকশন কমিটির কয়েকজন সদস্যও উপস্থিত ছিলেন। তাঁদেরকে সারা স্কটল্যান্ডে বাঙালীদের সংগঠন করার দায়িত্ব দিয়ে প্রেস কনফারেন্স প্রভৃতি করার অনুরোধ করা হয়।

সেই দিন অপরাহ্নে বামপন্থী বাঙালীদের একটি সভা কনওয়ে হলে অনুষ্ঠিত হয়। তাঁরা স্বাধীনতার বিরুদ্ধে একটি কথাও বলেননি। তবে দক্ষিণপন্থী রাজনৈতিক দলের নেতৃত্বে স্বাধীনতা অর্জিত হলেও সর্বহারাদের কল্যাণ সাধিত হবে না বলে অভিমত ব্যক্ত করেছিলেন। শেখ আবদুল মান্নান এবং ব্যারিস্টার শাখাওয়াত হোসেন সেই সভায় উপস্থিত ছিলেন। তাঁরা সকলের মিলিত প্রচেষ্টায় স্বাধীনতা অর্জন প্রথম কর্তব্য বলে মন্তব্য করেন। এরপর তরা মে তারিখে আমরা সংগঠনের অফিস পেয়ে গেলাম। সেদিনই স্টিয়ারিং কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হলো নতুন অফিসে।

এগার নম্বর গোরিং স্ট্রীটে হারুনুর রশিদের একটি অফিস ছিল। এতে কক্ষ ছিল পাঁচটি। কক্ষগুলোতে অফিসের দরকারী আসবাবপত্র এবং টেলিফোন ছিল। হারুনুর রশিদ বাংলাদেশ থেকে পাট রপ্তানির ব্যবসা করতেন। পঁচিশে মার্চের হত্যাযজ্ঞ শুরু হবার পর তাঁর ব্যবসা বন্ধ হয়ে যায়। তিনি আমাদেরকে তাঁর অফিস ছেড়ে দেন। ঠিক হয় যে, আমরা তাঁর অফিস ও টেলিফোনের ভাড়া দেব। এতে আমাদের সুবিধা হলো হারুনুর রশিদ অনেকদিন আগেই অফিস ভাড়া নিয়েছিলেন। তখনকার বাজার দর অনুসারে ভাড়া কম ছিল। অফিস পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এগার নম্বর গোরিং স্ট্রীটের ঠিকানা দিয়ে প্যাড, চিঠির কাগজ ইত্যাদি ছাপানো হয় এবং সবাইকে এর ঠিকানা জানিয়ে দেয়া হয়।

ষোল

এ সময় সকলের নিকট থেকে অনুরোধ আসে লন্ডনের বাইরে উৎসাহ সঞ্চারের জন্য আমাদের বিভিন্ন অঞ্চলে জনসভা করতে যাওয়া উচিত। ব্রার্ডফোর্ড এবং বার্মিংহাম কমিটি মে মাসের নয় তারিখে সভার আয়োজন করেন। ব্রার্ডফোর্ডে সকাল দশটায় এবং বার্মিংহামে বিকেল তিনটায়। আটই মে সমস্ত দিন গোরিং স্ট্রীটে ঘরোয়া বৈঠক ও অন্যান্য কাজে অতিবাহিত হয়। রাত ন'টার দিকে আমরা রওয়ানা হলাম ব্রার্ডফোর্ডের দিকে। বাংলাদেশ মেডিক্যাল এসোসিয়েশনের সদস্য মোশাররফ হোসেন জোয়ারদার (ডাক্তার) নিজে গাড়ী চালিয়ে আমাদের নিয়ে যান। জোয়ারদার, শেখ আবদুল মান্নান, জাকারিয়া চৌধুরী ও আমি

সেই গাড়ীতে ব্রার্ডফোর্ডে যাই। আমরা শেষ রাতে ব্রার্ডফোর্ডে পৌঁছলাম। স্থানীয় কমিটি আমাদের জন্য কামরা ঠিক করে রেখেছিলেন। আমরা শ্রান্ত অবস্থায় নিজেদের বিছানায় ছুঁড়ে দিলাম। পরের দিন যথাসময়ে ব্রার্ডফোর্ডের একটি জনাকীর্ণ হলে বক্তৃতা করি। এই হলেই প্রথম জাতীয় সঙ্গীত 'আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালবাসি' গাওয়া হয়। সঙ্গীতে অন্যদের সঙ্গে অংশগ্রহণ করেন শেখ মকসুদ আলীর স্ত্রী। মাকসুদ আলী সি, এস, পি অফিসার। লীডস অঞ্চলে তিনি অন্যান্য বাঙালীর সঙ্গে আমাদের সংগ্রামকে এগিয়ে নিয়ে যেতে যথেষ্ট পরিশ্রম করেছেন।

ব্রার্ডফোর্ডে স্বাধীনতা আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন মুসাব্বির তরফদার, আবদুস সোবহান মাষ্টার, আবদুল কাদের, বদরুজ্জামান, মাহমুদুল হক ও মীর্জা লুৎফর রহমান। এঁদের নিয়ে একটি আহবায়ক কমিটি গঠিত হয়। এ,কে,এম এনায়েতউল্লাহ এই কমিটির কর্মসূচীর সমন্বয়ের দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন অর্থাৎ সম্পাদকরূপে কাজ করেছেন। এর ফলে ডক্টরেটের জন্য গবেষণা আর শেষ করা হয়ে ওঠেনি। এদের সকলের সুপরিচালনায় ব্রার্ডফোর্ড আমাদের আন্দোলনের একটি শক্তিশালী কেন্দ্রে পরিণত হয়।

স্টিয়ারিং কমিটি গঠনের পর ব্রার্ডফোর্ডে আমাদের জনসংযোগের প্রথম সভা। এখানে আমি ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে স্বাধিকার আন্দোলনের গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপগুলির সংক্ষেপে উল্লেখ করে সাম্প্রতিক ঘটনাগুলি ইংরেজী এবং বাংলা ভাষায় বিশ্লেষণ করি। নবগঠিত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের আদর্শ, ধ্যান ও ধারণা সরকারের প্রতিনিধিরূপে বাঙালী ও অবাঙালী শ্রোতাদের কাছে উল্লেখ করি। বললাম, "দু'শ' বৎসরের ঔপনিবেশিক শাসন থেকে ভারতের মুক্তি আন্দোলনে বাঙালী দান কম নয়। তারপর যখন ভারতীয় মুসলমানগণ ইংরেজ শাসনের অবসানের সঙ্গে সঙ্গে মুসলমানদের জন্য পৃথক রাষ্ট্র কামনা করলেন সেদিনও বাঙালী মুসলমানরাই একেবারে প্রথম সারিতে ছিলেন। আমাদেরই নেতা ফজলুল হক পাকিস্তান প্রস্তাব উত্থাপন করেন। আমাদেরই নেতা হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী বাংলায় মুসলিম লীগ সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। একমাত্র বাংলাদেশেই মুসলিম লীগ মন্ত্রিসভা গঠিত হয়।

কিন্তু বাংলা ভাষায় কথা বলার অধিকার দাবী করায় ঢাকার রাজপথ রক্তে রঞ্জিত হয়ে গেল। ১৯৫৪ সালে বাঙালী গণতন্ত্রের পক্ষে একযোগে ভোট দিল। বাংলায় জনপ্রতিনিধিদের দ্বারা প্রাদেশিক সরকার গঠিত হলো। কয়েক মাস পরেই সে সরকার বাতিল করা হলো। নেতৃবৃন্দ কারারুদ্ধ হন। ১৯৫৮ সালে সামরিক শাসন প্রবর্তন করে দশ বছর স্বৈরশাসন চালানো হয়। বহু প্রতিশ্রুত উনিশ শ' সত্তরের নির্বাচন হলো। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ কেন্দ্রীয় পার্লামেন্টে একশ' সাতষট্টিটি আসন লাভ করে একক সংখ্যাগুরু দলের সম্মান অর্জন করে। ভুট্টো ও ইয়াহিয়া খানের ষড়যন্ত্রের ফলে পার্লামেন্ট অধিবেশন অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত করা হয়। আলোচনার কুহেলিকা সৃষ্টি করে পশ্চিম পাকিস্তানী সেনাবাহিনী ঝাঁপিয়ে পড়ল বাংলার নিরস্ত্র নরনারীর ওপর। বন্দী করল বাংলার বন্ধুকে। শুরু হলো গণহত্যা। বন্দী হওয়ার পূর্ব মুহূর্তে বাংলার নেতা স্বাধীনতা ঘোষণা করে সমগ্র বাঙালী জাতির আশা ও আকাঙ্ক্ষারই প্রতিধ্বনি করেছেন।"

সাম্প্রতিক ঘটনার বিবরণ দিয়ে বললাম, "বঙ্গবন্ধুর ঘোষণাকে সফল করে তোলার জন্য নির্বাচিত সংসদ সদস্যগণ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার গঠন করেছেন। স্বাধীন বাংলাদেশে সংসদীয় গণতন্ত্র সুপ্রতিষ্ঠিত হবে। দেশ শাসিত হবে জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধি দ্বারা জনগণের ইচ্ছানুযায়ী। নতুন শাসনতন্ত্রে সংবাদপত্র ও বিচার বিভাগের স্বাধীনতা নিশ্চিত করা হবে। জনগণের মৌলিক অধিকার বর্ণিত হবে শাসনতন্ত্রে আর তা রক্ষা করার দায়িত্ব থাকবে বিচার বিভাগের। এক কথায় বলা চলে একজন বৃটিশ নাগরিকের যে অধিকার আছে বাংলাদেশ স্বাধীন হলে বাঙ্গালী নাগরিকেরও সেই অধিকার থাকবে। নিরাপদ নিঃশঙ্কচিত্তে বাংলার মানুষ যাতে মানুষের মর্যাদা নিয়ে বাঁচার মত করে বাঁচে তারই সাধনায় ও সংগ্রামে নিয়োজিত রয়েছেন সদ্য গঠিত বাংলাদেশ সরকার। ব্যক্তিগতভাবে নয়, সরকারের প্রতিনিধিরূপেই গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের আদর্শ আপনাদের কাছে ঘোষণা করলাম।"

ব্রার্ডফোর্ডের সভার শেষে আমরা বার্মিংহামের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হই। আবার মোশাররফ হোসেন জোয়ারদার গাড়ী চালিয়ে আমাদের নিয়ে আসেন বার্মিংহামে। বার্মিংহাম কমিটি একটি বিরাট জনসভার আয়োজন করে। আমরা যখন পৌঁছি তখন হল ভর্তি লোক ছিল। বার্মিংহাম ইংল্যান্ডের আঞ্চলিক শহরগুলোর মধ্যে একটি বড় শহর। লন্ডনের পরে এখানেই বোধ করি সবচেয়ে বেশীসংখ্যক বাঙালীর বাস। আমরা যখন হলে প্রবেশ করি তখন এই জনাকীর্ণ সভার সকলেরই মুখে-চোখে দৃঢ়তা, দেশপ্রেম ও দৃপ্ত শপথের সমন্বিত অভিব্যক্তি। আমি এই সভায় প্রবেশ করেই অনুভব করলাম এক অভূতপূর্ব শিহরণ। মনে হলো প্রত্যেকের সঙ্গে প্রত্যেকের আত্মার গভীর মিলন হয়েছে। আমরা মঞ্চে স্থান গ্রহণ করার সঙ্গে সঙ্গে সভার কাজ শুরু হলো। বার্মিংহাম সমিতির পক্ষ থেকে নিবেদিতপ্রাণ জগলুল পাশার বক্তৃতার পর শেখ আবদুল মান্নান একটি হৃদয়স্পর্শী ভাষণ দেন। আমার যখন ডাক পড়লো, আমি দাঁড়িয়ে বললাম, 'পঁচিশে মার্চের স্তব্ধ অন্ধকারেই নির্মম হত্যাযজ্ঞের মধ্য দিয়ে এক নব-জাগ্রত জাতির জয়যাত্রা শুরু হয়েছে। সেই ন্যায় যুদ্ধে আপনারা সকলেই যোগদান করেছেন। আপনাদের সঙ্গে একজন নগণ্য বাঙালী হিসেবে আমিও এসে দাঁড়িয়েছি। আমরা চেয়েছিলাম সমান অধিকার, এগিয়ে চলেছিলাম নিয়মতান্ত্রিক পথে। সেই সময় প্রতারণার দ্বারা সময় হরণ করে পাকিস্তান থেকে সৈন্য এনে তাদের ছেড়ে দেয়া হয়েছে শ্যামল বাংলার বুকে মা-বোনের ইজ্জত হরণ, লুণ্ঠন আর গণহত্যার জন্য। সমস্ত বাংলাদেশ আজ জ্বলছে। এক ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামের ভেতর দিয়ে আমরা ইনশাআল্লাহ দেশকে স্বাধীন করব।' সেদিন সারা হলের অবস্থা এই ছিল যে, দু'তিনটি শব্দ বলার পরপরই আমাকে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকতে হয়েছে। বাঙ্গালীরা চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে পড়েছেন, এক নিবিড় বেদনায় চিৎকার করে উঠেছেন সমস্বরে। ঠিক যেন বঙ্গবন্ধুর কথার প্রতিধ্বনি করে তাঁরা দাঁড়িয়ে পড়ছিলেন আর বলছিলেন 'জয়বাংলা'। বাঙালীর সংগ্রাম ছিল আদর্শ প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম। সে আদর্শই এমন এক অনুপ্রেরণা, উদ্দীপনা ও উৎসাহের সৃষ্টি করেছিল যা ভাষায় বর্ণনা করা সম্ভব নয়। সেদিনের সে সমাবেশের কথা লিখতে গিয়ে আমি সেই অভূতপূর্ব দৃশ্য যেন আবার দেখছি। সকলের প্রাণে-প্রাণেই যে এক সংযোগ এবং আত্মীয়তার সৃষ্টি হয়েছিল সেটা শুধু অনুভব করার বর্ণনা দেয়ার নয়। অন্তরে অন্তরে এই যোগ

স্থাপনের মধ্য দিয়ে আমরা এক পবিত্র শপথ গ্রহণ করলাম। আমাদের সকলের অন্তরে অনুরণিত হতে থাকল, দেশকে 'স্বাধীন করে ছাড়ব।'

এই সভায় আমি যেন এক নতুন জগতে, নতুন পরিবেশে, নতুন আবেষ্টনীর মধ্যে নিজেকে আবিস্কার করলাম। এক আন্তরিক উত্তেজনায় আমার চোখ মুখ টগবগ করে উঠছিল। নিজেকে যেন আর ধরে রাখতে পারছিলাম না। আমি অনুভব করলাম, প্রবাসী বাঙালীরাও আমাকে আন্তরিকতার সঙ্গে গ্রহণ করেছেন। সভাশেষে মঞ্চ থেকে যখন নামলাম, সকলের চোখ অশ্রুসজল। একজন আরেকজনকে ধরে কাঁদছেন। অনেক বুড়ো মানুষও আমাকে জড়িয়ে ধরে বললেন, বাবা, আমরা নামাজ পড়ে দোয়া করছি, জয় আমাদের হবেই। দেশ স্বাধীন হবে, বঙ্গবন্ধু ফিরে আসবেন।

বন্ধুরা মনে করিয়ে দিলেন যে সকাল বেলায় খেয়ে সেই যে ব্রাডফোর্ডের সভায় গিয়েছি, সারাদিন আর কিছু খাওয়া হয়নি। বার্মিংহামে এক নাম করা রেস্টুরেন্টের মালিক আফরোজ মিঞা ধরলেন তার ওখানে খেতে। আমি একটু আপত্তি করায় বার্মিংহাম কমিটির নেতৃবৃন্দ বললেন, 'খাওয়াটা মুখ্য উদ্দেশ্য নয়, সেখানে বসে আমাদের পরবর্তী কর্মসূচি নির্ধারণ করতে হবে।' তাঁদের সঙ্গে রেস্টুরেন্টের হল কামরায় গিয়ে বসলাম, পরবর্তী কর্মসূচী নিয়ে আলোচনা হলো এবং তাঁদের সকলের সঙ্গে বসে কিছু খেতেও হলো।

ব্রার্ডফোর্ড–বার্মিংহামের এই সভার মধ্য দিয়েই আমাদের জনসংযোগ শুরু হলো। সকলে কান পেতে শুনলেন গণমানুষের মিলিত আহবান। অনুপ্রাণিত হলেন জনজীবনের স্পর্শে। বার্মিংহামে ও ব্রাডফোর্ডের কর্মীদের মধ্যে যে প্রাণের চাঞ্চল্য, কর্মের আগ্রহ আর যে দেশাত্মবোধ লক্ষ্য করলাম তা আমার হৃদয় পূর্ণ করে দিল। আমাদের প্রতি মুহূর্তের কর্মে ও চিন্তায় দেশের কল্যাণ কামনা থাকবে, থাকবে জনগণের মুক্তির প্রচেষ্টা, এই বিশ্বাস নিয়ে যখন বার্মিংহাম ত্যাগ করলাম তখন বেশ রাত হয়ে গেছে।

আমরা যারা ব্রাডফোর্ডে গিয়েছিলাম তারা একই গাড়ীতে লন্ডন অভিমুখে যাত্রা করলাম। জোয়ারদার এবারেও গাড়ী চালাতে শুরু করলেন। সেদিনকার রাত ছিল স্বচ্ছ জ্যোৎস্নাস্নাত। পুরনো দিনের অনেক গল্প করলাম সহকর্মীদের সঙ্গে। রাতটি কেটে গেল। গাড়ী ইস্ট এ্যাক্টনের ২৬ নং দি গ্রীনে এসে থামলো। পূবের আকাশে দেখলাম সূর্যোদয়ের লাল আভা। বুঝলাম এমনি করেই একদিন অন্ধকার দূর হয়ে যাবে—বাংলাদেশ নব প্রভাতের অরুণালোকে উদ্ভাসিত হয়ে উঠবে। কিছুটা বিশ্রাম করে আমাদের সংগ্রামী কার্যালয় এগার নং গোরিং স্ট্রীটে গেলাম। লন্ডন থেকে দু'রাত এবং এক দিনের অনুপস্থিতিতে জমে উঠেছে অনেক প্রশ্ন, অনেক সমস্যা। সেগুলো নিয়ে আলাপ-আলোচনা করে সেদিনটা কেটে গেল।

সতের

আমাকে মুজিবনগর সরকার যথাশিগগির সম্ভব আমেরিকায় যাওয়ার অনুরোধ জানান। বৃটিশ পার্লামেন্টে এই সময়টাতে বাংলাদেশ নিয়ে আলোচনা হচ্ছিল বলে আমেরিকায় যাত্রা কয়েকদিন পিছিয়ে দিলাম। আমাকে জানানো হয় যে, এ এইচ মাহমুদ আলী মুজিবনগর সরকার গঠিত হওয়ার পরেই পাকিস্তান সরকারের সঙ্গে সকল সম্পর্ক ছিন্ন করেন। আমার যতদূর মনে পড়ে, তিনি একুশে এপ্রিল নিউইয়র্ক থেকে বাংলাদেশ সরকারের প্রতি আনুগত্য ঘোষণা করেন।

বৃটিশ পার্লামেন্টের কয়েকজন সদস্য বিশেষ করে জন স্টোন-হাউস, ব্রুস ডগলাসম্যান এবং পিটার শোর বাংলাদেশের সমর্থনে প্রায় সারাক্ষণ কাজ করছিলেন। তাঁরা সকল দল থেকে সমর্থন সংগ্রহ করেছিলেন। তাঁদের প্রচেস্টায় বৃটিশ পার্লামেন্টে আমাদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটে। পার্লামেন্টের তিন শ' সদস্য বৃটিশ সরকারের উপরে চাপ সৃষ্টি করেন যে, বাংলাদেশে রক্তক্ষয় অবিলম্বে বন্ধ করতে হবে। তাঁদের এই প্রস্তাবের ফলে হাউস অব কমন্সে ১৪ই মে বাংলাদেশ সম্পর্কে একটি পূর্ণাঙ্গ আলোচনার দিন ধার্য হয়। ক্ষমতাসীন রক্ষণশীল দলের নেতা এডওয়ার্ড হীথ তখন প্রধানমন্ত্রী। সরকারী দলের সক্রিয় বিরূপতা থাকলে রক্ষণশীল দলের এত সদস্য কিছুতেই পূর্ণাঙ্গ আলোচনার দাবী জানাতেন না। দক্ষিণপন্থী নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি স্যার জেরল্ড নেবারো এবং রেভারেন্ড ইয়ান পেইসলি আমাদের প্রতি জোর সমর্থন জানান। তেমনি বামপন্থী নেতা ইয়ান মিকার্ডো এবং এন্ড্রু ফাউলস এই প্রস্তাবের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। পাকিস্তান সামরিক বাহিনীর অত্যাচারের কাহিনী পার্লামেন্টের সকল দলের সদস্যদের গভীরভাবে নাড়া দেয়। সরকার যদিও বার বার মনে করিয়ে দিয়েছেন যে, একটি দেশের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ তাঁদের পক্ষে সম্ভব নয়। কিন্তু মানবিক কারণে তাঁরা যথেষ্ট সহমর্মিতা প্রদর্শন করেছেন। এমনকি পররাষ্ট্রমন্ত্রী স্যার এ্যালেক ডগলাস হিউম এ ধরনের কথা বলেও সান্ত্বনা দিয়েছেন যে, পশ্চিম পাকিস্তানীদের পক্ষে দূরত্বের কারণে বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষের উপর নির্যাতন চালিয়ে যাওয়া সম্ভব হবে না।

এই সময় আমি এ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালের সেক্রেটারী জেনারেল মার্টিন এনালসের সঙ্গে দেখা করি। তাছাড়া সোসালিস্ট ইন্টারন্যাশনালের সেক্রেটারী জেনারেল হ্যানস ইয়ান্টিসেকও আমাদের পূর্ণ সমর্থন জানান। ইয়ান্টিসেক পার্লামেন্টের সদস্য ও সাংবাদিকদের কাছে বাংলাদেশের নিপীড়িত মানুষের কথা তুলে ধরেন। ১৪মে'র দিন দশেক আগে থেকেই আমরা

ইংল্যান্ডের বিভিন্ন অঞ্চলের বাঙালীদের পার্লামেন্টে পাঠাচ্ছিলাম। তাঁরা তাঁদের অঞ্চলের এম.পি'দের সঙ্গে দেখা করে বাংলাদেশের অবস্থা জানান এবং তাঁদের সমর্থন কামনা করেন। ঐ কয়েকটা দিন যখনই আমি হাউস অব কমন্সে গিয়েছি বাঙালীদের লবিতে দেখতে পেয়েছি। তাঁরা আমাকে দেখলেই কাজের বিবরণ দিতেন। সেজন্য আমিও অফিস ছেড়ে প্রতিদিনই অন্ততঃ একবার করে হাউস অব কমন্সের লবি থেকে ঘুরে এসেছি। অবশ্য কোন সময়ই আমাকে আমার সহকর্মীগণ কোথাও একা যেতে দেননি। আমি অফিস থেকে বের হলে দু'তিনজন আমার সঙ্গে সঙ্গে থাকতেন। তাঁরা জিজ্ঞেসও করতেন না আমি কোথায় যাচ্ছি। বাঙালীদের এই একতা এবং সহকর্মীসুলভ বন্ধুত্বের কথা মনে করে যে কোনো বাঙালীই গৌরব বোধ করতে পারেন।

আমি আগেই বলেছি যে, এসব কারণে আমার পক্ষে ১৪ই মে'র আগে আমেরিকায় যাওয়া সম্ভবপর ছিল না। কিন্তু আমি অবিলম্বে ভিসার ব্যবস্থা করার জন্য লন্ডনস্থ মার্কিন দূতাবাসে গিয়ে কনসাল জেনারেলের নিকট দরখাস্ত দিয়ে আসি। লন্ডনস্থ কূটনীতিবিদদের তালিকায় মার্কিন দূতাবাসে আমার কোনো পরিচিত ব্যক্তির নাম পেলাম না। এ অবস্থায় তাঁদের রাজনৈতিক সচিবকে আমাদের অফিস থেকে ফোন করা হয়। যতদূর মনে পড়ে তাঁর নাম ছিল কিং। আমার জন্য সাক্ষাৎকারের সময় চাইলে তিনি আমাকে পরের দিন ৪ঠা মে সকাল এগারটার দিকে দেখা করতে বলেন। নির্দিষ্ট সময়ে আমি রিসেপশনে গিয়ে নাম বলতেই কিং চলে এলেন। তিনি আমাকে তাঁর রুমে নিয়ে গেলেন এবং কফি খাওয়ার অনুরোধ করে আমার জন্য কি করতে পারেন জানতে চাইলেন। মে'র প্রথম সপ্তাহের মধ্যেই আমেরিকার রিচার্ড নিক্সনের সরকার আমাদের স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রতি যথেষ্ট বিরূপতা প্রকাশ করে ফেলেছেন। তাই কিং যদিও নম্রতাসহ কথা বললেও আমি কিছুটা অসহিষ্ণুতার ভাব ইচ্ছে করেই দেখাই। আমার স্বভাবেরও ইতিমধ্যে কিছুটা পরিবর্তন ঘটে গেছে। তাছাড়া আমি জানি আমাদের কথায় নিক্সন সরকার মত পরিবর্তন করবেন না। অতএব, তাঁদের বিরূপতা হেতু আমার মনে সৃষ্ট প্রতিক্রিয়াকে লুকানোর কোনোরূপ কূটনৈতিক প্রয়োজনীয়তা অনুভব করলাম না। ভদ্রলোক আমাকে কফি খেতে বলে নেহায়েতই ভুল করে ফেলেছিলেন। আমি সেই সুযোগে একটি অপ্রীতিকর বক্তৃতা দিয়ে ফেললাম। আমি বললাম, আপনাদের পাকিস্তানস্থ রাষ্ট্রদূত যখনই ঢাকায় গিয়েছেন তখনই শেখ মুজিবের সঙ্গে দেখা করেছেন। আজ তিনি কারারুদ্ধ, তাঁর খবর পর্যন্ত আমরা পাচ্ছি না অথচ আপনার সরকার এ ব্যাপারে কোনোরূপ সহানুভূতি দেখাচ্ছেন না। এতে আমরা খুব মর্মাহত। তিনি শুধু বললেন, জাস্টিস চৌধুরী এ ব্যাপারে সরকারী নীতি নানাদিক বিবেচনা করে ওয়াশিংটনে গৃহীত হয়। আমার পক্ষে এ বিষয়ে যে কিছু বলা সম্ভব নয়। আশা করি আপনি তা উপলব্ধি করবেন। কিংকে আরো বললাম, 'আপনাদের দেশ গণতান্ত্রিক, মুক্ত বিশ্ব রচনায় আপনারা প্রয়াসী একথা বলে থাকেন। গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় আমরা আজ জীবন মরণ সংগ্রামে লিপ্ত। প্রতিদিন আপনারা কাগজে দেখছেন বাংলাদেশে গণহত্যা চলছে, পার্লামেন্টের নিরঙ্কুশ সংখ্যাগুরু দলের নেতা আজ কারারুদ্ধ অথচ আপনারা নীরব আছেন। আপনি নিশ্চয়ই জানেন, আমি গণপ্রজাতন্ত্রী

বাংলাদেশ সরকারের প্রতিনিধি। তাই আমি আপনার দেশে যেতে চাচ্ছি, আমেরিকার সরকারের কাছে নয়— ঔপনিবেশিকতার বিরুদ্ধে প্রথম সংগ্রামী দেশের জনগণের কাছে বাংলাদেশের জনগণের বন্ধুত্বের বাণী বহন করে। আমাদের প্রত্যাশা, তাঁরা মানবিক কারণে আমাদের পাশে এসে দাঁড়াবেন এবং গণতন্ত্র স্থাপনে সহায়তা করবেন। আমি আমার ভ্রমণের কারণ আপনাদেরকে খোলাখুলিভাবে জানালাম। আশা করি আমাকে আপনারা ভিসা দেবেন।' কিং বললেন, 'জাস্টিস চৌধুরী, ভিসা তো আমরা দেই না, ভিসা দেন কনসাল জেনারেল। চলুন আপনাকে তার কাছে নিয়ে যাই।' এই বলে তিনি টেলিফোন তুলে সাক্ষাতের ব্যবস্থা করে তখন কনসাল জেনারেলের কক্ষে আমাকে নিয়ে গেলেন। আমি সেখানে গিয়েও আমার আমেরিকা যাত্রার কারণ বিশ্লেষণ করে আরেকটি বক্তৃতা দিলাম। তিনি আমার কথা শেষ হবার পর বললেন, 'জাস্টিস চৌধুরী, আপনার সেক্রেটারীকে কাল এ সময় পাঠিয়ে দেবেন। আমি ভিসা তৈরী করে রাখবো।' আমি উভয়কে ধন্যবাদ জানিয়ে চলে এলাম।

পরের দিন আমি নির্ধারিত সময়ে মার্কিন দূতাবাসে গিয়ে রিসেপশন থেকে কিংকে ফোন করতেই তিনি চলে এলেন। আমাকে দেখেই বললেন, আপনি নিজে কেন এলেন, সেক্রেটারীকে পাঠালেই যথেষ্ট হতো। বললাম, দূতাবাসের কাছেই আমারও কাজ ছিল। তাই দু'জনেই চলে এলাম। তিনি আমাকে কনসাল জেনারেলের কক্ষে নিয়ে গেলেন। তাঁর কক্ষে ঢুকতেই তিনি দাঁড়িয়ে স্মিতহাস্যে ড্রয়ার থেকে পাসপোর্টটি বের করে আমার হাতে দিলেন। আমি ভিসাটি খুলে দু'বার পড়লাম। দেখি আমাকে ৬ই মে ১৯৭১ সন থেকে ৬ই মে ১৯৭৫ সন পর্যন্ত চার বছরের ভিসা দিয়েছেন। আমি দু'বার পড়েও যখন একই জিনিস দেখতে পেলাম তখন আমার মনে হল এই ভুলের প্রতি তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা আমার কর্তব্য। পাসপোর্টের পাতা থেকে তাঁদের দিকে তাকিয়ে দেখলাম তাঁরা মৃদু হাসছেন। আমি বললাম, দেখুন আমি তিন মাসের জন্য একবার ভ্রমণের ভিসা চেয়েছিলাম, কিন্তু আপনারা আমাকে চার বছরের ভিসা দিয়েছেন। শুধু তাই নয়, যতবার ইচ্ছা যাত্রার অনুমতি দিয়েছেন। আপনারা ভুল করেননি তো ? কনসাল জেনারেল বললেন, না ভুল নয় ইচ্ছে করেই দিয়েছি। একবার গেলেই আপনার দেশ স্বাধীন হয়ে যাবে সেটা ভাবিনি। আপনি ভিসার জন্য আবার আসবেন এবং কাল যেমন আমাদের নানারকম মিষ্টি কথা শুনিয়েছেন, তেমনি শোনাবেন। তাই ভাবলাম আপনাকে চার বছরের ভিসা দিয়ে দেই। এর মধ্যে যদি আপনার দেশ স্বাধীন হয়, ভাল, না হলে আমাদের বন্ধুরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহে লিপ্ত মানুষকে আর ভিসা দিতে পারব না। আমি বললাম, 'আপনাদের সুবিবেচনার জন্য অশেষ ধন্যবাদ। কিন্তু আপনারা দেখবেন আমাদের দেশ অনেক আগেই স্বাধীন হয়ে যাবে।' কনসাল জেনারেল বললেন, 'দেখুন জাস্টিস চৌধুরী ব্যাপারটা হচ্ছে এই, আপনি আমাদের দেশে যাচ্ছেন পাকিস্তানের বিরুদ্ধে প্রচারকার্য চালাতে। পাকিস্তান আমাদের বন্ধুরাষ্ট্র। তাদের আমরা অসন্তুষ্ট করতে পারি না। সে রকম চিঠি পেলে আমরা পাকিস্তানকে জানিয়ে দেবো যে আর আপনাকে ভিসা দেওয়া হবে না। অল্পদিনের ভিসা দিলে আবার আপনি ভিসার জন্য আসবেন, তাই আমরা ঠিক করলাম যে, আপনাকে চার বছরের ভিসা দেব। তাহলে

পাকিস্তান এবং আপনারা দু'পক্ষই আমাদের শান্তিতে থাকতে দেবেন।' আমি তাঁদের আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানিয়ে চলে এলাম। উনিশ শ' একাত্তরে আমাকে আরো দু'বার আমেরিকায় যেতে হয়েছে। আমার দীর্ঘমেয়াদী বহু ভ্রমণ নির্দেশক ভিসা থাকাতে আমাকে কষ্ট করতে হয়নি এবং কনসাল জেনারেলকেও কষ্ট দিতে হয়নি।

দেশ স্বাধীন হবার পর পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের হারুন-উর-রশিদ আমাকে বলেন, পাকিস্তান সরকার আমেরিকান সরকারকে আমার ভিসা বাতিল এবং আমাকে যুক্তরাষ্ট্র ত্যাগ করতে বাধ্য করার জন্য লিখেছিলেন, কিন্তু যুক্তরাষ্ট্র সরকার তাতে সম্মত হননি। হারুন-উর-রশিদ একাত্তরে পাকিস্তানের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের আইন বিভাগে ছিলেন। দেশ স্বাধীন হবার পর তিনি ইসলামাবাদ থেকে কাবুল হয়ে বাংলাদেশে প্রত্যাবর্তন করেন এবং ঢাকায় পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে আইন বিভাগের প্রধানরূপে যোগদান করেন।

ভিসা পাবার পরেও আমার পক্ষে অবিলম্বে যুক্তরাষ্ট্রে যাওয়া সম্ভব হয়নি নানা কারণে। ১৪ই মে হাউস অব কমন্সে বাংলাদেশের ওপর আলোচনার দিন ধার্য হওয়াতে পার্লামেন্টের সদস্যদের নিকট বাংলাদেশের অবস্থা তুলে ধরতে হয়। তাছাড়া ব্রেচলি শহরের বাঙালীগণ ২২শে মে একটি জনসভার আয়োজন করেন। সেই একই দিনে অক্সফোর্ডেও আরেকটি জনসভায় বক্তৃতা করতে হয়। পরের দিন ২৩শে মে স্কটল্যান্ডে যাই।

আঠার

১৪ই মে'র আলোচনা নিয়ে বৃটিশ পত্রিকাগুলোতে যথেষ্ট সাড়া পড়ে। প্রায় প্রতিটি পত্রিকায় বিশেষ প্রতিবেদন ও সম্পাদকীয় ছাপা হয়। আমি দু'একটির কথা উল্লেখ করতে চাই। ১৩ই মে'র গার্ডিয়ানে "নীরব বিবেক" শিরোনামে দুই কলামব্যাপী প্রধান সম্পাদকীয়তে বলা হয়, আগামীকাল শেষ পর্যন্ত বাংলাদেশ নিয়ে আলোচনা হচ্ছে। কারো পক্ষে খুব বেশী কিছু আশা করা চলে না। বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রসঙ্গটি চাপা দেওয়ার একটা চেষ্টা চলছে। সব দিক আলোচনার পর এক জায়গায় বলা হয়, 'গণতন্ত্রে বিশ্বাসী একটি সরকার এই অবস্থায় কি করবে ? অভ্যন্তরীণ ব্যাপার বলে অভিহিত করে কূটনৈতিক তর্কের পেছনে তারা নিশ্চয়ই আশ্রয় গ্রহণ করতে পারে না। এর মনমুক্ত থাকা চাই। ইয়াহিয়ার দূতেরা যখন শেখ মুজিবের নিন্দে করে তখনই বৃটিশ সরকারের বিতৃষ্ণা প্রকাশ করা উচিত। আর পাকিস্তানকে যে সাহায্য দেওয়া হয় তা দিয়ে যেন সমরাস্ত্র কিনে নিরীহ পূর্ব পাকিস্তানীদের অত্যাচারের

সুযোগ না দেওয়া হয়।' এতে আরো অভিমত প্রকাশ করা হয় যে, 'পাকিস্তানের ধ্বংস এখন শুধুমাত্র সময়ের ব্যাপার। রক্তপাত কম হবে যদি শেখ মুজিবকে অবিলম্বে মুক্তি দিয়ে বাংলাদেশে পাঠানো হয়। শেখ মুজিব নিজেকে শান্তির মানুষ বলে অভিহিত করে থাকেন। সেটা সম্ভব হলেই শরণার্থীরা দেশে ফিরে যাবে।'

টাইমস, ডেইলী টেলিগ্রাফসহ অন্যান্য পত্রিকাতেও প্রতিবেদনের দ্বারা পাকিস্তানের অত্যাচারের কাহিনী তুলে ধরা হয়। ইয়াহিয়া পূর্ব পাকিস্তানকে একটি ভীতিপূর্ণ দেশে পরিণত করেছে বলে একটি পত্রিকা মন্তব্য করে।

১৪ই মে হাউস অব কমন্সে অনেকেই সরকারকে পরামর্শ দেন যে, পাকিস্তান পরিস্থিতির উন্নতি না করলে তাকে সাহায্য দেওয়া হবে না বলে তার প্রতি চাপ প্রয়োগ করা দরকার। এতে অবশ্য বৈদেশিক উন্নয়ন মন্ত্রী রিচার্ড উড সমমতি জ্ঞাপন করতে পারেননি। তিনি বলেন যে, 'পূর্ব পাকিস্তানে রক্তপাত বন্ধ এবং শান্তি স্থাপন সকলের কাম্য হলেও অর্থনৈতিক সাহায্যকে চাপের ব্যাপারে ব্যবহার করা অনুচিত।' তাঁকে শেখ মুজিবের নিরাপত্তা সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে উত্তরে বলেন যে, তাঁদের সর্বশেষ খবর অনুসারে শেখ মুজিবকে বন্দী করে পশ্চিম পাকিস্তানে নিয়ে যাওয়া হয়েছে এবং তারা তাঁর বিচার করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে এরূপ মনে হয়।

যে প্রস্তাবকে ভিত্তি করে এই আলোচনা হয় সেটি আনুষ্ঠানিকভাবে উত্থাপন করেন পার্লামেন্টের সদস্য ডগলাসম্যান। এই প্রস্তাবে আমরা যা চাই তার চেয়ে অনেক কম বলা হয়েছে। কিন্তু পার্লামেন্টের নিকট থেকে সরাসরি স্বাধীনতার সমর্থনসূচক প্রস্তাব আশা করা যায় না। এতে রাজনৈতিক সমাধানের কথা প্রস্তাব দেওয়ায় এটি সর্বসমমতিক্রমে গৃহীত হয়। তবে ব্রুস ডগলাসম্যান স্বাধীনতার দাবী সমর্থন করে বক্তৃতা করেছেন। বহু সদস্য সমর্থিত এই প্রস্তাবটিতে বলা হয় যে, পূর্ব পাকিস্তানে সংঘাতের অবসানকল্পে গণতান্ত্রিক অধিকারের স্বীকৃতির ভিত্তিতে রাজনৈতিক নিষ্পত্তির জন্য বৃটিশ সরকারের প্রভাব বিস্তার করা উচিত। ডগলাসম্যান বলেন, পাকিস্তানের সামরিক বাহিনীর আক্রমণের ফলে যে ঘৃণার উদ্রেক হয়েছে, তার ফলে একটি রাষ্ট্র হিসেবে পাকিস্তান আজ মৃত এবং যতক্ষণ পর্যন্ত পশ্চিম পাকিস্তানী সেনাবাহিনীকে বের করে না দেওয়া হবে ততক্ষণ পর্যন্ত এই যুদ্ধ চলবেই। তিনি তাঁর সাম্প্রতিক সফরের অভিজ্ঞতা থেকে জোর দিয়ে বলেন, 'পাকিস্তানী সেনাবাহিনীই প্রথম বাঙালীদের হত্যা করতে শুরু করে। আক্রমণ প্রতিরোধ করার জন্য আজ বাংলাদেশের প্রবাসী সরকার ঘোরতর যুদ্ধে লিপ্ত। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বৃটেনের যে প্রতিপত্তি আছে তাই দিয়ে চাপ সৃষ্টি করা উচিত। তাড়াতাড়ি যুদ্ধ শেষ হলে স্বাধীন পূর্ববঙ্গ একটি দায়িত্বশীল সরকার গঠন করে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে পারবে এবং সেখানে গণতান্ত্রিক ধারা রক্ষিত হবে।' তিনি আরো বলেন যে, 'বৃটিশ সরকারের উচিত বিশ্বব্যাংকের অর্থ পাকিস্তান যাতে পূর্ব পাকিস্তানীদের দমনের কাজে ব্যবহার করতে না পারে সে জন্যে বিশ্বব্যাংককে অনুরোধ করা।'

ছায়া সরকারের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডেনিস হিলি বলেন, 'শেখ মুজিবকে যেন কখনও বিচারের জন্য দাঁড় করানো না হয়, তাঁকে অবিলম্বে মুক্তি দেওয়া উচিত এবং বর্তমান সংঘাতের

সন্তোষজনক পরিসমাপ্তির জন্য তাঁকে পূর্ণ ক্ষমতা দেওয়া উচিত।'

জন স্টোনহাউস তাঁর সাম্প্রতিক কলকাতা ও বাংলাদেশের কিছু অংশ সফরের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করে বলেন যে, 'পাকিস্তানের সামরিক বাহিনীর নির্মমতা সকল সীমা ছাড়িয়ে গেছে।'

মাইকেল বার্নস বলেন, 'পাকিস্তান হাইকমিশন লন্ডনে যে সব বাঙালী স্বাধীনতা আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছেন তাঁদের সমবন্ধে বৃটিশ সরকারের মাধ্যমে খবরাখবর নেয়ার চেষ্টা করছেন। কোনো অবস্থাতেই যেন বৃটিশ সরকার এই সব বাঙালীর সম্বন্ধে পাকিস্তান সরকারকে কোনো তথ্য সরবরাহ না করেন।'

সরকারের পক্ষ থেকে রিচার্ড উড আশ্বাস দেন, পাকিস্তান হাইকমিশন যদি অনুরূপ কোন অনুরোধ জানায় তাহলে কখনই তাদের অনুরোধ রক্ষা করা হবে না।

ডগলাসম্যান আনীত প্রস্তাবটি সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

পঁচিশে মার্চ হত্যাযজ্ঞ শুরু হওয়ার মাত্র দেড়মাসের মধ্যে বৃটিশ পার্লামেন্টে এতটা আলোড়ন সৃষ্টি বৃটেনে বসবাসকারী বাঙালীদের মধ্যে আশাতীত উৎসাহ ও উদ্দীপনার সৃষ্টি করে। এই ঘটনা তাঁদের দান করে আত্মবিশ্বাস। সত্যের জয় অবধারিত, একথা তাঁরা মনেপ্রাণে বিশ্বাস করতে শুরু করেন। আমরা বিভিন্ন শাখা সমিতিকে পার্লামেন্টে প্রচার কার্য চালানোর জন্য প্রতিনিধি প্রেরণ করার অনুরোধ করে খুবই ভাল করেছিলাম। শুধুমাত্র লন্ডনের কর্মীরাই যদি কাজ করতেন তাহলে বার্মিংহাম, ম্যানচেষ্টার এমনকি স্কটল্যান্ডে বসবাসকারী বাঙালীরা এই সাফল্যের তৃপ্তি তেমন করে অনুভব করতে পারতেন না। সকলেই স্বাধীনতা সংগ্রামে জড়িত এই বোধ সৃষ্টি করার মানসে আমরা বিভিন্ন অঞ্চলের বাঙালীদের কষ্ট করে লন্ডনে আসতে অনুরোধ করি এবং তাঁরাও এসে দেশের জন্য কাজ করতে পারছেন মনে করে আনন্দবোধ করেন। আমি আগেই বলেছি, একটি সংগ্রামে সবচেয়ে বেশী যে জিনিস প্রয়োজন তা হচ্ছে সমষ্টিগতভাবে অংশগ্রহণ ও উদ্দীপনা সৃষ্টি।

উনিশ

পঁচিশে মার্চের রাতে জুলফিকার আলী ভুট্টো হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে ছিলেন। তাঁর চোখের সামনে দেখেছেন, কেমন করে সে রাতে বাঙালীদের হত্যা করা হয়েছে। তথাপি তিনি ফিরে গিয়ে করাচি বিমান বন্দরে বলেন, আল্লাহকে ধন্যবাদ পাকিস্তান রক্ষা পেয়েছে। মে মাসের মাঝামাঝি তিনিও সুর নরম করতে বাধ্য হন এবং বলেন যে, পূর্ব পাকিস্তানের সমস্যা সমাধান করতে হলে পূর্ব পাকিস্তানের নেতৃবৃন্দের সঙ্গে কথা বলতে হবে। তিনি উপলব্ধি করতে সক্ষম হননি যে, সব কথা শেষ হয়ে গেছে, বাংলাদেশ পঁচিশে মার্চের রাতেই জন্মলাভ

করেছে।

আমি আগেই উল্লেখ করেছি যে, অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়কে ভিত্তি করে গড়ে ওঠা অক্সফোর্ড শহরে বাইশে মে দুপুরে একটি জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। স্টিয়ারিং কমিটির পক্ষ থেকে শেখ আবদুল মান্নান যুক্তিপূর্ণভাবে আমাদের সংগ্রামের সূচনা ও উদ্দেশ্য ব্যক্ত করেন। এই সভা মাধ্যহ্ন ভোজের পরে শুরু হয়। আমরা অক্সফোর্ডে পৌঁছুলে একটি বাংলাদেশী রেষ্টুরেন্টের মালিক অক্সফোর্ডের নেতৃস্থানীয় বাঙালীদের সঙ্গে ঘরোয়া আলোচনার জন্য আমাদেরকে তাঁর রেষ্টুরেন্টে নিয়ে যান। সেখানে অনেক বাঙালী উপস্থিত ছিলেন। মধ্যাহ্ন ভোজনের সময় আলোচনা চলছিল। সেখানে একজন বাঙালী আমাকে একাধিকবার জিজ্ঞেস করলেন, দেশ কবে স্বাধীন হবে বলে আমি মনে করি। আমি তাঁকে বুঝিয়ে বললাম যে, দেশ কবে স্বাধীন হবে সে কথাতো বলা যায় না। ফল দেয়ার ভার পরম করুণাময় আল্লাহর উপরে। আমাদের অনবরত কাজ চালিয়ে যেতে হবে। তবুও তিনি জিজ্ঞেস করছিলেন, আমার ধারণা কি খুলে বললে ভালো হয়।

কিছুদিন থেকেই আমার কানে আসছিল যে লন্ডনস্থ পাকিস্তান দূতাবাস বাঙালীদের মধ্যে প্রচারণা চালাচ্ছে যে, বছরের পর বছর চলে যাবে দেশ স্বাধীন হবে না। আর এরপরে হলেই বা লাভ কি। ততদিনে না খেতে পেয়ে তাদের আত্মীয়-স্বজন মরে যাবে। লন্ডনে বহু বাঙালী অর্থ উপার্জন করেন। তাঁরা সেই অর্থ দেশে পাঠান এবং সেই টাকায় তাঁদের পরিবারের ভরণ-পোষণ চলে। আমার মনে হলো ভদ্রলোক এই কথাগুলি বোধ করি আমাকে বলতে চাচ্ছেন অথচ বলতে পারছেন না। একটু পরেই যখন জনসভা আরম্ভ হল আমাকে কিছু বলতে অনুরোধ করা হলো, তখন অন্যান্য বিষয়ে আলোচনার পরে আমি কিছুটা আবেগের সঙ্গেই বললাম, 'আমাকে মাঝে মাঝেই প্রশ্ন করা হয় দেশ কবে স্বাধীন হবে। আজ এ প্রশ্ন আমাদের জন্য একেবারে অবান্তর হয়ে গেছে। দেশ স্বাধীন হবে এই ঘোষণা আমরা করেছি। যতদিন পর্যন্ত দেশ স্বাধীন না হবে আমাদের সংগ্রাম চলবে, আপোষহীন, বিরামহীন সংগ্রাম।'

পাকিস্তান দূতাবাসের সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিরা রটনা করে বেড়াচ্ছেন যে প্রবাসী সরকার পাকিস্তানের সঙ্গে আপোষ করে ফেলবে। এই বিষয়ে পথে-ঘাটে অনেকেই আমাকে প্রশ্ন করেন। এসব কথায় আমার ভেতরে একটা চাপা রাগ জমে ওঠে। স্বাধীনতার তারিখ জানতে চাওয়ায় সেই রাগটারও কিছু বহিঃপ্রকাশ ঘটলো। আমাদের আন্দোলনের জন্য বোধ করি তার প্রয়োজনও ছিল। আমি বলে চললাম, আমি মাঝে মাঝে শুনতে পাই বাংলাদেশ সরকার পাকিস্তানের সঙ্গে আপোষও করে ফেলতে পারেন। সরকারের বিশেষ প্রতিনিধি হিসেবে আমি পূর্ণ দায়িত্ব নিয়ে ঘোষণা করছি যে, এই প্রচারণা সর্বৈব মিথ্যা। বাংলাদেশ সরকার দেশ স্বাধীন না হওয়া পর্যন্ত সংগ্রাম চালিয়ে যেতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। এসব শত্রুদের মিথ্যা প্রচারণা। গত মহাযুদ্ধে উইনস্টোন চার্চিল বার বার বলেছেন, 'উই হ্যাভ রিচড এ পয়েন্ট অব নো রিটার্ণ।' এটা বাংলাদেশ সরকারেরও কথা। আর ব্যক্তিগতভাবে আমার কথা এই যে লন্ডনের রাজপথে আমার শবদেহ পড়ে থাকবে, কিন্তু পাকিস্তানের সঙ্গে আপোষ করে দেশে ফিরব না। একবার যখন স্বাধীনতা চাই বলে ঘোষণা করেছি, তখন স্বাধীনতা অর্জিত না হওয়া পর্যন্ত আমাদের

আর কোন পথ নেই। ইনশাআল্লাহ স্বাধীন বাংলাদেশেই আমরা ফিরে যাবো।

সভায় অনেক ইংরেজ উপস্থিত ছিলেন। তাই আমি ইংরেজী এবং বাংলা উভয় ভাষাতেই কথাগুলো বলি। সেই সময় আমাদের সভাগুলোতে বাঙালীসহ যথেষ্ট বিদেশী শ্রোতা উপস্থিত থাকতেন। তাই প্রত্যেক সভাতেই আমি ইংরেজী এবং বাংলা উভয় ভাষায় বক্তৃতা করেছি।

অক্সফোর্ডের সভার শেষে আমরা ব্রেচলি শহরে যাই। সেখানে বাঙালীদের মধ্যে খুবই উৎসাহ দেখলাম। হলটি বাঙালী এবং ইংরেজ শ্রোতাদের দ্বারা পূর্ণ ছিল। এর থেকেই বোঝা গেল তাঁরা বেশ কর্মতৎপর ছিলেন। এখানে স্থানীয় বক্তা ছাড়াও শেখ আবদুল মান্নান এবং আমি বক্তৃতা করি। শেখ আবদুল মান্নান এবং আমি পরের দিন ২৩শে মে সকালে বিমানে গ্লাসগো চলে গেলাম। আমাদের গ্লাসগো যাতায়াতের খরচ গ্লাসগো কমিটি বহন করে, এই কমিটিতেও নেতৃত্ব দেন কয়েকজন ডাক্তার। তাঁরা কখনও কোন সমস্যার সৃষ্টি করেননি। দিনরাত পরিশ্রম করেছেন। তাঁরা গ্লাসগো থেকে মাঝে মাঝে লন্ডনে আমাদের গোরিং স্ট্রীটের অফিসে এসে আমার সঙ্গে দেখা করেছেন এবং লন্ডনে থাকার সময় যে সব সভা–সমিতি হয়েছে তাতে যোগদান করেন। তাছাড়া তাঁরা পার্লামেন্টে গিয়ে এম–পিদের সঙ্গে দেখা করেছেন এবং বাংলাদেশের দুঃখ–বেদনার কথা তুলে ধরেছেন। আমি তাঁদেরকে সাধারণতঃ বৃটিশ পার্লামেন্টের স্কটল্যান্ডের সদস্যদের সঙ্গে দেখা করতে পাঠাতাম। গ্লাসগো কমিটির পক্ষ থেকে যে কয়েকজন ডাক্তার আসতেন তাঁরা খুব ধীর–স্থির প্রকৃতির লোক ছিলেন। আদর্শের প্রতি নিষ্ঠা ও একাগ্রতা তাঁদেরকে আমার হৃদয়ের খুব কাছে নিয়ে আসে।

তেইশে মে গ্লাসগো বিমান বন্দরে তাঁরা আমাদের অভ্যর্থনা জানালেন এবং ডাঃ শামসুদ্দিনের বাড়িতে নিয়ে গেলেন। গ্লাসগোর স্থানীয় কমিটির সদস্যদের সঙ্গে ঘরোয়া আলোচনায় মিলিত হয়ে আমরা কয়েক মাসের একটি কর্মসূচী গ্রহণ করলাম। ডাঃ শামসুদ্দিনের বাড়িতে মধ্যাহ্ন ভোজনের পরে আমরা একটি বড় হলে যাই। সেখানে একটি জনাকীর্ণ সভায় আমরা দু'জনেই বক্তৃতা করি। অনেক শ্বেতাঙ্গ শ্রোতা ছিলেন বলে আমাকে অন্যদিনের মত ইংরেজী এবং বাংলা দু'ভাষাতেই বলতে হয়। স্কটল্যান্ডে এটিই প্রথম বক্তৃতা বলে আমি আমাদের নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলন কিভাবে স্বাধীনতা সংগ্রামে পরিণত হয় তা ধীরে ধীরে বিশ্লেষণ করি। আমি বলি যে, একটি স্বাধীন দেশের নাগরিকরা গণতন্ত্রের ভিত্তিতে যে সম অধিকার ভোগ করে, আমরা শুধু তাই চেয়েছিলাম। কিন্তু অধিকার চাওয়ার শাস্তিস্বরূপ তারা যখন আমাদের হত্যা করতে শুরু করলো তখনই আমরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে স্বাধীনতা ঘোষণা করি এবং পশ্চিম পাকিস্তানী অধিবাসীদের আচার–ব্যবহারে এই কথাই প্রমাণিত হয় যে, তাদের সঙ্গে আমাদের এক রাষ্ট্রে অবস্থান আর সম্ভব নয়। এরপর আমি তাঁদের স্বাধীনতা আন্দোলনের কর্মসূচি নিয়েও আলোচনা করি। শেখ আবদুল মান্নানও সভায় বক্তৃতা করে এবং ঐক্য বজায় রেখে বাঙালীদের সুসংহতভাবে এগিয়ে যাওয়ার প্রয়োজনীয়তার উপর তিনি যথেষ্ট গুরুত্ব দেন। সভার শেষে আরো কিছু কমিটির সদস্যদের সঙ্গে আলোচনা করলাম। তারপর আমরা সন্ধ্যার প্লেনে ফিরে আসি লন্ডনে। এখানে যে ডাঃ শামসুদ্দিনের বাড়িতে আতিথেয়তা গ্রহণ করি তাঁর সম্পর্কে কিছু বলতে চাই। তিনি একজন এম, আর, সি, পি,

ডাক্তার। স্বল্পভাষী সংস্কৃতিবান মানুষ। দেশ স্বাধীন হবার পরে হঠাৎ একদিন আমার সঙ্গে দেখা করতে বঙ্গভবনে আসেন। তাঁর সাথে বেশ অনেকক্ষণ গ্লাসগোর স্মৃতিচারণ করলাম। এর কয়েকদিন পর হঠাৎ এক টেলিফোন আসে যে, তিনি এক সড়ক দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত। এই খবর পাওয়ার সঙ্গে আমি আমার মিলিটারী সেক্রেটারী ব্রিগেডিয়ার সালাউদ্দিনকে নিয়ে মেডিকেল কলেজে যাই। ডাক্তারদের যথাসাধ্য চেষ্টা করতে দেখলাম। তাঁর স্ত্রী এবং কয়েকটি সন্তানও গুরুতররূপে আহত হয়েছেন। দু'তিন দিন পরে ডাঃ শামসুদ্দিন, তাঁর স্ত্রী এবং একটি মেয়ে প্রাণ ত্যাগ করেন। খবর পেয়ে আমি জানাজায় যাই এবং দাফনের সময় উপস্থিত ছিলাম। মৃত্যুর কয়েকদিন আগে তিনি আমার সঙ্গে যখন বঙ্গভবনে দেখা করেন আমি তাঁকে বলি, 'আমি তো গ্লাসগোতে আপনার সুপ্রতিষ্ঠিত প্র্যাকটিস দেখে এসেছি। অত ভালো প্র্যাকটিস ফেলে আপনি দেশে চলে আসায় খুবই আনন্দিত বোধ করছি। আপনি একটি মহৎ উদাহরণ স্থাপন করলেন।' উত্তরে তিনি বললেন, 'আমি চিকিৎসাশাস্ত্রের যেটুকু শিখতে পেরেছি তা আমার দেশের লোকের কাজে লাগুক এই আশা নিয়েই এসেছি। যে দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশগ্রহণের সুযোগ পেয়েছিলাম, সেই দেশ আজ স্বাধীন। আজ আমাদের প্রত্যেকের কর্তব্য হচ্ছে নিজেদের মেধা দেশের কাজে নিয়োগ করা।' কিন্তু নিষ্ঠুর অদৃষ্ট সেই সুযোগ তাঁকে দিল না।

বিশ

গ্লাসগো থেকে ফেরার পরদিন চব্বিশে মে আমি নিউইয়র্কে যাই। আমার সঙ্গে এনামুল হক ছিলেন। আমরা অপরাহ্নে নিউইয়র্কে পৌঁছে দেখি মাহমুদ আলী অনেক বাঙালী সহকর্মী নিয়ে বিমানবন্দরে উপস্থিত। মাহমুদ আলী সকলের সঙ্গে আমাদের পরিচয় করিয়ে দিলেন। এরপরে আমরা হোটেলে এসে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করে সন্ধ্যায় বাঙালীদের সঙ্গে এক ঘরোয়া বৈঠকে মিলিত হই এবং সেখানে নিউইয়র্কে বসবাসরত বাঙালীদের প্রায় সবাই উপস্থিত ছিলেন। কর্মীসভায় সকলের আলোচনা শেষে কর্মপদ্ধতি সম্বন্ধে আমার ধারণা সকলকে বলি। সেদিন আমাদের আলোচনা চলে দুপুর রাত পর্যন্ত। ঠিক হয় যে, বিভিন্ন দল বিভিন্ন দিনে ওয়াশিংটন গিয়ে সিনেটর ও কংগ্রেসম্যানদের সঙ্গে দেখা করে বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের কারণ বিশ্লেষণ করে সমর্থন আদায়ের চেষ্টা করবেন। পরের দিন শিকাগো থেকে ফজলুর রহমান খান (এফ, আর খান) আমার সঙ্গে দেখা করতে আসেন। তাঁর সঙ্গে কর্মসূচী নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হলো। মে মাসের প্রথম সপ্তাহে তিনি লন্ডনে এসেছিলেন, তখন আমি

তাঁকে যুক্তরাষ্ট্রের বাঙালীদের নিয়ে একটি কমিটি গঠন করার কথা বলেছিলাম। ফজলুর রহমান খান যুক্তরাষ্ট্রের নানা শহরে অবস্থানরত সকল বাঙালীকে নিয়ে একটি কমিটি গঠনের কাজ প্রায় শেষ করে এনেছেন বলে জানালেন। তিনিও বিভিন্ন শহর থেকে বাঙালী ওয়াশিংটনে গিয়ে একটি সুনির্দিষ্ট কর্মপন্থা অবলম্বনে কাজ করে যাচ্ছিলেন। শিকাগো অবস্থান করেই তিনি নানা শহরে বাঙালীদের সঙ্গে টেলিফোনে যোগাযোগ করে তাঁদেরকে ওয়াশিংটনে পাঠান। পৃথক পৃথক ভাবে নানা অঞ্চল থেকে একই সিনেটর বা কংগ্রেসম্যানদের কাছে তিনি প্রতিনিধিদল পাঠাতেন। তাঁদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে বাংলাদেশরে কথা তুলে ধরতে লাগলেন। এতে সিনেটর–কংগ্রেসম্যান এবং অন্যান্য নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি এটাই উপলব্ধি করেন যে, আমাদের স্বাধীনতার সংগ্রাম সাড়ে সাত কোটি বাঙালীর সংগ্রাম। আমাদের এই কর্মসূচী খুবই সাফল্য লাভ করে। বিভিন্ন সিনেটর এবং কংগ্রেসম্যান আমাদের স্বাধীনতা আন্দোলনের সমর্থনে বক্তব্য রাখেন। প্রেসিডেন্ট রিচার্ড নিক্সন আমাদের স্বাধীনতা আন্দোলনের বিরোধী হলেও আমাদের কর্মতৎপরতার ফলে মার্কিন জনগণের সমর্থন আমাদের পক্ষে চলে আসে।

ফজলুর রহমান খান বিশ্বস্থাপত্যে তাঁর দেশ ও নিজের জন্য গৌরবের আসন প্রতিষ্ঠা করেছেন। তাঁর সাধনার ক্ষেত্রে তিনি একক। কিন্তু সেই ক্ষেত্রের বাইরে এসে তিনি দেশের কথা চিন্তা করেছেন। দেশের মানুষের মর্মব্যথা তাঁকে চঞ্চল করে তুলেছিল। সুশৃঙ্খল চিন্তাধারার অধিকারী এই মানুষটি একটি সুপরিকল্পিত কর্মসূচী গ্রহণ করে নিক্সন সরকারের প্রচেষ্টায় বাধা সৃষ্টি করার জন্য যুক্তরাষ্ট্রের জনগণের কাছে তাঁর দেশবাসীর আবেদন পৌঁছে দেন। অথচ এত ব্যস্ততার মধ্যে তাঁর জীবন কাটতো যে তিনি কোনো সময়ই পুরো দিন নিউইয়র্কে যাপন করতে পারেননি। তিনি শিকাগো থেকে এক প্লেনে আসতেন আবার আমার সঙ্গে আলোচনা শেষ করে সেদিনই আরেক প্লেনে ফিরে যেতেন। লন্ডনে মে মাসে হঠাৎ উপস্থিত হয়ে তিনি আমার সঙ্গে দেখা করতে চান। তাঁর সঙ্গে আমার পরিচয় ছিল না যদিও আমি তাঁর সর্বজনশ্রদ্ধেয় শিক্ষাবিদ পিতা আবদুর রহমান খানের স্নেহ চিরদিনই পেয়ে এসেছি। সাধনার উচ্চতম স্তরে উপনীত এই দেশপ্রেমিক মানুষটির নিরহংকার ব্যবহার আমাকে মুগ্ধ করে। দেশ থেকে দূরে সমস্ত জীবন কাটালেও দেশের মানুষের প্রতি তাঁর এই ভালবাসার কথা তাঁরা কি করে জানবেন, উপলব্ধি করবেন এক নির্মম বেদনা তাঁকে যেন অস্থির করে তুলেছিল। আজ তিনি আমাদের ছেড়ে চলে গেছেন। ধন্যবাদের অপেক্ষা করেননি, বিদায় নেবার সুযোগ দেননি। তাঁর কথা লিখতে গিয়ে চোখ দু'টি আমার আজ যেমন সজল হয়ে উঠেছে, তাঁর অম্লান স্মৃতি যতদিন বেঁচে থাকবো—আমাকে এমনি করেই নাড়া দেবে।

এ,এম,এ মুহিত ও হারুন অর–রশদ আমার সঙ্গে নিউইয়র্কে পৌঁছানোর দিনই দেখা করতে আসেন। কিছু বলার আগেই তাঁদের বুকে বাংলাদেশের ব্যাজ দেখে আনন্দিত হই। তাঁরা তখন স্বাধীনতা আন্দোলনের সমর্থনে কাজ করে যাচ্ছেন। তাঁরা যথাসময়ে অন্যান্য কূটনীতিবিদের সঙ্গে একযোগে বাংলাদেশ সরকারের প্রতি আনুগত্য ঘোষণা করবেন বলে জানালেন। অন্যান্য কূটনীতিবিদের সঙ্গে এ নিয়ে আলোচনা হচ্ছে বলেও জানান। আমি

বললাম যে, ঘোষণাটাই বড় নয়, কাজটাই বড়। এ, এম, এ মুহিত পাকিস্তান দূতাবাসে ইকোনমিক মিনিষ্টার ও হারুন-অর রশিদ তখন ওয়াশিংটনে বিশ্বব্যাংকের প্রধান কার্যালয় ও যুক্তরাষ্ট্রে পাকিস্তান দূতাবাসে কাজ করছিলেন। তাঁরা ৪ঠা আগষ্ট অন্যান্য কূটনীতিবিদসহ বাংলাদেশ সরকারের প্রতি আনুষ্ঠানিকভাবে আনুগত্য ঘোষণা করেছিলেন।

মাহমুদ আলী, এনামুল হক এবং আমি প্রত্যেকদিন জরুরী ভিত্তিতে বিভিন্ন রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে দেখা করি। এ ব্যাপারে মাহমুদ আলীর স্ত্রী শাহীন মাহমুদ আলী আমাদের যথেষ্ট সাহায্য করেন। তিনি একটি দূতাবাসে ফোন করে আমার জন্য সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা করলে আমরা সেই রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে যখন সাক্ষাতে লিপ্ত তখন মিসেস আলী অন্য রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে দেখা করার ব্যবস্থা করে ফেলতেন। আমরা বেরিয়ে এসে তাঁকে ফোন করলে মিসেস আলী আমাদের পরবর্তী সাক্ষাৎকারের কথা বলে দিতেন। মাহমুদ আলী আমাকে তাঁর গাড়ীতে করে সেই দূতাবাসে নিয়ে যেতেন। এই ব্যবস্থার দ্বারা আমি নিউইয়র্কে অল্পদিনের অবস্থানের মধ্যেই বেশ কয়েকজন বিশিষ্ট রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে দেখা করতে সক্ষম হই। তাছাড়া আমি যে কয়দিন নিউইয়র্কে ছিলাম, মাহমুদ আলী সারাক্ষণ আমার সঙ্গে ছিলেন। তিনি সকালে আসতেন, সকল এনগেজমেন্ট শেষে রাত দুপুরে আমাকে রুমে রেখে বাসায় ফিরে যেতেন। যে ক'দিন ছিলাম এভাবেই কাজ হচ্ছিল। আমি নরওয়েের রাষ্ট্রদূত হ্যামব্রো-র সঙ্গে দেখা করলাম। তিনি সেবার জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের সভাপতি ছিলেন এবং রেডক্রসের সঙ্গেও জড়িত ছিলেন। তিনি খুবই সহানুভূতিসহ আমাদের সঙ্গে কথা বলেন। আমি সৌদি আরবের রাষ্ট্রদূত বারোদীর সাথে দেখা করে তাঁকে আমাদের স্বাধীনতা আন্দোলনের কারণ বিশ্লেষণ করি। এছাড়া তাঁকে, রোকেয়া হলে পাকবাহিনীর নারী নির্যাতনের প্রকাশিত খবরটি দেখাই। খবরটি পড়ার সময় তাঁর চোখ দিয়ে পানি গড়িয়ে পড়ে। তিনি বলেন, 'জাষ্টিস চৌধুরী, আমাকে আর দেখাবেন না, আমি আর সহ্য করতে পারছি না। তিনদিন পরে বাদশাহ ফয়সল ওয়াশিংটনে আসবেন। সে সময় আমি অবশ্যই বাংলাদেশের অবস্থা এবং এই নিপীড়নের কাহিনী তাঁকে জানাব।' আমি তাঁকে অনেক ধন্যবাদ দিয়ে বললাম, 'আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রাম ভারতের উস্কানিতে হয়েছে-এই প্রচারণা একেবারেই মিথ্যা-এ কথাটাও বাদশাহকে জানাবেন। এই গণহত্যার জন্য বাঙালীরা বুঝতে পারলো পাকিস্তানের সঙ্গে আর একত্রে থাকা সম্ভব নয় এবং সমগ্র জাতি একযোগে স্বধীনতার সমর্থনে দাঁড়িয়ে গেছে। এছাড়া তাদের কাছে আর কোনো পথ খোলা নেই।'

আমি আলজিরিয়া, লিবিয়া, মিসর, জর্ডন, ইরাক, ইরান, সিরিয়া প্রভৃতি মুসলিম রাষ্ট্রদূতদের সঙ্গে দেখা করে অনুরূপভাবে আমাদের আন্দোলন সম্পর্কে অবহিত করি। পশ্চিম ইউরোপের কয়েকজন রাষ্ট্রদূতের সঙ্গেও দেখা করি।

আমরা ফোর্ড ফাউন্ডেশনের কর্মকর্তাদের সঙ্গে একাধিকবার দেখা করি। প্রত্যেকবারই আমরা খুব সৌহার্দ্যপূর্ণ ব্যবহার পেয়েছি। আমাদের জন্য এটা যে ন্যায়যুদ্ধ তা তাঁরা উপলব্ধি করেছিলেন। বৃটেন এবং অন্যান্য জায়গায় অনেক বাঙালী ছাত্র ফোর্ড ফাউন্ডেশনের বৃত্তি নিয়ে পড়াশোনা করছিলেন। তাঁদের অধ্যয়নে দু'টি অন্তরায় দেখা দেয়। প্রায় প্রত্যেক বাঙালী ছাত্রই স্বাধীনতা আন্দোলনে যোগদান করায় পাকিস্তান দূতাবাস তাদের অসুবিধায় ফেলার

উদ্দেশ্যে ফোর্ড ফাউন্ডেশনের বৃত্তি কেটে দেওয়ার চেষ্টা করছিল। তাছাড়া কার্যপদ্ধতির জন্যও নানা অসুবিধা হচ্ছিল। পাকিস্তান দূতাবাসের মাধ্যমে বৃত্তি নিতে হতো। কিন্তু কোনো বাঙালী ছাত্রের পক্ষে তখন আর দূতাবাসের অভ্যন্তরে প্রবেশ নিরাপদ ছিল না। আলোচনার পর ফোর্ড ফাউন্ডেশন একটি সাময়িক ব্যবস্থা গ্রহণ করে যার ফলে মাস ছ'য়েক কোনো বাঙালীর বৃত্তি পেতে অসুবিধা দূর হয়। বৃত্তি ভোগকারী বাঙালী ছাত্রদের সরাসরি বৃত্তির টাকা পাঠানোর ব্যবস্থা করা হয়। এবারের নিউইয়র্ক সফরে এটাকে আমরা খুবই গুরুত্বপূর্ণ সাফল্য মনে করেছি। ছয় মাস পরে আবার এ নিয়ে আলোচনা করা হবে বলে ঠিক হয়। এনামুল হকও ফোর্ড ফাউন্ডেশনের বৃত্তি নিয়ে ডক্টরেটের জন্য অক্সফোর্ডে গবেষণায় নিয়োজিত ছিলেন। তিনি এ ব্যাপারে নিজস্ব অভিজ্ঞতার দ্বারা বাস্তব অসুবিধার কথা বলতে পারায় আমাদের কাজ অনেকটা এগিয়ে যায়। ফোর্ড ফাউন্ডেশন এ ব্যাপারে যুক্তিসঙ্গত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করায় অনেক ছাত্র এদিক দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে যান। এতে আমাদের আন্দোলনের সহায়তা হয়।

একুশ

নিউইয়র্কে পৌঁছার পরদিনই মাহমুদ আলী আমাকে যোগেন্দ্রনাথ ব্যানার্জীর (ডঃ জে, কে ব্যানার্জী) সঙ্গে দেখা করার জন্য নিয়ে গেলেন। তাঁর বাসস্থানটি জাতিসংঘের সদর দপ্তরের একেবারে কাছে। লিফটে করে উপরে উঠতেই ডঃ ব্যানার্জী সহাস্যে ও সাদরে আমাদের অভ্যর্থনা জানালেন। তাঁকে দেখলেই অনুভব করা যায়, জীবনের নানা অভিজ্ঞতায় দৃপ্ত তাঁর আসন। তিনি তখন প্রৌঢ়ত্ব পার হয়ে এসেছেন বলা চলে। তাঁর বসবার ঘরে পা দিয়ে দেখলাম, বইয়ের সেলফগুলো চারদিকের দেয়াল ঢেকে ছাদ অবধি উঠেছে। তাঁর পাঠাগার দেখলেই বোঝা যায়, জ্ঞানের নানা ক্ষেত্রেই তাঁর অনুসন্ধিৎসা ও আগ্রহ।

ডঃ ব্যানার্জী প্রথম জীবনে কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগে অধ্যাপনার পর যোগ দেন সাংবাদিকতায়; উন্মুখ হয়ে ওঠেন এই উপমহাদেশের স্বাধীনতার জন্য। এসময় জওহরলাল ও সুভাষচন্দ্রের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসেন তিনি। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় তিনি প্যারিসে ছিলেন। সুভাষ চন্দ্র ভারত ত্যাগ করে জার্মানীতে পৌঁছে সেখান থেকে তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করেন। এ সময় ডঃ ব্যানার্জী জওহরলালের কাছ থেকে দূরে সরে যান এবং সুভাষ চন্দ্রের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতর হন।

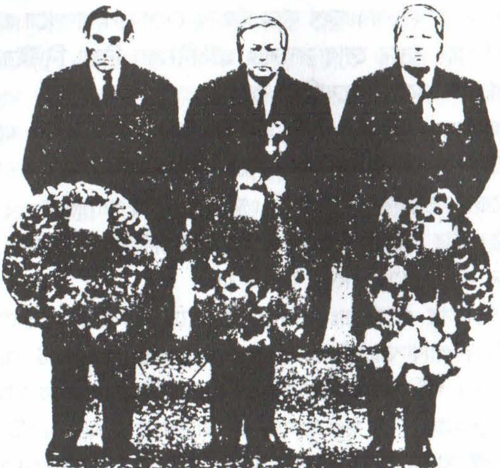
সেদিনই ডঃ ব্যানার্জী আমাদেরকে তাঁর অফিসে নিয়ে এলেন। জাতিসংঘের সদর দপ্তরের যে অংশে সাংবাদিকদের অবস্থান, সেখানে তাঁরও একটি কক্ষ ছিল। তিনি সেদিনই তাঁর বেশ

কয়েকজন সাংবাদিক বন্ধুর সঙ্গে আমাদের পরিচয় করিয়ে দেন। নিউইয়র্ক টাইমসের প্রতিনিধির সঙ্গেও পরিচয় হয় তাঁরই সৌজন্যে এবং আমেরিকার সর্বাগ্রগণ্য সংবাদপত্র নিউইয়র্ক টাইমস-এ এক কলামব্যাপী আমার সাক্ষাৎকার প্রকাশিত হয়। ডঃ ব্যানার্জীর মারফত পরিচিত হবার পর কয়েকজন সাংবাদিক এসে আমাকে পালাক্রমে তাঁদের নিজস্ব কক্ষে নিয়ে গেলেন এবং আমার সাক্ষাৎকার গ্রহণ করে তাঁদের দেশের সংবাদপত্রে প্রকাশের জন্য টেলেক্স করলেন। পরবর্তীকালে যখন ষোল সদস্যের প্রতিনিধিদল নিয়ে নিউইয়র্কে যাই তখনও ডঃ ব্যানার্জী নানাভাবে আমাদের সহযোগিতা করেন।

ব্যানার্জীর অফিসে এসে মাঝে মাঝে আমরা খবর নিতাম শহীন মাহমুদ আলী আমাদের জন্য কোন্ রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে কখন সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা করেছেন। এভাবে সেই সপ্তাহ জুড়ে আমরা তাঁর কাজের যথেষ্ট ব্যাঘাত করেছি। তাঁর প্রচেষ্টায় আমাদের এই সপ্তাহটি নানাভাবেই সার্থক হয়ে ওঠে। তাঁর চেষ্টায় নানা দেশে প্রবাসী বাঙালীদের কর্মচাঞ্চল্য, উৎসাহ-উদ্দীপনা ও স্বাধীনতা অর্জনে সর্বস্ব পণের সংবাদ পৌঁছে যায়।

নিউইয়র্ক ত্যাগের পূর্বে ডঃ ব্যানার্জীর কাছে জানতে পারলাম, মার্কিন সরকার পাকিস্তানকে 'পূর্ব-পাকিস্তানে' ব্যবহারের জন্য কতগুলো ছোট ছোট লঞ্চ দান করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। পাকিস্তান দুর্গত অঞ্চলে ত্রাণসামগ্রী সরবরাহের নাম করে এই লঞ্চগুলো চেয়েছিল। এটা শোনার পরই ডঃ ব্যানার্জী টেলিভিশনে আমার একটি সাক্ষাৎকার প্রচারের ব্যবস্থা করেন। এই সাক্ষাৎকারের ফলে আমাদের স্বাধীনতা আন্দোলনে সহানুভূতিশীল মার্কিন জনগণ লঞ্চদান বন্ধ করার জন্য চাপ দেন। ফলে পাকিস্তানের কাছে এই লঞ্চ হস্তান্তর বন্ধ থাকে। এগুলো বাংলাদেশে পৌঁছতে পারলে পাকিস্তানের সামরিক বাহিনী ছোট খাটো খালের ভেতর দিয়ে গ্রামের অভ্যন্তরে পৌঁছে যেতে পারত এবং নিরস্ত্র মানুষকে আরো বেশী করে হত্যা ও নির্যাতন করতে সক্ষম হতো। লন্ডনে থাকাকালেও অনুরূপ সংবাদ যথাসময় পাওয়ায় আমি লঞ্চ দেওয়া বন্ধ করতে আবেদন জানাই এবং বৃটিশ পার্লামেন্ট সদস্যদের সাহায্যে সেখান থেকেও লঞ্চ প্রদান বন্ধ হয়ে যায়।

GENOCIDE IN EAST BENGAL



DON'T JUST STAND THERE DO SOMETHING !

RECOGNISE BANGLA DESH

rally trafalgar square sun aug 1 2.00pm

Enquiries: ACTION BANGLA DESH, 34 Stratford Villas, London N.W.I. 485-2889.

বাইশ

নিউইয়র্কে এসে একটি ঘটনার কথা শুনে আনন্দ ও বেদনা দুই-ই অনুভব করি। নিউইয়র্কে যে স্বল্পসংখ্যক বাঙালী আছেন তাঁরা এপ্রিলের মাঝামাঝি নিউইয়র্কস্থিত পাকিস্তান কনসাল জেনারেলের অফিসটি দখল করে স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করেন এবং তাঁরা সেই অফিসে অবস্থান করতে থাকেন। সেই অফিসেই মাহমুদ আলী ভাইস কনসাল ছিলেন। ছাত্ররা এই অফিসকে বাংলাদেশের সম্পত্তি বলে দাবী করেন। কিন্তু পুলিশ কনসাল জেনারেলের মতামত জানতে চান। কন্‌সাল জেনারেল বাঙালী হলেও তখন পর্যন্ত বাংলাদেশের প্রতি আনুগত্য ঘোষণা না করায় পুলিশ এই অফিসকে পাকিস্তানী অফিস হিসবেই গণ্য করে। অবশ্য কন্সাল জেনারেলের সাহায্য পেলেও মার্কিন সরকার এই অফিস গৃহটিকে বাংলাদেশের বলে গ্রহণ করতেন কিনা কি করে বলব।

নিউইয়র্কে অবস্থানরত বাঙালীগণ আমাকে অত্যন্ত আবেগের সঙ্গে বলেছিলেন যে, পুলিশ কর্তৃপক্ষ বলেছেন, কন্‌সাল জেনারেল যদি একে বাংলাদেশের অফিস বলে ঘোষণা করেন তবে তাঁরা পুনর্দখলের চেষ্টা করবেন না। বাড়িটি ছিল পাকিস্তান সরকারের নিজস্ব। ভাড়াটে বাড়ী নয়। এভাবে যদি বাড়ীটি একবার বাংলাদেশ সরকারের দখলে এসে যেত তাহলে পাকিস্তান সরকারের কাছে বাংলাদেশ সরকারের নানাভাবে যে পাওনা আছে তারই পরিপ্রেক্ষিতে আজো এই অফিসটি হয়তো বাংলাদেশ সরকারের সম্পত্তি বলে পরিগণিত হতো।

আমি নিউইয়র্কে পৌঁছার আগেই এই বাঙালী কূটনীতিবিদ ইসলামাবাদ বদলি হয়ে চলে যান। স্বাধীনতা অর্জনের পর তিনি আমাদের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে যোগদান করলেও আমার সঙ্গে তার দেখা না হওয়ায় এ বিষয়ে তাঁর কি বলার আছে জানতে পারিনি।

একুশে এপ্রিল মাহমুদ আলী বাংলাদেশের প্রতি আনুগত্য ঘোষণার পর পুলিশ তাঁর গাড়ীর সিডি প্লেট ফেরত দেওয়ার জন্য চিঠি দেয়। কিন্তু মাহমুদ আলী জানিয়ে দেন যে, তিনি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের কূটনীতিবিদ এবং সে কারণে সিডি প্লেট রাখার অধিকার তাঁর আছে। পুলিশ বাংলাদেশ সরকার একটি স্বীকৃত সরকার নয় বলে তাঁকে বেশ লম্বা সময় দিয়ে সিডি প্লেট ফেরতের অনুরোধ জানায়। এর উত্তরে মাহমুদ আলী পুনরায় নানা যুক্তি দিয়ে সিডি প্লেট রাখার অনুমতি চেয়ে চিঠি পাঠান। এভাবে ক্রমাগত পত্র বিনিময় চলতে থাকে। দেশ স্বাধীন হবার পর মাহমুদ আলী বাংলাদেশ সরকারের কূটনীতিবিদ হিসেবে আমাদের নিউইয়র্ক দূতাবাসেই যোগদান করেন এবং তাঁর গাড়ীর সিডি প্লেটটি নিউইয়র্ক থেকে তাঁর বদলি না হওয়া পর্যন্ত তাঁর কাছেই থেকে যায়। বর্তমানে তিনি ভূটানে বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত।

নিউইয়র্কে বসবাসরত বাঙালীদের মধ্যেও নেতৃত্ব এবং কমিটি গঠন নিয়ে পরস্পর মনোমালিন্য লক্ষ্য করলাম। সরাসরি আলোচনার দ্বারা এই মনোমালিন্য দূরীভূত হয়েছে। স্বাধীনতা সংগ্রামীদের মধ্যে আদর্শগত মিল যতই থাকুক না কেন, ব্যক্তিগত জীবনেও সম্প্রীতি অত্যন্ত প্রয়োজন। এর অভাবে শত্রুপক্ষ নানাভাবে লাভবান হতে পারে একথা সবাইকে বুঝিয়ে বলি। তাঁরা আমাকে আশ্বাস দেন যে, তাঁরা সকল প্রকার বৈরীভাব দূর করে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করে যাবেন।

নিউইয়র্কে 'পূর্ব পাকিস্তান লীগ অব আমেরিকা' নামে একটি সংগঠন কয়েকবছর আগেই গড়ে উঠেছিল। এর আগে তাঁরা স্বাধিকার আন্দোলনকে সমর্থন জানিয়ে আসছিলেন। বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণার পর থেকে তাঁরা পূর্ণ স্বাধীনতার পক্ষে আন্দোলন শুরু করেন। আমি যে ক'দিন নিউইয়র্কে ছিলাম প্রতিদিনই তাঁদের সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে। সংগঠনের প্রেসিডেন্ট কাজী এম আহমদ ও তাঁর সহকর্মীগণ পরিশ্রম ও একাগ্রতার সঙ্গে আন্দোলনের সাফল্যের জন্য চেষ্টা করেছেন। তাঁরা জাতিসংঘের সেক্রেটারী জেনারেলের কাছে বাংলাদেশে পাকিস্তানীদের নৃশংসতার কথা জানিয়ে চিঠি দেন। একাত্তরের বাইশে এপ্রিল মুজিবনগর সরকার এক চিঠিতে তাঁদেরকে আমার সঙ্গে পরামর্শ করে আন্দোলনের কাজ সুসংহতভাবে চালিয়ে যেতে বলেন। এভাবে আমার সঙ্গে আন্দোলনের নয় মাসই তাঁদের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল।

ত্রিশে মে ম্যানচেষ্টারে বিরাট জনসভার আয়োজন করতে আমাকে ইংল্যান্ডে ফিরে আসতে হয়। আমি ঊনত্রিশে মে লন্ডনে ফিরে আসি। ত্রিশে মে-র জনসভা সব দিক থেকেই সফল হয়। বিরাট হলটিতে তিল ধারণের স্থান ছিল না। স্থানীয় এবং বিদেশী সাংবাদিকগণ এতে উপস্থিত ছিলেন। সভার শুরুতেই বঙ্গবন্ধুর সাতই মার্চের বক্তৃতার ক্যাসেট বাজানো হয়। এরপর ঐ বক্তৃতার ক্যাসেট আরো অনেকবার বাজানো হলেও এই প্রথম। জলদগম্ভীর স্বরে প্রদত্ত এই ঐতিহাসিক ভাষণ আমাদের শরীরে বর্ণাতীত শিহরণ সৃষ্টি করে। এ সভার আয়োজনে অক্লান্ত পরিশ্রম করেন ম্যানচেষ্টারের সর্বজনশ্রদ্ধেয় নেতা আবদুল মতিন। তাঁকে সাহায্য করেন স্টিয়ারিং কমিটির সদস্য কবির চৌধুরী এবং আরো অনেকে। ম্যানচেষ্টারে অবস্থানরত বাঙালী ছাত্রদের সভাপতি মহিউদ্দিন আহমেদ। তিনি আবদুল মতিনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রেখে আন্দোলনের সমর্থনে নয় মাস কাজ করেছেন।

সভার প্রারম্ভে সবাইকে স্বাগত জানান অক্লান্তকর্মী ও দেশগত প্রাণ আবদুল মতিন। তিনি স্বাধীনতা সংগ্রামে ম্যানচেষ্টার অঞ্চলে প্রবাসী বাঙালীদের সর্বাত্মক সাহায্যের জন্য প্রস্তুত হতে বলেন। একতার উপরে খুব জোর দেন। তাঁর পরে আরো কয়েকজন স্থানীয় নেতা বক্তৃতা করেন। এরপরে আমি পঁচিশে মার্চের রাত থেকে শুরু করে ত্রিশে মে পর্যন্ত সংঘটিত ঘটনাগুলোর বিবরণ দিই। তাছাড়া আমেরিকায় বাঙালীদের সংগঠন ও কর্মতৎপরতার উল্লেখ করি। ঢাকায় গণহত্যার কথা বর্ণনার সময় বাঙালী শ্রোতাগণ বেদনায় বিহ্বল হয়ে পড়েন এবং মুহুর্মুহু 'জয় বাংলা,' 'জয় বঙ্গবন্ধু' ধ্বনির দ্বারা স্বাধীনতার প্রতি সমর্থন জানান। স্টিয়ারিং কমিটির পক্ষ থেকে শেখ আবদুল মান্নান কেন্দ্রীয় কমিটির সঙ্গে সকলের সহযোগিতা কামনা করে বক্তৃতা দেন। তিনি সমন্বিত কর্মপদ্ধতির প্রয়োজনীয়তার উল্লেখ করেন।

জাকারিয়া চৌধুরী এবং এনামুল হক তাঁদের বক্তৃতায় সবাইকে ঐক্যবদ্ধ থাকতে আহ্বান জানান। এখান থেকেও সভা শেষে লন্ডনে ফিরতে আমাদের অনেক রাত হয়ে যায়।

ত্রিশে মে সকালে ম্যানচেস্টারে যাওয়ার আগে আমি গোরিং স্ট্রীটে যাই। কভেনট্রির সভার পরেই আমরা সংগ্রামে সাহায্যের জন্য অস্ত্র প্রেরণের পরিকল্পনা গ্রহণ করি। কাজটি ছিল দুরূহ এবং বিপজ্জনক। অস্ত্র যে দেশে ক্রয় করা হবে সে দেশের সরকারের দৃষ্টি এড়িয়ে কাজ করা ছাড়া আর কোন পথ ছিল না। বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করলেও তখন পর্যন্ত একটি দেশেরও স্বীকৃতি পাওয়া যায়নি। আমরা অস্ত্র সংগ্রহের পথ খুঁজছিলাম। এদিকে অস্ত্র সংগ্রহের পর মুজিবনগর সরকারের কাছে অস্ত্র প্রেরণ করতে ভারত সরকারে অনুমতির প্রয়োজন। তাই প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিনকে সেই অনুমতি গ্রহণের ব্যবস্থা করতে টেলিফোন এবং চিঠির মাধ্যমে অনুরোধ করি। তিনি চেষ্টা করছেন বলে উত্তর দেন। অনুমতি পেতে বিলম্ব হওয়ায় কাজটি ত্বরান্বিত করার উদ্দেশ্যে সব কথা খোলাখুলি লিখে একটি চিঠি দিয়ে স্টিয়ারিং কমিটির আহ্বায়ক আজিজুল হক ভুঁইয়াকে তাজউদ্দিনের কাছে পাঠাই। যদিও কয়েক দিনের মধ্যেই আজিজুল হকের ফেরার কথা ছিল, কার্যতঃ তিনি তিন মাস পরে লন্ডনে ফেরেন। এই তিন মাস তিনি মুজিবনগর সরকারের সঙ্গে কাজ করেছেন ও মুক্তিযোদ্ধাদের কয়েকটি শিবির দেখতে যান। শেখ মান্নান এই সময়টাতে আহ্বায়ক ও অফিস পরিচালকের দায়িত্ব পালন করেন। অফিসে অনেক কর্মী ছিলেন, কিন্তু সকলের কাজ সমন্বয় এবং প্রাত্যহিক নানা বিষয়ে সিদ্ধান্ত তাঁকেই নিতে হতো। ফলে প্রায় প্রতিদিনই শেখ মান্নানের বাড়ী ফিরতে অনেক রাত হয়ে যেত।

জুন মাসের প্রথম সপ্তাহে বিখ্যাত ভারতীয় নেতা জয়প্রকাশ নারায়ণ লন্ডনে এলে আমি তাঁর সঙ্গে এক ঘরোয়া আলোচনায় মিলিত হই। তাঁর ব্যক্তিত্ব ও আন্তরিকতা আমার মনে তাঁর প্রতি গভীর শ্রদ্ধার উদ্রেক করে। বাংলাদেশে গণহত্যা এবং ভারতে শরণার্থীদের ব্যথা-বেদনার তীব্র অনুভূতি তাঁর কথায় প্রকাশ পায়। তিনি আরো কয়েকটি দেশভ্রমণ করেন এবং পাকিস্তানের গণহত্যার পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণার অপরিহার্যতা তুলে ধরেন।

আমাদের আন্দোলন শুরু হওয়ার পরপরই কয়েকজন উৎসাহী ইংরেজ তরুণ-তরুণী 'বাংলাদেশ এ্যাকশন কমিটি' নামে একটি কর্মচঞ্চল সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন। পলকনেট এবং ম্যারিয়েট এই সংগঠনের নেতৃত্বদান করেন। তাঁদের সঙ্গে ছিলেন আরো কয়েকজন উৎসাহী ইংরেজ কর্মী। এই সংগঠন আন্দোলন চলাকালে পুরো সময়টাতে আমাদের প্রচেষ্টার পরিপূরক হয়ে কাজ করেছে। তাঁদের আন্তরিকতা এবং মানবিকতা কৃতজ্ঞতার সঙ্গে বাঙালীদের চিরদিন স্মরণ করতে হবে। সেদিন তাঁরা নিজেদের মনের তাগিদেই এসে আমাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন এবং আমাদের আয়োজিত প্রত্যেক সভায় যোগদান করে এই সংগঠনের নেতৃবৃন্দ ওজস্বিনী ভাষায় বাংলাদেশের নিপীড়িত মানুষের প্রতি একাত্মতা ঘোষণা করেন। তাঁরা নিজেরাও মাঝে মাঝে সভা আহবান করেছেন।

জয়প্রকাশ নারায়ণ লন্ডনে এলে পলকনেট ও ম্যারিয়েট অগ্রণী হয়ে তাঁদের কমিটির পক্ষ থেকে একটি সভা আহবান করেন। সভাটি খুবই সফল হয়েছিল। এই সভায় স্টোন হাউস,

ব্রুস ডগলাসম্যান, মাইকেল বার্ণস প্রমুখ ইংরেজ নেতা বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামকে পূর্ণ সমর্থন জানিয়ে বক্তৃতা করেন। তাঁদের বক্তৃতার পরে আমি সবাইকে ধন্যবাদ জানাই এবং জয়প্রকাশ নারায়ণের ভ্রমণের সাফল্য কামনা করি।

আমার বক্তৃতার পরে জয়প্রকাশ নারায়ণ একটি ভাষণ দেন। ঘরোয়া আলোচনায় যেমন জনসাধারণের সামনেও তেমনি, মনে হলো যে, তিনি তাঁর অন্তরের কথাগুলো যেন একের পর এক তুলে ধরছেন; আর তাঁর কথাগুলো শ্রোতাদের অন্তর্লোকে প্রবেশ করছে। এই সভায় একজন বাঙালী ছাত্র জয়প্রকাশকে জিজ্ঞেস করেন, ভারত সরকার কেন বাংলাদেশ সরকারকে স্বীকৃতি দিচ্ছেন না। উত্তরে স্মিত হাস্যের সঙ্গে জয়প্রকাশ নারায়ণ বলেন, 'আমাকে এই প্রশ্ন করে লাভ নেই। আমার ক্ষমতা থাকলে আমি অনেক আগেই বাংলাদেশ সরকারকে স্বীকৃতি দিতাম।' তাঁর ভাষণ ইংরেজ শ্রোতাদের ওপর গভীর প্রভাব বিস্তার করে।

আমি আগেই উল্লেখ করেছি স্টিয়ারিং কমিটিকে লন্ডনে সাহায্য করার জন্য গউস খানকে সভাপতি করে একটি শাখা সমিতি গঠিত হয়। জয়প্রকাশ নারায়ণের সম্মানার্থে এই কমিটি একটি চা চক্রের আয়োজন করে ৪ঠা জুন। এই সভায় লন্ডন কমিটির পক্ষ থেকে গউস খান এবং স্টিয়ারিং কমিটির পক্ষ থেকে শেখ আবদুল মান্নান তাঁকে অভ্যর্থনা জানিয়ে ভাষণ দেন। আমি তাঁর জীবন দর্শনের প্রতি আলোকপাত করি। এই সভার দু'একদিন পরে আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের বাণী পৌঁছে দেবার জন্য তিনি পূর্ব ইউরোপ ভ্রমণে যান।

৫ই জুন শেফিল্ড টাউন হলে বিরাট সভার আয়োজন হয়। অসংখ্য বাঙালী, ভারতীয় এবং ইংরেজ শ্রোতা সে সভায় উপস্থিত ছিলেন। বিরাট হলটির কোথাও তিল ধারণের ঠাঁই ছিল না। তাছাড়া আরো একটি ঘটনা উল্লেখযোগ্য। রাস্তার অপর পাশে বেশ কিছু পশ্চিম পাকিস্তানী দাঁড়িয়ে মাঝে মাঝে পাকিস্তানের প্রতি সমর্থনসূচক ধ্বনি দিচ্ছিল। শেখ আবদুল মান্নান, ডাঃ জোয়ারদারসহ কয়েকজন সহকর্মীকে সঙ্গে নিয়ে আমি সভায় যোগ দিতে লন্ডন থেকে শেফিল্ডের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেছিলাম। শেফিল্ডের উপকণ্ঠে পৌঁছার পর একটি গাড়ীর আরোহী আমাদের থামতে বলেন। গাড়ী থেকে দু'জন সাদা পোশাক পরিহিত ভদ্রলোক নেমে এসে বলেন, 'স্যার, আমরা পুলিশ অফিসার। আপনাদের মিটিং হলের সামনে কিছুসংখ্যক পাকিস্তানী অপেক্ষা করছে। তাই আমরা আপনাদের এগিয়ে নিতে এসেছি। হলের সামনে ইউনিফর্ম পরিহিত যথেষ্ট পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। পাকিস্তানীরা কোন অপ্রীতিকর অবস্থার সৃষ্টি করতে চাইলে তারা বাধা দেবে। আপনাদের অনুমতি নিয়ে আমরা আপনাদের গাড়ীর আগে আগে যেতে চাই।' আমি তাঁদের ধন্যবাদ জানিয়ে গাড়ীতে উঠলাম। হলের সামনে গিয়ে দেখি একদল পাকিস্তানী বাইরে দাঁড়িয়ে আছে এবং তাঁদের দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে আছে অন্ততঃ দু'শ পুলিশ। আমরা তাদের সামনে দিয়ে যাবার সময় তারা 'পাকিস্তান-জিন্দাবাদ' ধ্বনি দিতে থাকে।

পুলিশ বাঙালীদের বাইরে দাঁড়াতে দেয়নি। সবাইকে হলের ভিতরে ঢুকিয়ে দিয়েছিল। আমরা সেই জনাকীর্ণ হলে প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গে বাঙালীরা দাঁড়িয়ে তুমুলভাবে করতালি দিতে থাকেন এবং জয়বাংলা ধ্বনিতে হলটি মুখরিত হয়ে ওঠে। শেফিল্ড কমিটি এই সভার আয়োজন করেন এবং শেফিল্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত প্রীতিশ মজুমদার আয়োজনের

ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। সভায় শেফিল্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক হ্যাংকগারলিন বক্তৃতা করেন। তাছাড়া আফরোজ চৌধুরী, কবির চৌধুরী ও শেখ আবদুল মান্নান জ্বালাময়ী বক্তৃতা করেন। সুরাইয়া খানম রবীন্দ্রনাথের 'প্রশ্ন' কবিতাটি আবেগময়ী কণ্ঠে আবৃত্তি করেন। আমি শৃঙ্খলা রক্ষা করে সংগ্রাম এগিয়ে নিয়ে যেতে আহবান জানিয়ে বলি, "ইনশাআল্লাহ আমরা জয়ী হবো। আপনারা একতাবদ্ধ থাকবেন এবং হাতে হাত রেখে সামনের দিকে এগিয়ে যাবেন। কোন অবস্থাতেই আপনারা শান্তিভঙ্গ করবেন না। তা করলে বৃটিশ সরকার ও জনসাধারণের সহানুভূতি আমরা হারাব। পাকিস্তানীদের উদ্দেশ্য হলো শান্তিভঙ্গ করে এমন একটি অবস্থার সৃষ্টি করা যাতে এদেশে আমরা আন্দোলন পরিচালনা করতে না পারি। তাই আমাদের সকল অবস্থাতেই ধৈর্য এবং স্থৈর্য রক্ষা করে এগিয়ে যেতে হবে। আমাদের সংগ্রাম চলছে এক সম্ভাবনাময় জীবনের জন্য। আমরা কিছুতেই সেই সংগ্রামের ক্ষতি হতে দিতে পারি না। আমরা একটি পবিত্র সাধনায় লিপ্ত। বাংলাদেশকে শত্রুমুক্ত করে সেখানে সংসদীয় গণতন্ত্র স্থাপনে আমরা দৃঢ়সংকল্প। বৃটেনের মতোই নির্বাচিত প্রতিনিধিবৃন্দ জনগণের ইচ্ছানুযায়ী দেশ শাসন করবেন। মানুষের মৌলিক অধিকার স্বীকৃত হবে, সংবাদপত্র ও বিচার বিভাগের স্বাধীনতা নিশ্চিত করে মানুষের মনে নিরাপত্তাবোধ স্থায়ী করতে হবে। সেই মহৎ জীবনের লক্ষ্যে আমাদের এগিয়ে যেতে হবে দৃপ্ত পদক্ষেপে। সহজ অবহেলায় আমরা এড়িয়ে যাব সকল বাধা ও বিপত্তি।"

সভার শেষে আমরা শেফিল্ড কমিটির সঙ্গে একটি রেস্টুরেন্টে মিলিত হই। সেই রেস্টুরেন্টে যেয়ে দেখি অভ্যর্থনা কক্ষে সাদা ইউনিফর্ম পরিহিত কয়েকজন পুলিশ অফিসার বসে আছেন। তাঁরা খবর নিয়েছেন, সভাশেষে আমরা সেই রেস্টুরেন্টে বসে কমিটির সভা করব। তাই তাঁরা নিজেরাই এসেছিলেন। তাঁদের সঙ্গে ছিল একটি প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কুকুর। রেস্টুরেন্ট বৈঠকের শেষে তাঁরা আবার আমাদের গাড়ীর আগে আগে চললেন এবং শেফিল্ড শহরের বাইরে এসে বিদায় নিলেন। আমি গাড়ী থেকে নেমে তাঁদের ধন্যবাদ জানাই।

যখন গোরিং স্ট্রীটের অফিসে পৌঁছলাম বেশ রাত তখন। সেখানে উপস্থিত কর্মীদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করলাম। শেখ মান্নান এবং আমার অনুপস্থিতির সময়কার জমে থাকা কাজ শেষ করে প্রতিদিনের মতো রাত দুপুরে বাড়ী ফিরলাম।

তেইশ

পূর্ব লন্ডনে অসংখ্য বাঙালীর বাস। আমাকে বেশ ক'দিন থেকে পূর্ব লন্ডনে একটি সভা করার তাগিদ দিচ্ছিল লন্ডন কমিটি। আমি ইতিপূর্বে বলেছি যে, গউস খানকে সভাপতি করে এই কমিটি গঠন করা হয় এবং এর নাম দেওয়া হয় লন্ডন কমিটি। ৬ই জুন পূর্ব লন্ডনের একটি

বড় হলে বিরাট জনসভা হয়। এই সভায় পূর্ব লন্ডনে অবস্থানরত বাঙালীরা এবং সেই অঞ্চলের বেশ কিছু ইংরেজ উপস্থিত ছিলেন। এই সভায় পুনরায় আমি লক্ষ্য করলাম যে, স্বাধীনতা সংগ্রামে সম্পূর্ণ নিবেদিত বাঙালীদের মধ্যে তখনো লন্ডন কমিটির নেতৃত্ব নিয়ে একটা চাপা কোন্দল রয়েছে। এসব ব্যাপার লক্ষ্যই করিনি, এমনভাবে এড়িয়ে যাই। অথচ যা বলা দরকার তা বলি। একতা কেন প্রয়োজনীয় তার ওপরে অকারণেই বেশ অনেকক্ষণ বললাম। আমি মনে করিয়ে দিলাম সাড়ে সাত কোটি বাঙালী আজ জীবন-মরণ সংগ্রামে লিপ্ত। দেশের অভ্যন্তরে যেসব বাঙালী আছেন, প্রতি মুহূর্তের অনিশ্চয়তা তাঁদের জীবনযাত্রাকে দুর্বিষহ করেছে। প্রতি মুহূর্তের মৃত্যুর আশংকা যে কি ভয়াবহ সেই অবস্থায় যাঁরা থাকেন তাঁরাই শুধু সেটা উপলব্ধি করতে পারেন। একদিক থেকে সেই অবস্থা মৃত্যুর চেয়েও নিষ্ঠুর, নির্মম এবং ভয়ংকর। প্রবাসী বাঙ্গালীরা নিজ নিজ কর্মক্ষেত্রে পূর্বের স্বাভাবিক সুন্দর জীবন-যাপন করতে পারতেন, কিন্তু তা না করে দেশের অভ্যন্তরে যে অগণিত বাঙালী প্রতি মুহূর্তে মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছেন তাঁদের কথা মনে করেই প্রবাসী বাঙালীরাও দেশের স্বাধীনতার জন্য সর্বস্ব পণ করে এগিয়ে এসেছেন। তাঁরা ঐক্যবদ্ধ হয়েছেন বাংলাকে মুক্ত করার মহৎ প্রচেষ্টায়। দেশের অভ্যন্তরে নির্যাতিত, নিপীড়িত বাঙালীরা কামনা করছেন এই ঐক্যের স্থায়িত্ব। শ্রোতাদের দিকে তাকিয়ে বুঝলাম যে, আমার কথাগুলো তাঁদের হৃদয় স্পর্শ করেছে। আমার পরে যাঁরা বললেন তারা এই আশ্বাস দেন যে, তাঁরা সকল অবস্থাতেই এই ঐক্য বজায় রেখে চলবেন।

বৃটেনে যত বাঙালী ছিলেন তাঁদের সবাইকে স্বাধীনতা যুদ্ধের উন্মাদনায় পেয়ে বসেছিল। পাকিস্তানের হাইকমিশনার সালমান আলী সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হলে তিনি কি তিন-চারজন বাঙালীকেও আন্দোলনের বিরোধিতার জন্য পাবেন না ? তা না পেলে বোধ করি একটা অস্বাভাবিকতা দেখা দিত। এই অস্বাভাবিকতা থেকে দেশকে রক্ষা করার জন্যই বুঝি তিন-চারজন বাঙালী সালমান আলীর সঙ্গে হাত মেলালেন। তবে তিনি মাত্র তিন-চারজনই পেয়েছিলেন। তাদের দ্বারা 'মুক্তি' নামে একটা বাংলা সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করা হয়। সকলেই বলতেন যে, এই পত্রিকার সম্পূর্ণ খরচ পাকিস্তান হাইকমিশন বহন করে এবং পত্রিকার সঙ্গে জড়িত সকলেই রীতিমতো বেতন পায়। পাকিস্তান হাইকমিশন অর্থ বিতরণ আমার সামনে করেনি, অতএব আমি এর চেয়ে বেশী আর কি বলতে পারি। লন্ডনস্থ বাঙালীদের ক্রোধ এই পত্রিকাটির ওপর ফেটে পড়ল এবং তাঁরা কতগুলো পত্রিকা মঞ্চের সামনের খালি জায়গায় পোড়ালেন।

এই সভাতেও দু'একজন লোকের কথাবার্তায় মনে হয়েছিল যে, 'স্বাধীনতা আন্দোলন ব্যর্থ হতে বাধ্য' পাকিস্তানের এই প্রচারণা কারো কারো মনে কিছুটা দুর্বলতার সৃষ্টি করেছে। তাই জয় আমাদের সুনিশ্চিত এই কথাটা প্রয়োজনের অতিরিক্ত জোর দিয়ে বললাম।

লন্ডন উইক এন্ড টেলিভিশন বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের সমর্থন এবং অসমর্থনকারী ব্যক্তিদের সমন্বয়ে একটি সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা করে। ১১ই জুন ঐ সাক্ষাৎকার গ্রহণ ও প্রচার করা হয়। এই সাক্ষাৎকারে আমাকে সাড়ে সাত কোটি সংগ্রামী বাঙালীর প্রতিনিধিরূপে টেলিভিশন দর্শকদের পরিচয় করিয়ে দেন বিখ্যাত সাংবাদিক রবার্ট বনী। তিনিই

সাক্ষাৎকারটি পরিচালনা করেন। আমাদের কর্মপন্থার উপরে বিরোধী মত প্রকাশ করেন পার্লামেন্ট সদস্য ব্রিগস ডেভিসন। আরো দু'একজন ইংরেজ সাক্ষাৎকারে অংশ নেন। এই সাক্ষাৎকারটি সমগ্র বৃটেনের দর্শকবৃন্দ দেখতে পান। এখানে আমাকে অনেকগুলো প্রশ্ন করা হয়। সাধারণতঃ ব্রিগস ডেভিসনই করেন। আমি দৃঢ়তার সঙ্গে সবগুলো প্রশ্নের উত্তর দিতে পারায় দর্শকদের মনে খুব ভাল প্রতিক্রিয়া হয়। এই সাক্ষাৎকারের রেকর্ড করা ফিল্মটি দেশ স্বাধীন হবার পরে ঢাকা টেলিভিশন কর্তৃক প্রচার করা হয়।

এই সময় অন্যান্য দেশ থেকে বাঙালীরা আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে শুরু করেন। তাঁরা গোরিং স্ট্রীটের অফিসে গিয়ে স্বাধীনতার সংগ্রাম সম্বন্ধীয় কাগজ-পত্র, পুস্তিকা ইত্যাদি নিয়ে যান। এভাবে নানা দেশের সঙ্গে আমাদের যোগসূত্র স্থাপিত হয় এবং ঐসব দেশে অবস্থানরত বাঙালীরা টেলিফোনে আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ অব্যাহত রাখেন।

১২ই জুন শনিবার লন্ডনের উপকণ্ঠে অবস্থিত সেন্ট এ্যালবেন্স শহরে একটি জনসভা হয়। এখানেও ঐ অঞ্চলের বাঙালীগণ উপস্থিত হন। তাঁরা সেই অঞ্চলের কয়েকজন বিশিষ্ট ইংরেজকে সভায় নিয়ে আসেন। সভাটি অত্যন্ত সফল হয় এবং বিভিন্ন বক্তা স্বাধীনতার প্রয়োজনীয়তা বিশ্লেষণ করেন। আমি পূর্বের ন্যায় সকলকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে সংগ্রাম চালিয়ে নেয়ার আহবান জানাই।

সভাশেষে আমরা লন্ডনে ফিরে আসি এবং সে রাতেই আবার লীডস অভিমুখে যাত্রা করি।

পরদিন রোববার ভোর চারটায় আমরা লীডস-এ পৌঁছাই। হোটেলে বিশ্রাম নিয়ে সভাস্থলে পৌঁছি দশটার দিকে। একটি বিরাট হলে এই সভা হয়। সভায় লীডস অঞ্চলের বাঙালীরা ছাড়াও অনেক ইংরেজ উপস্থিত ছিলেন। বেশ কয়েকজন শিক্ষকও এই সভায় যোগদান করেন। ওয়ার্কার্স প্রেস বাংলাদেশের নির্যাতনের ওপরে ছবিসহ যে পুস্তিকা প্রকাশ করে, সেটিও শ্রোতাদের মধ্যে বিতরণ করা হয়। হলের দেয়ালে নির্যাতনের বিভীষিকাময় ছবিগুলো টাঙানো হয়। এসব ছবি দেখে আমি নিজেই খুব অভিভূত হয়ে পড়ি। আমার বক্তৃতায় আমি অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে পুনরায় ঘোষণা করি, 'পৃথিবীতে এমন কোন শক্তি নেই যে, আমাদের স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত করতে পারে। আমাদের বীর শহীদদের প্রতি সত্যিকার শ্রদ্ধা নিবেদন হবে দেশকে শত্রুমুক্ত করে স্বাধীনতার পতাকা উচ্চে তুলে ধরায়। তাই স্বাধীনতা অর্জনে আমাদের সংগ্রাম চলবে দুর্বার গতিতে।'

সেদিন সভার পর দুপুরে লীডসের বাঙালী নেতৃবৃন্দ আবুল মনসুর মাসিহর বাড়ীতে আমার সঙ্গে মিলিত হন। সেখানে মধ্যাহ্ন ভোজনের সময় আমরা নানা বিষয় নিয়ে আলোচনা করি। শেখ মকসুদ আলী (সিএসপি অফিসার) আমাদের জানান যে, তিনি যে কোন মুহূর্তে পদত্যাগ করতে প্রস্তুত আছেন। আমি তাঁকে যথাসময়ে জানাব বলি। ঐ সভায় যোগদানের জন্য লন্ডন থেকে আমার সঙ্গে শেখ আবদুল মান্নান, অধ্যাপক কবির, জাকারিয়া চৌধুরীসহ অনেকে এসেছিলেন, ডাক্তারদের মধ্যে এসেছিলেন আবদুল হাকিম, জাফরুল্লাহ চৌধুরী। সভায় শেখ মান্নান এবং অধ্যাপক কবির ও আরো কয়েকজন মর্মস্পর্শী ভাষণ দেন। লীডসের বাংলাদেশ এসোসিয়েশন আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামে অত্যন্ত প্রশংসনীয় অবদান রেখেছে। এই সমিতির প্রেসিডেন্ট মিয়া মোহাম্মদ মুস্তাফিজুর রহমান (বর্তমানে ডঃ রহমান) তখন লীডসে

ডক্টরেটের জন্য গবেষণা করছিলেন। তিনি এবং তাঁর সহকর্মীগণ আন্দোলনের প্রথম থেকেই খুব পরিশ্রম করেছেন। এখানেই আমার সঙ্গে মির্জা মোজাম্মেল হকের পরিচয় হয়। শুনেছি তিনি এখন জাহাঙ্গীর নগর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক। তিনি সে সময় লীডস বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করছিলেন। আন্দোলন শুরু হওয়ার অব্যবহিত পরে লীডস লিবারেশন ফ্রন্ট গঠিত হলে তিনি তার সভাপতি নির্বাচিত হন। তাঁকে আমি একজন নীরব কর্মীরূপে দেখি এবং তাঁর শান্ত স্বভাব আমাকে আকৃষ্ট করে। আমাদের গোরিং স্ট্রীটের অফিসে এমন একজন কর্মীর প্রয়োজনীয়তার কথা জানালে তাঁর সমিতি তাঁকে গোরিং স্ট্রীটে আমাদের সঙ্গে কাজ করতে পাঠায়। তাঁর একাগ্রতা সকলেরই প্রশংসা অর্জন করে। তিনি এবং আরো কয়েকজন কর্মী রাতে গোরিং স্ট্রীটের অফিসে টেবিল সরিয়ে প্রায়ই কার্পেটের ওপর শুয়ে থাকতেন। শুধু তাই নয় তিনি গবেষণারত ছিলেন। আমার অনুরোধে গবেষণা ত্যাগ করে গোরিং স্ট্রীটের অফিসে চলে আসেন। সেই যে গবেষণায় বাধা পড়ল আর পুনরায় অধ্যয়ন শুরু করাও হয়নি। কিন্তু দেশসেবার নির্মল তৃপ্তি নিজের অন্তরেই অনুভব করেছেন। কোন পুরস্কারের প্রত্যাশা করেননি। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর আমার সঙ্গে তাঁর আর দেখা হয়নি। আজ স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে গভীর মমত্ববোধের সঙ্গে তাঁর অবদানের কথা স্মরণ করছি।

লীডস-এ বাঙালী কর্মীগণ 'জয়বাংলা' নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা বের করে দেশের খবর উন্মুখ বাঙালীদের কাছে পৌঁছে দিতেন। এই পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন আরেকজন অধ্যয়নরত ছাত্র মোহাম্মদ নুরুল দোহা। বর্তমানে তিনি অধ্যাপনা করছেন।

লীডস-এ আরেকটি চমকপ্রদ বিষয়ের উল্লেখ না করে পারছি না। সেখানে "পাকিস্তান সোসাইটি" নামে একটি সমিতি ছিল। ১৯৭০-৭১ সনে এই সমিতির কর্মকর্তা নির্বাচিত হয়েছিলেন দু'জন বাঙালী। সভাপতি হন খায়রুল বাসার (পরে ডঃ বাসার), আর সম্পাদক নির্বাচিত হন মিয়া মোহাম্মদ মোস্তাফিজুর রহমান (ডঃ)। সোসাইটিটি অবিভক্ত পাকিস্তানের হলেও কর্মকর্তা বাঙালী নির্বাচিত হওয়ার ফলে এই সমিতির সমর্থনও আমাদের আন্দোলন লাভ করে। সমিতির ফান্ডের টাকা সভা-সমিতি আয়োজন করায় এবং প্রচার-পত্রিকা প্রকাশের ব্যাপারে ব্যয় করা হয়। পাকিস্তানী ছাত্ররা প্রতিবাদ করেও সুবিধা করতে পারেনি। এবং এই সোসাইটির জন্য বরাদ্দ করা বৃটিশ সরকারী সাহায্য বন্ধ করতে তারা ব্যর্থ হয়। দেশ স্বাধীন হবার পর পাকিস্তানীদের হাতে এরা সমিতির কর্মভার বুঝিয়ে দেন।

লীডস-এ ফজলুল করিমও আমাদের আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। তিনি লীডস বিশ্ববিদ্যালয়ের চিকিৎসা শাস্ত্র বিভাগে অধ্যাপনা করতেন। লীডস-এ মাত্র উনত্রিশ জন বাঙালী ছাত্র ছিলেন। তাঁদের একতা আমাকে মুগ্ধ করেছে। তাঁরা নীরবে দেশ সেবা করে গেছেন। কখনো কোন সমস্যার সৃষ্টি করেননি।

অন্যান্য শহরের মতো লীডসের বাঙালী মহিলারাও আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন। সকলের কর্ম সমন্বয়ের জন্য বেগম করম আলী আহমদ ও বেগম আবুল মনসুর মাসিহকে খুবই পরিশ্রম করতে হয়েছে। লীডস-এর এই সভায় লীডস বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ফ্রাংক গারলিং বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রতি পূর্ণ সমর্থন জানান। পাকিস্তানীদের নির্মমতার তীব্র নিন্দা করেন তিনি। যুক্তির দ্বারা প্রমাণ করেন যে,

বাংলাদেশের স্বাধীনতার দাবী ন্যায়নীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত। তিনি লন্ডনেও আমাদের বেশ কয়টি সভায় যোগদান করেছেন এবং বেশ জোরালো ভাষায় সমর্থন জানিয়েছেন। তাঁকে দেখলেই সর্বজনশ্রদ্ধেয় গোবিন্দ চন্দ্র দেবের কথা মনে পড়ত। তাঁরই মত আত্মভোলা উদার হৃদয় মানুষ এই ইংরেজ অধ্যাপকটি। লীডসের বিশ্ববিদ্যালয়ে সে সময় করম আলী আহমেদ, ওমর ফারুক, আবদুল আজিজ এবং আবুল মনসুর মাসিহ ডক্টরেটের জন্য গবেষণা করছিলেন। তাঁরা সারাক্ষণ স্বাধীনতা আন্দোলনে নিজেদেরকে নিয়োজিত রাখতেন। স্বাধীনতা অর্জনের পর তাঁরা বিশ্ববিদ্যালয়ে ফিরে যেয়ে ডক্টরেট লাভ করেন।

চব্বিশ

মে মাসে একটি পাকিস্তানী ক্রিকেট টিম টেস্টম্যাচ খেলতে লন্ডনে এলে বাঙালীদের প্রতিবাদে মুখর হয়ে ওঠার কথা আমি আগেই উল্লেখ করেছি। যেসব স্থানে খেলা হওয়ার কথা ঘোষণা করা হয়, সেসব শহরের শাখা সমিতিগুলো একটি বয়কট আন্দোলনের কর্মসূচী গ্রহণ করে। এসময় বৃটিশ বন্ধুদের কাছ থেকে আমি তাঁদের মনোভাবের কথা জানতে পারি। বৃটেন আমাদের ওপর পাকিস্তানীদের অত্যাচারে গভীরভাবে আহত এবং সহানুভূতিশীল হলেও বয়কট আন্দোলন এই ক্রীড়ামোদী জাতি পছন্দ করবে না। আমি ম্যানচেস্টার বার্মিংহাম ইত্যাদি শাখা সমিতির নেতৃবৃন্দকে লন্ডনে আসতে অনুরোধ করি। তাঁরা আসার পর বললাম, "ইংরেজরা সাধারণত ঃ খেলাধূলায় খুবই উৎসাহী। তারা রাজনীতির সঙ্গে খেলাকে মেশাতে চায়না। আমাদের এমন কিছুই করা উচিত নয় যাতে করে আমরা তাদের সহানুভূতি হারাই। অবশ্য আমি শুধুমাত্র কর্মপদ্ধতির কথা বলেছি। আদর্শের ব্যাপারে কারো সন্তুষ্টি বা অসন্তুষ্টিতে কিছু আসে যায় না। আমরা যে জনপ্রিয়তা অর্জন করেছি তাকে অবশ্যই রক্ষা করতে হবে। তাই আমার মনে হয়, ক্রিকেট টিম বয়কট করার চাইতে ক্রিকেট ফিল্ডের জনসমাবেশের সুযোগ নিয়ে আমরা প্রত্যেক দর্শকের হাতে প্রবেশপথে আমাদের বক্তব্য সমবলিত একটি প্রচার পত্রিকা তুলে দেব। এভাবে ক্রীড়ামোদী ইংরেজরাও পাকিস্তানীদের নৃশংসতার কথা জানতে পারবেন।"

বয়কট আন্দোলনের প্রতি সবার জোর সমর্থন দেখা গেল। এ বিষয়ে যথেষ্ট আলোচনার পরে সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত নেয়া হয় যে, ক্রিকেট টিমকে বয়কট না করে শান্তিপূর্ণভাবে প্রচার পুস্তিকা মারফত আমাদের কথা বৃটিশ জনসাধারণের কাছে পৌঁছে দিতে হবে।

এখন আমার চিন্তা হলো যে, গেটে দাঁড়িয়ে এই প্রচার পুস্তিকা বিতরণ করার সময়

পাকিস্তানীরা বাধা দিতে পারে এবং তার ফলে শান্তিভঙ্গের কারণে পুলিশ প্রচার পত্রিকা বিতরণ বন্ধ করার কথা বলতে পারে। সে কারণে আমি ব্যক্তিগতভাবে পুলিশ কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলি এবং জানাই যে, আমাদের শান্তিপূর্ণভাবে প্রচার পুস্তিকা বিতরণ করতে না দিলে আমরা খবরের কাগজের মাধ্যমে এবং বিভিন্ন স্থানে সভা করে বৃটিশ জনসাধারণকে টেস্টম্যাচ বয়কট করতে আবেদন জানাব। যাহোক, আলোচনার পর পুলিশ কর্তৃপক্ষ শান্তিপূর্ণভাবে প্রবেশ পথে দাঁড়িয়ে সকলের হাতে আমাদের কাগজ তুলে দিতে কোন বাধা না দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেন। এভাবে বৃটিশ পুলিশের সঙ্গে সম্ভাব্য সংঘর্ষ এড়ানো সম্ভব হলো এবং আমাদের বক্তব্যও ক্রীড়ামোদী জনসাধারণের কাছে পৌঁছে গেল।

সংশ্লিষ্ট শাখা সমিতি প্রচার পুস্তিকা বিতরণের ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। আন্দোলনের অন্যান্য ক্ষেত্রে যেমন, এখানেও তেমনি ছাত্রবৃন্দ তাঁদের একাগ্রতা এবং কর্মক্ষমতার দ্বারা আমাকে অভিভূত করেছেন। তাঁরা বিতরণের জন্য প্রচার পত্রিকার লেখা তৈরী, মুদ্রণ এবং অন্যান্য কাজ অত্যন্ত কৃতিত্বের সঙ্গে সম্পন্ন করেছেন। তাঁদের সহযোগিতার ফলেই শাখা সমিতিগুলো এ ব্যাপারেও প্রশংসনীয় সাফল্য অর্জন করেন।

পঁচিশ

লন্ডনস্থ স্টুডেন্টস এ্যাকশন কমিটি আন্দোলনের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত নয় মাস আন্তরিকতা ও নিষ্ঠার সঙ্গে একইভাবে সংগ্রাম চালিয়ে গেছেন।

আন্দোলনের একেবারে শুরুর দিকেই ডাউনিং স্ট্রীটের নিকটে ছাত্রনেতা মানিক চৌধুরী ও আফরোজ আফগান অনশন ধর্মঘট করেন। পরে সকলের অনুরোধে তাঁরা অনশন প্রত্যাহার করেন। কিন্তু তাঁরা যে ক'দিন অনশন করেছিলেন, সে ক'দিন সাংবাদিক ও বিশিষ্ট ব্যক্তিসহ অনেকেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হন। এর ফলে বাংলাদেশে পাকিস্তানীদের নির্মমতার কথা আরো ব্যাপকভাবে বিশ্ববাসীর কাছে প্রকাশে সহায়তা করে। তাছাড়া ছাব্বিশে মার্চের অব্যবহিত পরেই পাকিস্তান দূতাবাসের সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শনের সময় ছাত্রনেতা মোহাম্মদ ইসহাক ও একরামুল হক পুলিশের হাতে গ্রেফতার হন।

এবারে সংক্ষেপে লন্ডনস্থ বাঙালী ছাত্র সমিতির কথা কিছুটা বলতে চাই। লন্ডনে তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানের ছাত্রদের একটি সংগঠন প্রায় পনের বছর আগে প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রথম দিকে এর উদ্দেশ্য ছিল একে কেন্দ্র করে বিদেশে অধ্যয়নরত ছাত্রদের মধ্যে সামাজিক হৃদ্যতা ও সহযোগিতার ভাব গড়ে তোলা এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা। কিন্তু দেশে স্বাধিকার ও গণতান্ত্রিক আন্দোলন শুরু হবার পর এই প্রতিষ্ঠান তার সমর্থনে কাজ

করতে থাকে। এই প্রতিষ্ঠানই গড়ে তোলে 'ইস্ট পাকিস্তান হাউস।' বিভিন্ন অঞ্চলের ছাত্ররা এই সংগঠনে যোগ দেন। বিভিন্ন সময়ে এর নেতৃত্বে ছিলেন আমিরুল ইসলাম, সুলতান শরীফ, এ,টি,এম ওয়ালি আশরাফ, বাদল রশিদ, আলমগীর কবির, মওদুদ আহমেদ, মিনহাজ উদ্দিন আহমেদ, শেখ আবদুল মান্নান, আমির আলী, জ্যাকেরিয়া চৌধুরী, জগলুল হোসেন, তোজাম্মেল হক, সুরাইয়া খানম, মানিক চৌধুরী, আমিনুল হক, খন্দকার মোশারফ হোসেন, মোহাম্মদ এসহাক, একরামুল হকসহ আরো অনেকে। অধ্যয়নকালে তাঁদের চেষ্টার ফলে প্রতিষ্ঠানটি বেশ প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে। উনিশ শ' উনসত্তর সালে দেশে গণ অভ্যুত্থান শুরু হলে এই প্রতিষ্ঠানটি সেই আন্দোলনকে পুরোপুরি সমর্থন করে বৃটেনে জনমত সৃষ্টি করতে থাকে। তারপর শেখ মুজিব আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা থেকে মুক্ত হয়ে লন্ডনে এলে সবাই গণতন্ত্রের সমর্থনে আরো প্রাণচঞ্চল হয়ে ওঠেন।

উনিশ শ' সত্তরের জলোচ্ছ্বাসের সময় প্রবাসী বাঙালীগণ একটি রিলিফ কমিটি গঠন করে দুর্গত দেশবাসীর সাহায্যে এগিয়ে আসেন। ত্রাণের জন্য অর্থ সংগ্রহের ভেতর দিয়ে বাঙালীদের চেতনাবোধ জাগ্রত হয়, যেমন হয়েছিল আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় শেখ মুজিব ডিফেন্স ফান্ডে অর্থ সংগ্রহের মাধ্যমে। এভাবে বাঙালীগণ জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে গণতান্ত্রিক আন্দোলন গড়ে তোলেন। সত্তরের নির্বাচনে শেখ মুজিব পাকিস্তানের পার্লামেন্টে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করলে বাঙালীদের মধ্যে অভূতপূর্ব প্রাণচাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। সাতই মার্চ বঙ্গবন্ধুর বক্তৃতার পরে এই প্রতিষ্ঠান গুরুতর সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হতে থাকে। আমি মার্চ মাসের মাঝামাঝি একদিনের জন্য জেনেভা থেকে লন্ডনে গেলে সুলতান শরীফ আমার সঙ্গে দেখা করেন এবং ফিরে আসার সময় আমার সঙ্গে বিমান বন্দরে আসেন। লন্ডন শহর থেকে হিথরো বিমান বন্দর ঘন্টা দেড়েকের পথ। পুরো সময়টাই আমরা দু'জন দেশের পরিস্থিতি নিয়ে আলাপ করি। এভাবে লন্ডনে সুলতান শরীফের সঙ্গেই আমার প্রথম আলাপ হয় দেশের পরিস্থিতি নিয়ে। তিনি আমাকে লন্ডনে বাঙালীদের সামগ্রিক পরিস্থিতির কথা বর্ণনা করেন। আমার মানসিক প্রস্তুতির কথাও তিনি সেদিনই জানতে পারেন।

ছাব্বিশ

একদিকে পাক বাহিনীর গোলাবর্ষণ, অন্যদিকে অগণিত শরণার্থীর কলেরায় মৃত্যুবরণ এই সময় এক নারকীয় অবস্থার সৃষ্টি করে। লন্ডনের প্রভাবশালী টাইমস, গার্ডিয়ান, অবজার্ভার ইত্যাদি পত্রিকা এ অবস্থায় পাকিস্তানকে সাহায্য দান অসমীচীন বলে মন্তব্য করে। আমরাও এখন পাকিস্তানকে কোনরূপ সাহায্য প্রদান হত্যাকারীর হস্তকে সুদৃঢ় করার নামান্তর বলে ঘোষণা

করি। এ অবস্থায় সাহায্য দেওয়াটাকে বেশ কিছু পত্রিকা ভ্রান্ত সিদ্ধান্ত বলেও উল্লেখ করে।

ঠিক এরকম সময়ই লন্ডনে রটে গেল যে, বৃটিশ সরকার পাকিস্তান সরকারকে কয়েকটি মোটর বোট দিচ্ছে। পাকিস্তান বুঝিয়েছে যে ছোট ছোট খাল দিয়ে খাদ্যশস্য দুর্ভিক্ষ কবলিত অঞ্চলে প্রেরণ করা হবে। এই খবর পেয়ে বাঙালীরা প্রতিবাদ মুখর হয়ে ওঠেন। আমি নিজে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে যেয়ে বলি যে, এই মোটর বোটে করে নিতান্ত পাড়াগাঁয়েও পাকিস্তানীরা জনগণের ওপর অত্যাচার চালাবে। আমাদের জোর প্রতিবাদের ফলে বোট পাঠানো বন্ধ হয়। এ সময় সায়মন উনচেস্টার এবং আরো অনেক প্রতিষ্ঠিত সাংবাদিক ভারতের ভিতর দিয়ে বাংলাদেশের বিভিন্ন সীমান্ত শহরে উপস্থিত হন এবং তাঁদের শক্তিশালী লেখনীর দ্বারা বিশ্ব চিত্তে আঘাত করেন। তাঁরা লন্ডনে ফিরে এলে কারো কারো সাথে আমার সাক্ষাৎ হয়েছে। তাঁদের মানবিকতা আমার হৃদয় স্পর্শ করেছে। সাংবাদিকতাকে আমি চিরদিন মহৎ পেশা বলে জেনে এসেছি। এর সার্থক রূপায়ণ আমি দেখেছি আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধে। এই সময়ের প্রতিবেদনগুলোতে মানব কল্যাণে সাংবাদিকদের ভূমিকার যেমন সার্থক প্রতিফলন দেখতে পাওয়া যাবে, আর তেমনি ভাবী যুগের সাংবাদিকদের জন্য পাওয়া যাবে অন্তহীন গৌরব ও অনুপ্রেরণা।

রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ভারতের প্রধানমন্ত্রী বার বার বলেছেন, অবিলম্বে এই অবস্থার প্রতিরোধ না করলে বিশ্ববাসীকে দায়ী হতে হবে। ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী শরণ সিং বিশ্ব নেতৃবৃন্দের সঙ্গে দেখা করে এই অবস্থার অবসান কামনা করেন।

মুজিবনগর থেকে মওলানা ভাসানীর দস্তখত করা কয়েকটি চিঠি আমার কাছে পাঠানো হয়। সে সব চিঠি ছিল প্রেসিডেন্ট নিক্সন, চেয়ারম্যান মাও-সে-তুঙ এবং চৌ-এন-লাই এর কাছে লেখা। আমরা সেগুলো সংশ্লিষ্ট দূতাবাসে পৌঁছে দেই।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের কথা তখন বিশ্ববাসীর মুখে মুখে। এদিক থেকে আমার মতে সারা বিশ্বে জুন মাসে এক অভূতপূর্ব আলোড়নের সৃষ্টি হয়। তাছাড়াও আমাদের মুক্তিবাহিনীর অসীম সাহসিকতার কথা সারা বিশ্বে আমাদের জন্য এক সম্মানের আসন সৃষ্টি করে।

রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সাহায্য পাবার লক্ষ্যে বিশ্ববাসীর দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য চৌদ্দই জুন আমরা এক শোভাযাত্রা বের করি। এই শোভাযাত্রাটি হোয়াইট হলের সামনে এসে শেষ হয়। শোভাযাত্রার ছবি বিভিন্ন খবরের কাগজে প্রকাশিত হয়। শোভাযাত্রার শেষে বিভিন্ন শহর থেকে আগত কর্মীবৃন্দ আমার কাছে এসে স্বাধীনতার জন্য সব রকমের ত্যাগ স্বীকারের অঙ্গীকার করে বলেন যে, প্রাণ দিয়েও স্বাধীনতা অর্জনের সংগ্রাম চালাতে হবে। এরপর সবাই তাঁদের ভাড়া করে আসা কোচে বৃটেনের বিভিন্ন স্থানে চলে গেলেন।

এ সময় পার্লামেন্টে লেবার পার্টির অধিকাংশ সদস্য একটি প্রস্তাব উত্থাপন করেন। এই প্রস্তাবে দস্তখত দেন ছয়জন প্রিভি-কাউন্সিলের সদস্য, বেশ কয়েকজন সাবেক মন্ত্রী, লেবার পার্টির জাতীয় কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য এবং পার্লামেন্টের অধিকসংখ্যক লেবার পার্টির সদস্য। তাঁরা এই প্রস্তাবে বলেন যে, বাংলাদেশকে অনতিবিলম্বে স্বীকৃতি দেয়া হোক।

ইয়াহিয়া খানের সেনাবাহিনী রাজনৈতিক কারণে বাংলাদেশের মানুষকে গুলী করে হত্যা করছিল। তার ফলে লাখ লাখ মানুষ দেশত্যাগ করতে বাধ্য হন। এই বিরাট জনসমুদ্র আশ্রয়হীন, গৃহহীন অবস্থায় দিন কাটাতে থাকেন। রাজনৈতিক হত্যার ফলে সৃষ্ট অবস্থা থেকে তাঁরা ভয়াবহ কলেরায় মৃত্যুবরণ করতে থাকেন। এর ব্যাপকতা এত বেশী হয় যে, ঠিক এই সময়টা সারা বিশ্ব যেন কেঁপে ওঠে। ইংল্যান্ড ও যুক্তরাষ্ট্রের কাগজগুলো লন্ডনে সহজেই পাওয়া যেত। তাতে বাংলাদেশের দুর্দশাগ্রস্ত মানুষের ব্যথা এমনভাবে প্রকাশ করা হয় যাতে করে বিশ্ববিবেককে গভীরভাবে নাড়া দেয়। আত্মকেন্দ্রিকতার ব্যূহ ভেদ করে সাধারণ মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে সহমর্মিতা জানাতে থাকেন। এমনকি খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বৃটিশ সরকার মাত্র এক লাখ পাউন্ড সাহায্য করায় বিবিসি এক সাক্ষাৎকারে বৈদেশিক সাহায্যমন্ত্রী রিচার্ড উডকে জিজ্ঞেস করে যে, প্রয়োজনের তুলনায় এত অল্প সাহায্য করায় বৃটেন অপমানিত বোধ করছে কিনা। রিচার্ড উড এর উত্তরে বলেন যে, তিনি অপমানের কারণ দেখছেন না। কেননা, এটি খবর পেয়েই ঘোষণা করা হয়েছে এবং এই সাহায্য শিগগিরই দু'লাখ পাউন্ডে এসে দাঁড়াবে। তিনি বলেন, "সরকার চিন্তিত। ব্যক্তিগতভাবে আমিও চিন্তিত এবং উদগ্রীব যে, আমাদের কর্মসূচী যেন সফল হয়। কিন্তু বর্তমানে পূর্ব পাকিস্তানের ভিতরে এবং বাইরে এমন অস্থিরতা যে, ত্রাণকার্য চালানো অসম্ভব হয়ে পড়েছে। রাজনৈতিক আপোষ ব্যতীত পূর্ব পাকিস্তানে শান্তি বা স্থিতিশীলতা আসবে না এবং মানুষের দুর্দশা লাঘবে আমাদের বাধার সম্মুখীন হতে হবে।"

বিবিসি'র প্রচারিত এই সাক্ষাৎকার সাতই জুন লন্ডন টাইমসসহ বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। সাক্ষাৎকারে রিচার্ড উড একটি গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক খবর দেন। তিনি বলেন যে, বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী এডওয়ার্ড হীথ প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানকে রাজনৈতিক মীমাংসার ভিতর দিয়ে শান্তি স্থাপনের জন্য ব্যক্তিগত চিঠি লিখেছেন।

খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বৃটেন থেকে একটি মেডিকেল টিম কলকাতায় পাঠানো হয় এবং ২০ বেডের একটি ফিল্ড হাসপাতাল স্থাপন করা হয়। তাছাড়া ডোনাল্ড চেচওয়ার্থের ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় 'ওয়ার অন ওয়ান্ট' প্রচুর সাহায্য পাঠায়। এটি একটি বিখ্যাত সাহায্য সংস্থা। লন্ডনের ডেইলি মেইল পত্রিকা মৃত শিশুদের ছবি দিয়ে পৃষ্ঠাব্যাপী শিরোনামযুক্ত রিপোর্টে বলে, 'সমবেদনা বিলম্বিত–তারা মৃত।'

আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন সাংবাদিক পিটার হ্যাজেল হার্স্ট, ইয়ান ওয়ার্ড, জন পিলজার, ইয়ান ব্রডি, প্যাট্রিক ফিটলি প্রমুখ বলেন নির্যাতনের পরে পাকিস্তান সরকারের পূর্ব পাকিস্তান শাসন করার আর কোন ক্ষমতা নেই। ষোলই জুনের টাইমস-এ এই খবর প্রকাশিত হয়। টাইমস-এর রাজনৈতিক ভাষ্যকার জন গ্রোসার তাঁর প্রতিবেদনে বলেন যে, ডাক ও তার বিভাগের মন্ত্রী জন স্টোনহাউস সদস্যদের দস্তখত সংগ্রহের ব্যাপারে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন এবং বলেন যে, দুঃখ এবং বেদনা প্রকাশের জন্য শক্ত ভাষা প্রয়োগের প্রয়োজন আছে। প্রস্তাবটিতে জাতিসংঘকেও এই অবস্থায় তার কর্তব্যের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়।

সাতাশ

আমাকে অনেক দিন থেকে কার্ডিফে যাওয়ার জন্য স্থানীয় কমিটি বার বার তাগাদা দিচ্ছিল। কিন্তু লন্ডনে সভা-শোভাযাত্রা ইত্যাদির আয়োজন, পার্লামেন্টের সদস্যদের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ, সাংবাদিকদের সঙ্গে যোগাযোগ এবং প্রায় দু'শ স্থায়ী কমিটির কর্মসূচীর সমন্বয় ইত্যাদি নিয়ে ব্যস্ত থাকায় যাওয়া হয়নি। কার্ডিফ সমুদ্র তীরবর্তী একটি গুরুত্ব পূর্ণ শহর এবং ওয়েলস-এর রাজধানী। বিশে জুন ট্রেনে আমরা লন্ডন থেকে যাত্রা করি। ঘন্টা তিনেকের পথ। আমরা ট্রেনে বসে পরবর্তী কয়েক দিনের কর্মসূচী নিয়ে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি। কার্ডিফ স্টেশনে স্থানীয় কমিটির নেতৃবৃন্দ আমাদের আন্তরিক ও বন্ধুত্বপূর্ণ অভ্যর্থনা জানান। স্টেশনে নেমে দেখলাম কয়েকজন ইউনিফর্ম পরিহিত পুলিশ কর্মচারী দাঁড়িয়ে আছেন। একজন একটি প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত কুকুরের বেল্ট ধরে আছেন। বুঝলাম শেফিল্ডের মতো এঁরা শান্তিরক্ষার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন। আমরা মোটরে উঠার পর দেখলাম তাঁরাও পুলিশকারে উঠে আমাদের অনুসরণ করলেন। সভা ছিল জনাকীর্ণ। সভাটি সবদিক থেকেই ফলপ্রসূ হয়। শেখ আবদুল মান্নান ও সুলতান শরীফ বক্তৃতা করেন। আমি সভায় মুক্তিযুদ্ধের বিগত কয়েক সপ্তাহের অগ্রগতি তুলে ধরি এবং বলি, এবারকার স্বাধীনতা হবে গণমানুষের স্বাধীনতা। আর দেশ পরিচালিত হবে জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধির দ্বারা। এই সভার পরে কর্মীদের মধ্যে বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনা লক্ষ্য করা যায়। পাকিস্তানীদের একটা মিথ্যা প্রচারণা তখন বেশ দানা বেধে ওঠে যে, পাকিস্তানের সঙ্গে বাংলাদেশের আপোষের সম্ভাবনা আছে। এ কারণে শুধু কার্ডিফে নয়, নয়টি মাসের প্রতিটি সভায় আমি বলেছি 'উই হ্যাভ রিচড এ পয়েন্ট অব নো রিটার্ণ।'

আটাশ

একুশে জুন আমি নেদারল্যান্ড গেলাম। তার দু'দিন আগে নেদারল্যান্ড থেকে একটি টেলিভিশন টিম এসে আমার সাক্ষাৎকার নিয়ে যায় এবং সেটি বিশে জুন সন্ধ্যায় প্রচার করে। নেদারল্যান্ড টেলিভিশন টিমটি সাক্ষাৎকার গ্রহণের জন্য নেদারল্যান্ড থেকে আমার বাসায়

চলে আসে। ২৬, দি গ্রীনের সেই ছোট বাসায় সাক্ষাৎকার নিতে আসার পর সমস্যা দেখা দেয় জায়গা নিয়ে। আমার বসার ঘরটি এত ছোট যে টিমের যন্ত্রপাতি রাখার জায়গাও হচ্ছিল না। শেষ পর্যন্ত বাসার সামনে রাস্তায় দাঁড়িয়ে আমাকে সাক্ষাৎকার দিতে হলো জায়গার অভাবে। স্বাধীনতার স্পৃহা নিয়ে সেদিন স্বচ্ছন্দে ছোট সে বাসায় আনন্দ সহকারে বাস করেছি। আজকে বোধ করি বাংলাদেশ দূতাবাসের নিমনতম বেতনের কর্মচারীও অত ছোট বাসায় থাকেন না।

একুশে জুন অপরাহ্নে আমি এ্যামস্টারডামে পৌঁছাই। আমাকে প্লেন থেকে ভিআইপি কক্ষে নিয়ে যাওয়া হলো। সেখানে রিপোর্টার ও ফটোগ্রাফারগণ অপেক্ষা করছিলেন। রেডিও এবং টেলিভিশন আমার সাক্ষাৎকার গ্রহণ করে। তাঁদের বলি নিয়মতান্ত্রিকতায় বিশ্বাসী আমরা পাকিস্তান সরকারের কাছে সকল মানুষের সমান অধিকার চেয়েছিলাম, কিন্তু প্রতিদানে বুকে বুলেটবিদ্ধ হওয়ার মনোপলি লাভ করি। ভিআইপি কক্ষে সাক্ষাৎকারের পর হোটেলে এলাম। হোটেলটি আমার তখনকার অবস্থার তুলনায় যথেষ্টই ভাল।

এ্যামস্টারডামে দশ-বারজন বাঙালী ছিলেন। তাঁদের মধ্যে ঝগড়া-বিবাদ দেখলাম না। দেখলাম একাত্মতা। লক্ষ্য করলাম পরস্পরের মধ্যে আন্তরিক ভালবাসা ও সহযোগিতা। সে কারণেই আমার মতো দেশহীন, ঠিকানাহীন, আশ্রয়হীন মানুষের জন্য তাঁরা নেদারল্যান্ড সরকারের কাছ থেকে একটি সার্বভৌম ও স্বাধীন দেশের প্রতিনিধির মর্যাদা আদায় করতে পেরেছিলেন। এ্যামস্টারডাম এবং তাঁর নিকটবর্তী অঞ্চলের সকল বাঙালীই বিমান বন্দরে উপস্থিত ছিলেন। সাক্ষাৎকার শেষ হবার পর কয়েকটি গাড়ীতে করে আমরা হোটেলে পৌঁছলাম। হোটেলটির নাম এতদিন পরে আর মনে নেই। হোটেলে পৌঁছে সকল বাঙালীর সাথে পরিচয় হলো। সেখানে তখন জহির উদ্দিন শিক্ষকতা ও গবেষণা করছেন। মাহবুবুর রহমান ও মিঃ আমির আলী ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ছেন। একজন বাঙালী পুলিশ অফিসারও সেখানে ছিলেন। সবার নাম মনে করতে পারছি না বলে দুঃখিত।

আমার পশ্চিম জার্মানী যাওয়ার তারিখ এবং অন্যান্য কর্মসূচী নির্ধারণের জন্য নিখিল ভট্টাচার্য এসেছিলেন পশ্চিম জার্মানী থেকে। তাঁকে পরিচয় করিয়ে দিতে হতো না। যে কোন জায়গায় তিনি দৃষ্টি আকর্ষণ করতেন। তাঁর সমবন্ধে পরে বলব। ওখানে আরো একজন ব্যক্তিত্বসম্পন্ন ভদ্রলোকের সঙ্গে পরিচয় হয়। তার নাম সুনীল কুমার লাহিড়ী। একাগ্রতা এবং অধ্যবসায় থাকলে অল্পসংখ্যক লোক যে কত পরিপাটি করে কাজ সম্পাদন করতে পারেন তা আমি এ্যামষ্টারডামে দেখে এসেছি। হোটেলে পৌঁছাবার অল্পক্ষণ পরে পার্লামেন্টের সদস্য রিলাস টারবিকসহ দু'জন আমার সঙ্গে দেখা করতে আসেন। তাঁদের ও অন্য বাঙালীদের সঙ্গে আমাদের কর্মসূচী নিয়ে আলোচনার পরে তাঁদেরকে নিয়ে সকলে একটি রেষ্টুরেন্টে নৈশভোজ করি। ভোজের সময় আরো আলোচনা হয়। তারপর এম, পি দু'জন চলে যান এবং সব বাঙালী আমার হোটেলে দুপুর রাত পর্যন্ত নানা বিষয়ে আলাপ আলোচনা করেন। আলোচনায় নেদারল্যান্ড ও পশ্চিম জার্মানীতে আমাদের কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়। ভট্টাচার্য বলেন যে, এখনই আমার পশ্চিম জার্মানী যাওয়া ঠিক হবে না। সরকারী অনুমতি লাভের পরে যাওয়া

ভাল। ভট্টাচার্য মনে করেন যে, আমার পশ্চিম জার্মানী যাওয়ার অনুমতি পেতে কোন অসুবিধা হবে না। আমার যাওয়ার ব্যাপারে জার্মান পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে কথা বলবেন বলে জানালেন।

পরদিন আমরা পার্লামেন্টে যাই। সেখানে বেশ কয়েকজন সদস্যের সঙ্গে আলাপ হয়। পার্লামেন্টের সদস্যদের চেষ্টায় আমি স্পীকারের সঙ্গে সৌজন্যমূলক সাক্ষাৎকারে মিলিত হই। তিনি অত্যন্ত সহানুভূতির সঙ্গে আমার সমস্ত কথা শোনেন। দুপুরে আমাকে কয়েকজন পার্লামেন্ট সদস্য পার্লামেন্ট ভবনে তাঁদের সঙ্গে মধ্যাহ্ন ভোজের নিমন্ত্রণ জানান। মধ্যাহ্ন ভোজনের পর আমি পার্লামেন্টের ফরেন এফেয়ার্স সাব কমিটির সঙ্গে দেখা করে পার্লামেন্ট হাউসের কমিটি কক্ষে তাঁদের সঙ্গে মিলিত হই। কমিটির সদস্যগণ আমাকে দুই ঘন্টারও বেশী সময় ধরে একের পর এক প্রশ্ন করেন। আমি প্রত্যেকটি প্রশ্নের উত্তরে আমাদের কথাগুলো তুলে ধরি। দু'ঘন্টার পর কমিটির চেয়ারম্যান আমাকে বলেন, 'মিঃ জাস্টিস চৌধুরী, আপনাকে বহু প্রশ্ন করেছি, জেরার মত শোনালেও কিছু মনে করবেন না। আমাদের একটি মাত্র উদ্দেশ্য ছিল। সেটি হলো এই যে, আমরা প্রকৃত অবস্থা জেনে আমাদের কর্মপন্থা নির্ধারণ করব। এখন আমরা আপনাকে বলতে পারি যে, আপনার সঙ্গে আলোচনার পর পরিস্কাররূপে বুঝতে পারলাম, এই নির্যাতনের পরে বাংলাদেশের আর পাকিস্তানের সঙ্গে থাকা চলে না। আমরা পার্লামেন্টে আপনাদের প্রতি সহানুভূতি জানিয়ে আদর্শগতভাবে আপনাদের সংগ্রামকে সমর্থন জানাব।' আমি তাঁদের গণতান্ত্রিক চিন্তাধারা এবং আদর্শের জন্য বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে অশেষ ধন্যবাদ জানিয়ে বলি যে, গণতন্ত্রের প্রতি নিবেদিত সাড়ে সাত কোটি বাঙালী দেশে গণতন্ত্র স্থাপিত হওয়া পর্যন্ত সংগ্রাম চালিয়ে যাবে। সত্যের ওপরে প্রতিষ্ঠিত আমাদের ন্যায়যুদ্ধ জয়যুক্ত হবেই।

ফরেন এফেয়ার্স কমিটিতে আলোচনার সময় আমার সঙ্গে ছিলেন সুনীল কুমার লাহিড়ী, জহির উদ্দিন এবং রাজিউল হাসান রঞ্জু। সত্যি কথা বলতে কি, তাঁরা যত প্রশ্ন করছিলেন আমি তত অনুপ্রাণিত বোধ করছিলাম। কেননা প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে আমি বাঙালীর আশা-আকাঙ্ক্ষা তুলে ধরার সুযোগ পাচ্ছিলাম।

পরের দিন বেলা এগারটার সময় সাংবাদিক সম্মেলনও আশাতীতভাবে সফল হয়। নেদারল্যান্ডের পত্রিকাগুলো প্রথম পৃষ্ঠার দু'তিন কলামব্যাপী শিরোনাম দিয়ে অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে আমাদের বক্তব্য তুলে ধরে।

নেদারল্যান্ডে আসার সময় বিমান বন্দরের সাংবাদিক সাক্ষাৎকার এবং পরের দিন আমার পার্লামেন্টের ফরেন কমিটি এবং অন্য এমপিদের সঙ্গে মিলিত হবার সংবাদ প্রকাশিত হয় এবং বিদায়ের দিন অনুষ্ঠিত সাংবাদিক সম্মেলনের বক্তব্য পত্রিকাগুলো বেশ বড় করে ছাপে। এখানকার প্রেস, ফরেন এফেয়ার্স কমিটি আমার সঙ্গে এমন ব্যবহার করেছে যে, বাংলাদেশ একটি স্বাধীন, সার্বভৌম ও সর্বজনস্বীকৃত রাষ্ট্র—আর আমি তার বিশেষ প্রতিনিধি।

আমি আগেই বলেছি, এখানে বাঙালীরা সংখ্যায় কম ছিলেন ; কিন্তু তাদের ঐক্য এবং একাগ্রতা এই সাফল্য এনে দিয়েছিল। নেদারল্যান্ডের জনগণের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ।

উনত্রিশ

আমি লন্ডনে ফিরলাম জুনের তেইশ তারিখে। ফিরে আসার পরই স্টিয়ারিং কমিটি একটি প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। শেখ মান্নানের সভাপতিত্বে স্টিয়ারিং কমিটির সভায় 'বাংলাদেশ টু-ডে' নামে একটি সাপ্তাহিক ইংরাজী পত্রিকা (বুলেটিন) প্রকাশ করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। আমি সভায় উপস্থিত ছিলাম। এ ব্যাপারে উৎসাহ দেওয়া ছাড়া আর বিশেষ কিছু করিনি। আমাদের এক সহকর্মী তাঁর ব্যবসায়ী এক বন্ধুকে নিয়ে এলেন। তিনি স্টিয়ারিং কমিটিকে দু'টি মেশিন দান করলেন, অর্থাৎ মেশিন দুটো তিনি আমাদের কিনে দেন। তাঁর নাম এই মুহূর্তে মনে পড়ছে না বলে খুবই দুঃখিত। মেশিন দু'টি ব্যতীত প্রচারকার্য চালানো একেবারেই অসম্ভব ছিল। দু'টির একটি ফটোস্টেট মেশিন অন্যটি সাইক্লোস্টাইল মেশিন। এতোদিন এ কাজগুলো বাইরে থেকে করে আনতে হয়েছে বলে অনেক খরচ পড়ত। দেশ স্বাধীন হবার পর অন্য আসবাবপত্রের সঙ্গে এই মেশিন দু'টিও বাংলাদেশ হাই কমিশনকে দিয়ে দেওয়া হয়। বাংলাদেশ টু-ডে প্রকাশনার ভার নিয়েছিলেন আমির আলী, কবির উদ্দীন আহমেদ এবং আরো কয়েকজন উৎসাহী কর্মী। সুরাইয়া খানমও এ ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। শিল্পী আবদুর রউফ ও মহিউদ্দীন চৌধুরীও যথেষ্ট পরিশ্রম করেছেন।

লন্ডনের বেজ ওয়াটার অঞ্চলের বাঙালীরা একটি শক্তিশালী শাখা সমিতি গঠন করেন। তাঁরা ছাব্বিশে জুন সেই অঞ্চলের একটি প্রকান্ড হলে এক জনসভার আয়োজন করেন। সভাটি ছিল জনাকীর্ণ। এতে উপস্থিত ছিলেন অনেক পদস্থ ইংরেজ।

সভায় লেবার পার্টি ও তাঁর নিজের পক্ষ থেকে পিটার শোর আমাদের স্বাধীনতা আন্দোলনে পূর্ণ সহানুভূতি জ্ঞাপন করেন। শেখ মান্নান স্টিয়ারিং কমিটি গঠনের পর থেকে কার্যক্রমের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণী দেন। সভায় লুৎফর রহমান শাহাজান মুক্তিযুদ্ধের আদর্শের ওপর বক্তৃতা করেন।

এই সভা পঁচিশে মার্চের ঠিক তিন মাস পরে অনুষ্ঠিত হয়। এই তিন মাসে আমাদের সংগ্রামের রূপরেখা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। বাংলাদেশের অভ্যন্তরে মুক্তিযোদ্ধারা রীতিমতো যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছেন। এদিকে ভারতে শরণার্থীদের দুরবস্থায় সারা বিশ্ব বেদনাহত। আমার বক্তৃতায় এসব কথা উল্লেখ করি। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে একথাও বলি যে, 'আমাদের দুর্গমগিরি কান্তার লঙ্ঘিতে হবে রাত্রি নিশীথে'। তাই শরণার্থীদের কলেরার ব্যাপকতা আমাদের হতবাক করে দিলেও মনকে শক্ত করে কর্তব্যের পথে এগিয়ে যেতে হবে। আমি জানি, একটি চাপা বেদনা সকলের হৃদয়কেই ভারাক্রান্ত করে রেখেছে। কিন্তু এই বেদনার আঘাত আমাদেরকে

কর্তব্যের পথে দৃপ্ত পদক্ষেপে এগিয়ে যাওয়ার শক্তি ও সাহস দেবে। আমাদের উদ্যমকে বিপুল ও আক্রমণকে দুর্বার করে তুলবে। বাঙালীর জয়যাত্রা সফল হবেই। এই তিন মাসে যে একতা গড়ে উঠেছে তা সকল বাধা অতিক্রম করে সাফল্য বয়ে আনবে। আমি নেদারল্যান্ডের জনগণের মধ্যে যে সহানুভূতি এবং সমর্থন লক্ষ্য করে এসেছি, কৃতজ্ঞতার সঙ্গে তার বর্ণনা দিলাম। আর ইংল্যান্ডের জনগণ পঁচিশে মার্চের পর থেকেই যেভাবে আমাদের সাহায্য করে আসছেন তার জন্য তাঁদেরকে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ।

সাতাশে জুন বার্মিংহাম শাখার আয়োজিত এক বিরাট জনসভায় যোগদান করি। এটি ছিল বার্মিংহামে স্টিয়ারিং কমিটি গঠিত হবার পর দ্বিতীয় সভা। সত্যি কথা বলতে কি, আমি এই বিরাট জনসমাগম দেখে আনন্দিত ও অভিভূত হই। হলটিও সাধারণ হলের চেয়ে অনেক বেশী বড়। এটি বার্মিংহামের একটি সুপ্রসিদ্ধ জিমনেশিয়াম হল। হলের একদিকে বার্মিংহাম শাখা সমিতি কয়েকটি ছোটখাট দোকান খোলে। দোকানগুলোতে বাংলাদেশ সরকারের মনোগ্রাম সম্বলিত টাই, কাফলিংস, বোতাম ইত্যাদি বিক্রি হয় এবং এই জিনিষগুলো সকলের মনেই ভাবাবেগ সৃষ্টি করে। স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ সরকারের মনোগ্রাম সম্বলিত জিনিসগুলো অনুপ্রেরণাও জাগায়। বার্মিংহামে আমরা আন্দোলনের প্রথম দিকেও একটি বিরাট জনসভায় বক্তৃতা দিয়েছিলাম। তাই সেই তারিখের পরবর্তী ঘটনাগুলোর সংক্ষিপ্ত বিবরণী সকলের কাছে তুলে ধরি। এই সভার আরেকটি ঘটনার উল্লেখ করতে চাই। সভা চলাকালে বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলন বিরোধী একটি বাংলা সাপ্তাহিক পত্রিকা বিলি করতে থাকায় সভায় গভীর উত্তেজনা সৃষ্টি হয়। আমি মঞ্চ থেকে লক্ষ্য করলাম যে, কয়েকজন বাঙালী পত্রিকা বিলিরত ছেলেটির ওপরে লাফিয়ে পড়েন। আমি এটা দেখে এক মুহূর্তও দেরী না করে মঞ্চ থেকে দৌড়ে ছেলেটির কাছে যাই। আমি যখন ছেলেটির কাছে উপস্থিত হলাম, তখন সে রীতিমতো কাঁপছিল। আমি পৌঁছানোর সঙ্গে সঙ্গে আক্রমণকারী বাঙালীরা সরে দাঁড়ান। ছেলেটির হাত ধরে আমি মঞ্চে নিয়ে এসে আমার পেছনের চেয়ারে বসাই। এরপর তাকে বলি, 'তুমি চুপ করে বসে থাক, আমি সুবিধামতো সময়ে তোমাকে হলের বাইরে পৌঁছে দেব।' সভায় অসংখ্য ইংরেজ বসে ছিলেন। তাছাড়া কয়েকজন এমপি মঞ্চে উপবিষ্ট ছিলেন। ভারতের বর্তমান আইন মন্ত্রী অশোক সেনও মঞ্চে ছিলেন। সেদিন যদি ব্যাপারটা আরেকটু গড়াত এবং ছেলেটি যদি প্রহৃত হত তাহলে গণতন্ত্রের প্রতি আমাদের আনুগত্যে সন্দেহের অবকাশ দেখা দিত। বরং তাকে মঞ্চে আনা যাঁরা লক্ষ্য করেছেন আমাদের প্রতি তাঁদের বিশ্বাস দৃঢ়তর হয়েছে। আমি এই সভায় পুনরায় স্বাধীনতা আন্দোলনের যৌক্তিকতা এবং পঁচিশে মার্চ থেকে ঐদিন পর্যন্ত ঘটে যাওয়া প্রতিটি তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনার কথা তুলে ধরি। তাছাড়া আমাদের সংগ্রামের ইতিহাস এবং আদর্শগত দিকটাও যথাসাধ্য বুঝিয়ে বলি। এই সভায় বার্মিংহামের পার্লামেন্ট সদস্য জুলিয়াস সিলভারম্যান বক্তৃতা করেন।

সভার শেষে আমরা স্থানীয় কমিটির সঙ্গে একটি রেস্টুরেন্টে মিলিত হই এবং তাঁদের অভূতপূর্ব সাফল্যের জন্য ধন্যবাদ জানাই। আমরা যখন বার্মিংহাম ত্যাগ করি, তখন বেশ রাত। শেখ মান্নান ফেরবার সময় আমাদের সঙ্গে আসেন। জগলুল পাশা এই সভা

আয়োজনের কেন্দ্রস্থলে ছিলেন। তিনি ও তাঁর স্ত্রী আন্দোলনের নয় মাস অসাধারণ পরিশ্রম করেছেন।

এই সময় সাংগঠনিক ব্যাপারেও আমাকে দৃঢ় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হয়। পঁচিশে এপ্রিল কভেনট্রির সভায় এ্যাকশন কমিটির স্টিয়ারিং কমিটি গঠিত হয়। কথা ছিল কিছুদিন পরে নিয়মিত নির্বাচনের দ্বারা এ্যাকশন কমিটি গঠিত হবে। সেই এ্যাকশন কমিটির নির্বাচন অনেকেই কামনা করছিলেন। পঁচিশে এপ্রিল থেকে দোসরা জুলাই পর্যন্ত স্টিয়ারিং কমিটি যেভাবে কাজ করে এসেছে তাতে আন্দোলন সুসংহত হয়েছে। আমি বেশ বুঝতে পারলাম যে, নির্বাচন অনুষ্ঠান আমাদের সংহতি ও ঐক্যে ফাটল ধরাতে পারে। তাই আমি উপলব্ধি করলাম যে, এ কারণে কেন্দ্রীয় কমিটি গঠনের ব্যাপারটিকে আপাততঃ স্থগিত রাখা দরকার। আমরা প্রতি মুহূর্তে এগিয়ে চলেছি যুদ্ধকালীন পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে। এখন যদি নির্বাচনের দিকে সবার দৃষ্টি চলে যায় তাহলে সাংগঠনিক কাজ পিছিয়ে পড়বে। যাঁরা নির্বাচনের জন্য উন্মুখ হয়েছিলেন তাঁদেরকে আমি জাতীয় স্বার্থে নির্বাচন আরো কিছুদিন স্থগিত রাখতে অনুরোধ করলে তাঁরা তাতে সম্মত হন।

পরদিন কনওয়ে হলে সমগ্র গ্রেট বৃটেনের সব শাখা সমিতির প্রতিনিধিবৃন্দের একটি সভা হয়। এই সভায় আমি প্রতিনিধিবৃন্দকে একতা বজায় রাখার জন্য আবেদন জানাই এবং এ্যাকশন কমিটির নির্বাচন স্থগিত রাখার কারণ বিশ্লেষণ করি। এ সম্পর্কে বলি যে, এ্যাকশন কমিটির কাজ, স্টিয়ারিং কমিটিই তো করে এল এবং এখনো কাজ এগিয়ে চলেছে সাফল্যজনকভাবে। প্রতিনিধিবৃন্দ আমার আবেদনে সাড়া দিলেন। এভাবে দলাদলির বিপদ থেকে আন্দোলন রক্ষা পেল।

দশই জুলাই আমরা বেডফোর্ড শহরে একটি জনসভা করি। সেখানে পাকিস্তানীরা আমাদের হলটিকে চারদিক থেকে ঘিরে ফেলে। সব কটি গেটের সামনেই তারা লোক দাঁড় করিয়ে রাখে। অবশ্য এখানে অনেক পুলিশ মোতায়েন ছিল। আমরা এসব ভ্রূক্ষেপ না করে সভার কাজ চালিয়ে যাই। এইদিন আমি স্বাভাবিক শান্ত সুর ত্যাগ করে, ইচ্ছে করেই কঠোর ভাষায় পাকিস্তানীদের মনোবৃত্তির নিন্দা করি। পাকিস্তানীদের এই হঠকারিতায় ইংরেজ জনসাধারণের কাছে আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের মূল আবেদন আরো জোরদার হল। এই সভায় অধ্যাপক কবির এবং শেখ আবদুল মান্নানও বক্তৃতা করেন।

ত্রিশ

ঠিক এমন সময়েই পাকিস্তানের প্রতি চীনের সহানুভূতির কথা নানাভাবে প্রকাশ পায়। জানা যায় যে, পাকিস্তান মার্কিন সরকারের সহযোগিতায় এবং নিজেদের বন্ধুত্বের বলে চীনের মনে একটি ধারণার জন্ম দিতে সক্ষম হয়। সেটা আর কিছুই নয়, ভারতের উস্কানিতে আওয়ামী লীগ এবং অন্যান্য রাজনৈতিক দল বাংলাদেশকে পাকিস্তানের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করার উদ্দেশ্যে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেছে। এটা ভারতের প্রভাব বিস্তারের একটি দূরভিসন্ধি। চীন–ভারত যুদ্ধের পর থেকে উভয়ের সম্বন্ধের মারাত্মক অবনতি ঘটেছিল। ১৯৭১ সালেও তেমন কিছু উন্নতি হয়নি। দুর্ভাগ্যবশতঃ চীন এই পাকিস্তানী প্রচারণায় বিশ্বাস স্থাপন করে বসে। তার ফলে বাংলাদেশের স্বাধীনতার জন্য সংগ্রামী মানুষের মনে বিক্ষোভের সৃষ্টি হয়। ১৬ই জুলাই আমি গোরিং স্ট্রিটের অফিসে কাজ করছিলাম। এই সময় আমাদের একদল তরুণ এবং উৎসাহী কর্মী চীনা দূতাবাসের সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে একটি স্মারকপত্র দেওয়ার প্রস্তাব নিয়ে আসে। আমি এই আন্দোলনের সময় একটি জিনিস লক্ষ্য করেছি, যখন যে দল যে প্রস্তাব নিয়ে আসবেন তাঁদের সেই প্রস্তাবটিকেই সে সময় তাঁদের কাছে সবচেয়ে মূল্যবান মনে হয়। সেই মুহূর্তে সেই প্রস্তাবটি গ্রহণ না করলে প্রস্তাবক এমন ভাব দেখান যেন সর্বনাশ হয়ে গেল। অবশ্য আমার আরো একটি অভিজ্ঞতা হয়েছে। কোনভাবে ঐদিন কোনরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণ না করে যদি বিষয়টি স্থগিত করা যায় তাহলে দেখা যাবে কয়েকদিন পরে যখন বিষয়টি আলোচিত হবে তখন ধীরস্থিরভাবে একটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ সম্ভব হয়। ঢাকা হাইকোর্টের বিচারপতিরূপে আমার চুপ করে বসে দু'দিকের কথা শোনার যে অভ্যাস হয়েছিল, সেটা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হিসেবেও কাজে লেগেছিল এবং লন্ডনে স্বাধীনতা সংগ্রাম পরিচালনার ব্যাপারে আমাকে খুব সাহায্য করেছিল। সেদিন চীনা দূতাবাসের সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শনের জন্য আমার ওপরে চাপ দেওয়া হয়। এদিকে বেশ কয়েকজন এর বিরোধিতাও করেন, বিশেষ করে তরুণ ব্যারিস্টার শাখাওয়াত হোসেন। যাঁরা বিক্ষোভ প্রদর্শনের পক্ষে তাঁরা যেমন স্বাধীনতা আন্দোলনে আন্তরিকভাবে প্রথম থেকেই কাজ করে আসছেন, তেমনি যাঁরা বিরোধিতা করছেন তাঁরাও স্বাধীনতা আন্দোলনে প্রথম থেকেই অনুরূপভাবে কাজ করছেন। আমি দু'দলের কথাই অনেকক্ষণ পর্যন্ত চুপ করে শুনলাম। তাতে দু'দলই সন্তুষ্ট হ'ল। এক পর্যায়ে হঠাৎ আমি বলে ফেললাম, "আজকে যদি লন্ডনে বঙ্গবন্ধু উপস্থিত থাকতেন তাহলে তিনি কি করতেন ?"

শেখ মান্নান বললেন, 'বঙ্গবন্ধু তাঁর পরিচালিত কোন আন্দোলনের কেউ বিরোধিতা করলে

তার বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শনে কোন দ্বিধা করতেন না।'

আমিও বললাম, "বেশ তাই হবে। আপনারা শান্তিপূর্ণ শোভাযাত্রা বের করে চীনা দূতাবাসে যাবেন এবং স্মারকলিপি দিয়ে আসবেন। কিন্তু কোনরূপ অপ্রীতিকর ঘটনা যেন না ঘটে। কেননা, চীন যদি বর্তমানে আমাদের সাহায্য নাও করে, আমাদের চেষ্টা করতে হবে যাতে তারা ভবিষ্যতে আমাদের স্বাধীনতা আন্দোলনে সাহায্য করে। সেই জন্যই আমি ইতস্ততঃ করছিলাম।"

ষোলই জুলাই শোভাযাত্রা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণের পর মাত্র একদিনের প্রস্তুতিতে চীনা দূতাবাসের সামনে শান্তিপূর্ণভাবে বিক্ষোভ প্রদর্শন করা হয় এবং একটি স্মারকলিপি দেওয়া হয়। পরে শোভাযাত্রাকে ১০ নম্বর ডাউনিং স্ট্রিটে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে শোভাযাত্রার সমাপ্তি ঘটে। এই শোভাযাত্রায় ইংল্যান্ডের নানা অঞ্চল থেকে বিপুলসংখ্যক বাঙালী কোচ ভাড়া করে লন্ডনে আসেন। বার্মিংহাম থেকে আগত দলটি ছিল সবচেয়ে বড়। সেই দলের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন জগলুল পাশা।

একত্রিশ

মাঝে মাঝে এমন সব খবর আসত যাতে করে তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা নিতে হত। আমাদের কার্ডিফ সমিতির কর্মকর্তাদের টেলিফোন পেলাম। তাঁদের ফোনে জানতে পারলাম যে, কয়েকজন বিপদগ্রস্ত বাঙালী নাবিক সাহায্য প্রার্থনা করছেন। তাঁরা বললেন যে, ১৬/১৭ জন নাবিক পাকিস্তান থেকে কর্ণফুলী নামে একটি জাহাজ নিয়ে এসেছেন। তাঁরা যদি পাকিস্তানে ফিরে যান তাহলে তাদের নিরস্ত্র করে বন্দী অবস্থায় রাখা হবে। আমাকে আরো বললেন যে, ফিরে গেলে তাদের জীবনহানিরও আশঙ্কা আছে। আমি এই ফোন পেয়ে খুবই বিচলিত হয়ে পড়ি। কারণ জাহাজটি সেদিনই ফিরে যাবে। সেই একদিনের মধ্যেই তাদের রক্ষা করার ব্যবস্থা করতে হবে এবং আমরা ব্যর্থ হলে যদি কারো প্রাণ যায় তাহলে নিজেকে কখনো ক্ষমা করতে পারব না। আমি পিটার শোর, জনস্টোনহাউস ও ব্রুস ডগলাসম্যানকে টেলিফোন করলাম। তাঁরা প্রত্যেকে কার্ডিফে ফোন করেন। তাঁরা বিশেষ করে কার্ডিফের পার্লামেন্ট সদস্য এ্যালফ্রেড এভেন্সকে ফোন করে সর্বপ্রকার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে অনুরোধ করেন। আমি তাঁদের কাছ থেকে এভেন্সের ফোন নাম্বার নিয়ে তাঁকে ফোন করি। আমি তাঁকে বলি যে, কয়েকজন বাংলাদেশী নাবিককে ইচ্ছার বিরুদ্ধে পাকিস্তানে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। এভেন্স আমাকে বলেন, 'আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, আমি এক্ষুণি জাহাজে যাচ্ছি এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে আপনাকে ফোন করব।' আমি সারাদিন উদ্বেগ-উৎকণ্ঠার মধ্যে

সময় কাটাই। সন্ধ্যার দিকে বহু প্রত্যাশিত ফোনটি এল। এ্যালফ্রেড এভেন্সকে বলতে হলো না কি হয়েছে। তিনি যখন শুধু বললেন, 'জাস্টিস চৌধুরী' তাঁর কণ্ঠস্বরই বিজয়বার্তা বহন করছিল। তিনি বলতে লাগলেন আমি সংশ্লিষ্ট অফিসারদের সঙ্গে জাহাজে যাই এবং আমাদের দাবী অনুসারে সকলকে এক লাইনে দাঁড় করানো হয়। প্রত্যেককে জিজ্ঞেস করা হয় তাঁরা করাচীতে ফিরে যেতে চান না এখানে থাকতে চান। চৌদ্দজন নাবিক বলেন, "করাচীতে নিয়ে গেলে তাঁদের মেরে ফেলবে।" সেই চৌদ্দজনকে আমি জাহাজ থেকে ফিরিয়ে এনেছি। আর তিনজন বলেন যে, 'তাঁদের পরিবার থেকে অনিশ্চিত সময়ের জন্য বিচ্ছিন্ন থাকা তাঁদের জন্য মৃত্যুতুল্য হবে। এখন কি করব বলুন।' আমি এভেন্সকে বললাম, 'আপনি যে উপকার করলেন তার জন্য বাঙালী হিসেবে আমি চিরকাল আপনার কাছে কৃতজ্ঞ থাকব। আপনি চৌদ্দজন নাবিককে লন্ডনে আমার অফিসে পাঠিয়ে দেন। আমি যত রাতই হোক, তাঁরা না আসা পর্যন্ত আমি অফিসে অপেক্ষা করব।' তাঁকে আরো অনুরোধ করলাম যে, 'তাঁরা কোন্ ট্রেনে রওয়ানা হলো আমাকে জানালে আমি তাদের ষ্টেশন থেকে অফিসে আনার ব্যবস্থা করব।' তিনি কতক্ষণ পরে আবার আমাকে টেলিফোন করে ট্রেনের সময় বলে দেন। কার্ডিফ থেকে লন্ডনে ট্রেনে আসতে সময় লাগে ঘন্টাতিনেক। সেই অনুসারে শেখ মান্নান কয়েকজন সহকর্মী সঙ্গে নিয়ে ষ্টেশনে গেলেন। তাঁরা অফিসে এলেন রাত দশটার দিকে। ইতিমধ্যেই প্রায় সকলেরই খাওয়া ও চাকরির ব্যবস্থা হয়ে যায়। একতা এবং সদিচ্ছা থাকলে সমস্যার এমনি করেই সমাধান হয়। বিভিন্ন রেস্টুরেন্ট মালিক এবং ব্যবসায়ীকে ফোন করার পর সবাই দু'একজন করে তাঁদের প্রতিষ্ঠানে নিয়ে নেন। নাবিকদের মধ্যে একজন ছিলেন ইঞ্জিনিয়ার। তাঁর নাম এ, কে, এম, নূরুল হুদা। তাঁকে আমাদের অফিসের কাজে নিয়োগ করা হলো। তিনি সেদিন থেকে শুরু করে স্বাধীনতা অর্জিত না হওয়া পর্যন্ত একজন নিবেদিতপ্রাণ কর্মী হিসেবে কাজ করেছেন। স্বতঃস্ফূর্তভাবেই করেছেন অক্লান্ত পরিশ্রম। তিনি কোথায় আছেন জানি না, তাঁর সাথে যোগাযোগও নেই, কিন্তু তাঁর কথা মনে হলে একজন একনিষ্ঠ কর্মীর চেহারা আমি দেখতে পাই।

বত্রিশ

জুনের শেষের দিকে ভারতে বাঙালী শরণার্থীদের সংখ্যা সাংঘাতিকভাবে বাড়তে শুরু করে। ইতিমধ্যেই এদের সংখ্যা ৫০ লাখ ছাড়িয়ে গিয়েছিল। অন্ন, বস্ত্র ও আশ্রয়হীন এই মানুষদের অবর্ণনীয় দুর্দশার খবরে পৃথিবী স্তম্ভিত হয়ে পড়ে।

আমাদের মুক্তিযোদ্ধারাও এ সময় বেশ সংগঠিত হয়ে জোর তৎপরতার সঙ্গে কাজ চালিয়ে যেতে থাকেন। আমাদের বেসামরিক কর্মপ্রচেষ্টায় অংশগ্রহণ করে যুদ্ধ চলাকালের রণক্ষেত্র থেকে বহু দূরে অবস্থান করেও তাঁরা যুদ্ধে সক্রিয় অংশগ্রহণ করতে থাকেন। রণক্ষেত্রে যাঁরা সংগ্রাম করছেন তাঁদের যে কোনভাবে সাহায্য করাটাই সংগ্রামে অংশগ্রহণের শামিল। তাই আমরা পাকিস্তান সরকারের সাহায্যের আবেদন যাতে ব্যর্থ হয় তার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা শুরু করি। ওয়াশিংটন ও লন্ডনে প্রবাসী বাঙালীগণ দলে দলে এম,পি-দের সঙ্গে দেখা করে এই বিষয়টির ওপর বারবার জোর দেন। স্টিয়ারিং কমিটি এই কর্মসূচীর সমন্বয় করছিলেন। এ সময় আমি প্রতিদিন কতক্ষণ করে অফিসে বসি। পার্লামেন্ট এবং সাংবাদিকদের সাথে সব সময়ই ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রাখতে হচ্ছিল। আমরা যখন দেখতে পেলাম যে, পাকিস্তান সরকার তিনজন বৃটিশ এমপি'র বাংলাদেশ ভ্রমণের ব্যবস্থা করেছে তখন আমাদের আন্দোলনের সমর্থনকারী সদস্যদের সহায়তায় আরো চারজন সুপরিচিত এমপিকে বাংলাদেশ ও ভারত পরিদর্শনের জন্য রাজী করাই। তাঁদের দু'জন রক্ষণশীল দলের এবং দু'জন শ্রমিকদলের। রক্ষণশীল দলের দু'জনের নাম জেমস রেমসটেন ও টবি জেসেল। আর শ্রমিক দলের দু'জন হচ্ছেন আর্থার বটমলী এবং রেজিনাল্ড প্রিন্টিস। তাঁরা চারজনেই বাংলাদেশ ও ভারত সফর করে যে বর্ণনা দেন তা পড়ে বিশ্ববাসী শিউরে ওঠে। একমাত্র মিসেস জিলনাইট ইয়াহিয়া খানের পক্ষে বিবৃতি দেন। কিন্তু তাতে আমাদের কোন ক্ষতি হয়নি। ডেইলি টেলিগ্রাফ ২৭ শে জুন মিসেস নাইটকে ইয়াহিয়া খানের একমাত্র সাক্ষী হিসেবে বর্ণনা করে।

এদিকে ভারতের জনগণও অত্যাচার এবং নিপীড়ন স্বচক্ষে দেখে অসহিষ্ণু হয়ে পড়েছিলেন। ২৮শে জুনের টাইমস-এ প্রকাশিত সংবাদে দেখা যায় যে, ইন্দিরা গান্ধী তাঁদেরকে শান্ত করার চেষ্টা করছেন।

বাংলাদেশ থেকে ভারতে আগত শরণার্থীদের অনেকে কলেরায় প্রাণ হারান। সে অবস্থার কিছুটা উপশম হয় জুলাই মাসের দিকে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে খবর আসে যে, বৃষ্টি শুরু হবার পর ক্যাম্পগুলোতে মানুষের নিদারুণ কষ্ট দেখা দিয়েছে। তাঁদেরকে ভিজে ভিজে অতিবাহিত করতে হচ্ছে দিন-রাত। ফলে অনেকে নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত হয়ে পড়েছেন।

এ খবরে কলেরার সময় যেমন এখনো তেমনি 'ওয়ার অন ওয়ান্ট', 'অক্সফাম' ইত্যাদি ত্রাণসংস্থা ত্রাণকার্য ত্বরান্বিত করেন। কেবল শরণার্থী শিবিরে নয়, অন্যদিকেও অবস্থা একটি অস্থিরতা এবং চাঞ্চল্যের দিকে এগিয়ে যায়। আমরা লন্ডনে বসে সেখানকার কাগজে বুঝতে পারি যে, প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারকে ভারতের মাটিতে থেকে স্বাধীনতা আন্দোলন পরিচালনা করার সুযোগ দেওয়াতে পাকিস্তান তাকে সর্বতোপ্রকারে বিব্রত করতে বদ্ধপরিকর। আটই জুলাই পিটার হ্যাসেল হার্স্ট কর্তৃক একটি প্রতিবেদন লন্ডনের দৈনিক টাইমস্ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। তাতে আমরা দু'টি খবর জানতে পারি। একটি, পাকিস্তান সমর প্রস্তুতি গ্রহণ করছে, আরেকটি হচ্ছে, যুক্তরাষ্ট্রের কাছ থেকে অস্ত্র সাহায্য পাচ্ছে। প্রতিবেদনটিতে বলা হয়, ভারতীয় লোকসভায় স্বরাষ্ট্র বিভাগের প্রতিমন্ত্রী বলেন যে, কাশ্মীর সীমান্তে নাশকতামূলক কার্যক্রম গ্রহণ করতে পাকিস্তান বেআইনী অনুপ্রবেশকারী পাঠাচ্ছে।

যদিও মন্ত্রী নিরাপত্তার স্বার্থে বিস্তারিত জানাতে বিরত থাকেন। যেটুকু বলেন তাতেই জনমনে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। কেননা মন্ত্রী আরো বলেন যে, পাকিস্তান ১৯৬৫ সালে পাক-ভারত যুদ্ধের পূর্বে অনুরূপ কার্যক্রম গ্রহণ করেছিল। হেনরী কিসিঞ্জার মার্কিন প্রেসিডেন্ট রিচার্ড নিক্সনের প্রতিনিধিরূপে দিল্লীতে আগমন করেন। এই খবরটিতে তার উল্লেখ করে বলা হয় যে, ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী এবং পররাষ্ট্রমন্ত্রী শরণ সিং পৃথক সাক্ষাৎকারে তাঁর কাছে ভারতের মনোভাব প্রকাশ করেন। তাঁরা বলেন যে, পাকিস্তানকে অস্ত্র সরবরাহের খবর ভারতের পক্ষে যথেষ্ট উদ্বেগের কারণ হয়েছে। কিসিঞ্জার অবশ্য তাঁদেরকে বলেন যে, পূর্ব চুক্তি অনুযায়ী ২৫ শে মার্চের আগেই যুক্তরাষ্ট্র থেকে প্রাপ্ত কিছু সরঞ্জামসহ পাকিস্তানী জাহাজ আমেরিকা ত্যাগ করে। এ অবস্থায় আমেরিকার পক্ষে আর কিছু করা সম্ভব নয়। অবস্থাটি বিশ্লেষণ করে প্রেসিডেন্ট রিচার্ড নিক্সন শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর নিকট হেনরি কিসিঞ্জারের হাতে একটি ব্যক্তিগত পত্র দেন। সেই পত্রে তিনি জানান যে, পাকিস্তানের পূর্বচুক্তি অনুযায়ী কিছু খুচরো যন্ত্রাংশ পাঠানো হয়েছে এবং এ ব্যাপারে কোনরূপ শঙ্কার কারণ নেই। আরো বলা হয় যে, জুন মাসে আমেরিকা থেকে যে পাকিস্তানী জাহাজগুলো ছাড়ে তার জন্য আমলাতান্ত্রিক ত্রুটি দায়ী। অবশ্য এই অস্ত্র বিক্রয়ের চুক্তি ২৫ শে মার্চের আগে সম্পাদিত হয়েছিল।

ইন্দিরা গান্ধী পত্র পেয়ে তাঁর সহজাত প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের সঙ্গে কিসিঞ্জারকে বলেন, ভারতের মতে, একটি স্ক্রু অথবা এ জাতীয় যে কোন যন্ত্র, একটি অকেজো বিমান অথবা ট্যাংককে যদি ধ্বংসাত্মক কাজ পরিচালনার উপযুক্ত করে তোলে তাহলে সেই খুচরা যন্ত্রপাতি জীবন ধ্বংসকারী অস্ত্র বলে মনে করা হবে।

ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী শরণসিং অনুরূপভাবেই কিসিঞ্জারকে বলেন যে, প্রেসিডেন্ট রিচার্ড নিক্সনের উচিত পাকিস্তানের নিকট সর্বপ্রকার অস্ত্র সরবরাহ বন্ধ করা। আরো জানা যায়, কিসিঞ্জার নিক্সনের পক্ষ থেকে কোনরূপ আশ্বাস দান না করে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের সঙ্গে দেখা করার জন্য ইসলামাবাদে চলে যান।

এসব খবর সাধারণভাবে দু'টি প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। এক, বিপদ যত গুরুতর আকার ধারণ করে এবং ভবিষ্যৎ যখনই নানা জটিলতার দ্বারা অস্পষ্ট হয়ে ওঠে বাঙালী যুবকের মনে সংগ্রামী মনোভাব ততই তীব্র আকার ধারণ করে। সকল বাধা অতিক্রম করে দুর্বার বেগে এগিয়ে যাওয়ার দৃঢ়তর এবং কঠিনতর শপথ সে গ্রহণ করে। দ্বিতীয়টি হচ্ছে, তার মনে ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে একটি অনিশ্চয়তার ভাব সৃষ্টি করে। আমি এ কথা মনে করে আনন্দবোধ করছি যে, প্রায় সব প্রবাসী বাঙালীর মনেই আমি প্রথমোক্ত ভাবটিই দেখতে পাই। দ্বিতীয় ভাবটি যাদের মধ্যে দেখেছি তাঁদের সংখ্যা একেবারেই নগণ্য—চার পাঁচজনের বেশী নয়।

আমাদের মনে কোথা থেকে এই উৎসাহ আসত বলতে পারি না। আমরা একটি অফিস স্থাপন করেছি, সংগ্রাম পরিচালনা করছি। ভাবটা এই নয় যে, সংগ্রাম পরিচালনার জন্য একটি অফিস করা হয়েছে, কবে এর শেষ হবে জানা নেই। ভাবটা এই যে, দু'দিনের কাজ চালাবার জন্য এখানে একটি অতি সাময়িক ব্যবস্থা করা হয়েছে। প্লেনের টিকেট কাটা হয়ে

গেছে, কেবল তারিখটি বসানো বাকী। তাই কারো মনে চিন্তা-ভাবনা, অনিশ্চয়তা কিছুই দেখিনি। দেখেছি একনিষ্ঠতা ও অধ্যবসায়ের সঙ্গে জয়দৃপ্ত অভিযান। অবশ্য শরণার্থীদের অবস্থা আমাদের মনকে দুঃখভারাক্রান্ত করে রাখত। প্রতিদিন অসংখ্য ছিন্নমূল মানুষ বাড়ী-ঘর, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব সব ফেলে একটি প্রতিবেশী রাষ্ট্রের মাটিতে দৌড়ে এসে অবসন্ন এবং রুগ্ন দেহে লুটিয়ে পড়ছে। ভারত সরকারের এবং আন্তর্জাতিক সাহায্য সত্বেও শরণার্থীদের দুঃসহ অবস্থা থেকে রক্ষা করা যাচ্ছে না। তাছাড়া বিশ্ব ব্যাংক আগামী শরৎকালে ভয়াবহ দুর্ভিক্ষের কথা বলে বিশ্ববাসীকে শঙ্কিত করে তোলে। অবশ্য রিপোর্টটি একবার প্রত্যাহারও করা হয়েছিল। ইতিমধ্যেই নানা সংবাদপত্র সংস্থাগুলি বলতে শুরু করে যে, ভারতে এক কোটি শরণার্থী পৌঁছে গেছেন। অর্থাৎ পৃথিবীর অনেক দেশের মোট জনসংখ্যার চেয়ে বেশী শরণার্থী ভারতে আশ্রয় গ্রহণ করেছেন। অথবা আরো বলা চলে, বাংলাদেশে মোট জনসংখ্যার প্রায় এক-সপ্তমাংশ মানুষ ভারতে আশ্রয় গ্রহণ করেছেন। এই অবস্থা আমাদের জন্য নিদারুণ দুঃশ্চিন্তা ও শঙ্কার সৃষ্টি করে। আর ভারত সরকারকে একটি অসম্ভব অবস্থার মুখোমুখি হতে হয়।

তেত্রিশ

এই সময় পাকিস্তান সরকার মাঝে মাঝে বাংলাদেশের পরিচিত ব্যক্তিদের সমন্বয়ে গঠিত প্রতিনিধিদল বিদেশে পাঠানো শুরু করে। এদের কোন দলই আমার সঙ্গে দেখা-সাক্ষাতের চেষ্টা করেনি এবং আমিও তাঁদের সঙ্গে যোগাযোগ করিনি। দু'একবার আমাদের দু'একজন কর্মী ব্যক্তিগতভাবে এঁদের কারো কারো সঙ্গে দেখা করেন। তাঁরা আমাকে বলেন যে, তাঁদের ব্যক্তিগত আত্মীয় বা বন্ধু এসেছেন। দেখা করে দেশের অভ্যন্তরে অবস্থানরত আত্মীয়-স্বজনের খোঁজ-খবর নিতে চেষ্টা করবেন। এইসব প্রতিনিধি স্বেচ্ছায় গিয়েছেন অথবা স্ত্রী-পুত্র-কন্যার নিরাপত্তার জন্য বাধ্য হয়েছেন কিনা তা আমি জানি না। আমি মনে করেছি আমার কর্তব্য আমি করব। তাঁদের বিবেক যা বলে তাঁরা তাই করবেন। এ সময় 'টাইমস' পত্রিকায় রাজশাহী ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দু'জন অধ্যাপকের লেখা একটি যুক্ত চিঠি প্রকাশিত হয়। তারিখ হচ্ছে ৭ই জুলাই। চিঠিটি বেশ লম্বা। তাতে যে ক'টি বিশেষ তথ্য তুলে ধরার চেষ্টা করা হয় তা সংক্ষেপে উল্লেখ করছি। তাতে বলা হয় যে, 'বুদ্ধিজীবীদের হত্যা করা হয়নি।' তাতে আরো বলা হয় যে, রাজশাহী এবং চট্টগ্রামে একজন শিক্ষকও নিহত হননি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অনেক শিক্ষককে হত্যা করার অভিযোগ নাকচ করে দিয়ে তারা বলেন, 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে নিহত শিক্ষকদের সংখ্যা মাত্র নয়জন।' রোকেয়া হলে সেনাবাহিনীর

অত্যাচারের খবরও মিথ্যা বলে বর্ণনা করে বলেন যে, সে সময় রোকেয়া হলে কোন ছাত্রী ছিল না। তাঁদের এই চিঠি প্রকাশিত হবার পর বিভিন্ন সময় আমি বলেছি যে, নয়জন শিক্ষকের মৃত্যু বোধ করি অপরাধ নয় এমনভাবে কথাগুলো বলা হয়েছে অথবা পাকিস্তান সরকারের দোষ স্খলনের চেষ্টা করা হয়েছে। একজন শিক্ষকের হত্যাই যথেষ্ট অন্যায় এবং ঘৃণ্য। নয়জন শিক্ষকের হত্যার স্বীকারোক্তিতে বিশ্ববাসী বুঝবেন যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে পাকিস্তান সরকার নরকে পরিণত করেছে।

একই দিনে, অর্থাৎ ৭ই জুলাই লন্ডনের বিভিন্ন পত্রিকা 'পূর্ব পাকিস্তানে' ভয়াবহ গণহত্যা অব্যাহত রয়েছে একথা বিশ্ববাসীকে স্মরণ করিয়ে দেয়। সাতই জুলাই ডেইলি টেলিগ্রাফ সম্পাদকীয়তে বলা হয় ঃ "পূর্ব পাকিস্তানের ওপর সামরিক নির্যাতনের কোন গ্রহণযোগ্য ভবিষ্যৎ নেই। অত্যাচারিত জনগণ বা প্রতিবেশী ভারতের কাছে অবস্থা অসহনীয় হয়ে উঠেছে। এমনকি বিশ্ব সম্প্রদায়ও শঙ্কিত এবং উৎকণ্ঠিত।" এই সম্পাদকীয়তে নৈতিকতার দিক থেকে এই অন্যায়ের প্রতিবাদ জানানো হয় এবং ভবিষ্যৎ অন্ধকারাচ্ছন্ন ও ভাবী বিশ্বযুদ্ধের সূচনা করছে বলে শঙ্কা প্রকাশ করা হয়। সম্পাদকীয়তে আরও বলা হয় ঃ পাকিস্তান সরকারের উচিত বাস্তবতাকে উপলব্ধি করা। এক্ষেত্রে বাস্তবতা হলো এই যে, 'শেখ মুজিবই জাতিকে রক্ষা করতে পারেন। তাঁকে মুক্তি দিয়ে দেশে প্রেরণ করলেই শুধুমাত্র শান্তি স্থাপিত হতে পারে।'

চৌত্রিশ

আমরা জুলাই মাসের দিকেই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সম্পর্কে অনেক ভয়াবহ খবর শুনছিলাম। বেশ বড় গুজব ছিল যে, জেলে তাঁর ওপরে শারীরিক অত্যাচার করা হচ্ছে। সেই সময় আমরা এ্যামনেষ্টি ইন্টারন্যাশনালকে এই ব্যাপারে সাহায্য করতে অনুরোধ করি। এ্যামনেষ্টি ইন্টারন্যাশনালের সেক্রেটারী জেনারেল মিঃ মার্টিন এনালস প্রথম থেকেই খুব বন্ধুত্বপূর্ণ ব্যবহার করছিলেন। আমি মাঝে মাঝে তাঁর সঙ্গে দেখা করতাম এবং সার্বিক বিষয় নিয়ে আলোচনা করতাম। তিনি তাঁর অফিসের দরজা আমার জন্য অবারিত একথা সব সময় বলতেন। আমি যখনই এ্যামেনেষ্টি ইন্টারন্যাশনালের অফিসে গিয়েছি তিনি এবং তাঁর সহকর্মীগণ ছুটে এসেছেন সাহায্য করার আন্তরিক মনোভাব নিয়ে।

এভাবে আরো একটি আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান আমাদের কাছে আন্তরিকভাবে সমবেদনা ও সহমর্মিতা জ্ঞাপন করেছেন এবং সক্রিয়ভাবে সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, সাহায্য

করেছেন। এই প্রতিষ্ঠানটির নাম সোশ্যালিষ্ট ইন্টারন্যাশনাল। এর সেক্রেটারী জেনারেল অস্ট্রিয়ার নাগরিক হ্যানস ইয়ানিট সেক। ইয়ানিট সেকও আমাকে বার বার বলেছেন, 'আমার অফিস আপনার অফিস। যখন ইচ্ছা আমার অফিসে চলে আসবেন। আমার ষ্ট্যানোগ্রাফার সেক্রেটারী আপনার কাজ করতে পারলে আনন্দিত হবে।' এমনকি আমাকে একটি আলাদা রুম দেখিয়েও বলেছেন যে, আপনি এখানে বসে কাজ করতে পারেন। আমাদের নিজেদের অফিস থাকলেও মাঝে মাঝে নিরিবিলি কাজ করার জন্য তাঁর অফিস উন্মুক্ত করে দিয়েছিলেন। শুধু তাই নয়, তিনি অনবরত টেলিফোন করে খবর নিতেন। সে সময় সোশ্যালিষ্ট ইন্টারন্যাশনালের প্রেসিডেন্টে ছিলেন পশ্চিম জার্মানীর সুবিখ্যাত চ্যান্সেলর উইলি ব্রান্ট। ইয়ানিট সেক তাঁর সঙ্গেও আমার পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন। এমনকি একবার সোস্যালিষ্ট ইন্টারন্যাশনালের ইয়ানিট সেকের সহযোগিতায় পুরো গভর্নিং বডির সভা চলাকালে ইয়ানিট সেকের সহযোগিতায় পুরো গভর্নিং বডির সঙ্গেই আমরা মিলিত হই। বেশ মনে আছে, আমরা গভর্নিং বডির প্রেসিডেন্ট এবং সদস্যবৃন্দকে তাঁদের সভার শেষে একটি বাংলাদেশী রেস্টুরেন্টে আমন্ত্রণ জানাই। রেস্টুরেন্টের মালিক মঈনুদ্দিন। তিনি নৈশ ভোজের ব্যবস্থা করেন। এই দিন এই রেস্টুরেন্টে স্টিয়ারিং কমিটির সদস্য শেখ আবদুল মান্নান এবং অন্য কয়েকজন সহকর্মীসহ আমরা সোশ্যালিষ্ট ইন্টারন্যাশনালের গভর্নিং বডির কাছে বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে সর্বতোভাবে সাহায্যের আবেদন জানাই। উইলি ব্রান্ট ছাড়াও পশ্চিম ইউরোপের প্রায় সকল দেশের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। আমাদের রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে একাত্তরের ২৫শে মার্চের মধ্যরাতে স্বাধীনতা ঘোষণা পর্যন্ত ঘটনাবলীর সংক্ষিপ্ত বিবরণী দেই এবং তারপর ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা নিয়ে আলোচনা করি। তারা প্রত্যেকেই নিজ নিজ দেশে আমাদের জন্য কাজ করে যাবার আগ্রহ প্রকাশ করেন।

এত বড় একটি সুযোগ ইয়ানিট সেকের সহৃদয়তায় লন্ডনে বসেই পেয়েছিলাম। এখন মনে হয় যেন, মার্টিন এনালস এবং ইয়ানিট সেকের মতো মানুষের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্যও আমার এই স্মৃতিচারণের প্রয়োজন ছিল।

মার্টিন এনালসের সহায়তায় বঙ্গবন্ধুর নিরাপত্তা সম্বন্ধে আমরা একটি পদক্ষেপ গ্রহণ করি। আমরা তাঁর সম্পর্কে কোন খবরই পাচ্ছিলাম না। সমগ্র স্বাধীনতা আন্দোলনে যিনি উৎসাহ এবং উদ্দীপনার উৎস, তাঁর সম্বন্ধে সঠিক সংবাদের অভাবে আমরা স্বভাবতই বিচলিত ছিলাম। ব্যক্তিগতভাবে আমি মাঝে মাঝে যখন বৃটিশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী স্যার আলেক ডগলাস হিউমের সঙ্গে দেখা করি তখন তাঁর কাছে থেকে জানতে পারি যে, শেখ মুজিব সুস্থ আছেন। তাঁর নাম প্রকাশে অনিচ্ছাহেতু সেকথা আমার সহকর্মীদের জানাতে পারিনি। তবে এইটুকু সংবাদ ব্যক্তিগতভাবে যথেষ্ট সান্ত্বনা দিয়েছে। আমি তাঁর কাছেও একারণে ঋণী হয়ে আছি। তবে বাঙালীরা যে শঙ্কা ও অসহায়ত্বের মধ্যে দিন কাটাচ্ছিলেন তার থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য মার্টিন এনালস এবং আন্তর্জাতিক রেডক্রস কমিটি (আইসি আর সি)-এর নিকট আনুষ্ঠানিকভাবে দরখাস্ত পেশ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি। অধ্যাপক ড্রেপার একজন নাম করা ব্যারিষ্টার। তিনি সাসেক্স বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের প্রধান ও ডীন। রেডক্রস

সংক্রান্ত জেনেভা কনভেনশন এবং অন্যান্য আইনের বিশেষজ্ঞ। মাটিন এনালসের পরামর্শে আমরা ড্রেপারকে আমাদের পক্ষ থেকে আন্তর্জাতিক রেডক্রস কমিটির নিকট দরখাস্ত পেশ করার জন্য ব্যারিস্টার হিসাবে নিযুক্ত করেছিলাম।

পঁয়ত্রিশ

পাঁচই আগস্ট ড্রেপার এবং আমি সকাল দশটার দিকে জেনেভা পৌঁছাই। আমরা বিমানবন্দর থেকে একটি ট্যাক্সি করে আইসি আর সি-র প্রধান কার্যালয়ে যাই। সেখানে বেশ আনুষ্ঠানিকভাবে ড্রেপার আইসি আর সি-এর উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন কর্মকর্তাদের নিকট বঙ্গবন্ধুর নিরাপত্তা এবং সঠিক সংবাদ পরিবেশনে সাহায্য করতে অনুরোধ জানান। তিনি বলেন, শেখ মুজিব বাঙালী জাতির নেতা। তাঁর খবরের জন্য সমগ্র জাতি উদগ্রীব এবং নিদারুণ উৎকণ্ঠায় সময় যাপন করছেন। তাঁকে অবিলম্বে মুক্তি দিতে হবে। দেশের অসংখ্য মানুষ তাঁর নিরাপত্তার খবর চান। 'আইসি আর সি'র উচিত তাঁর সঙ্গে দেখা করে ফিরে এসে বিবৃতি দেয়া। আইসি আর সি কর্মকর্তাবৃন্দ আমাদের এই বলে আশ্বাস দেন যে, তাঁরা অত্যন্ত মনোযোগের সঙ্গে আমাদের বক্তব্য শুনেছেন এবং শেখ মুজিবের সঙ্গে দেখা করার জন্য তাঁরা যথেষ্ট চেষ্টা করবেন এবং ফলাফল জানাবেন। তাঁরা অবশ্য আরো বললেন যে, তাঁরা কিছুদিন আগে 'পূর্ব পাকিস্তানের' দুঃস্থ মানুষের জন্য ত্রাণসামগ্রী পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু সেই প্লেনও পূর্ব পাকিস্তানে যাওয়ার অনুমতি পায়নি। করাচীতে তিন দিন কাটিয়ে প্লেনটি ফিরে এসেছে। যাই হোক, তাঁদের দিক থেকে চেষ্টার ত্রুটি হবে না। তাঁরা যদি শেখ মুজিবের সঙ্গে পাকিস্তানী কারাগারে দেখা করতে পারেন তাঁহলে তারাই গৌরবান্বিত বোধ করবেন। আইসি আর সি-র অফিস থেকে আমি সোজা বিমান বন্দরে যেয়ে ড্রেপারকে বিদায় দিয়ে তখনই শহরে ফিরে এসে ইন্টারন্যাশনাল কমিটি অব জুরিস্ট-এর অফিসে যাই। সেখানে কমিটির সেক্রেটারী জেনারেল নিল ম্যাকডারমেটে-এর সঙ্গে দেখা করি। ম্যাকডারমেটে একজন বৃটিশ নাগরিক। তিনি পূর্বে বৃটিশ সরকারের মন্ত্রী ছিলেন। মানুষের মৌলিক অধিকারে বিশ্বাসী এই মানুষটির আন্তরিকতা ও সহানুভূতি সহজেই অনুভব করা যায়। তাঁর সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে দেখা করে তাঁকে আমাদের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাস এবং বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে জানাই।

ম্যাকডারমেটের সঙ্গে আমি প্রথম দিকেই যোগাযোগ করি এবং তিনি পাকিস্তানের প্রেসিডেন্টের কাছে টেলিগ্রাম পাঠিয়ে দিলেন। এবারে তিনি আমাকে সর্বতোপ্রকার সাহায্যের

আশ্বাস দেন। তিনি ঢাকা হাইকোর্টের প্রখ্যাত আইনবিদ সৈয়দ মোহাম্মদ হোসেনের নিরাপত্তার জন্য গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেন। গণতন্ত্রের একনিষ্ঠ সেবক এই মানুষটি দেশের বাইরে যাতে আসতে পারেন তার জন্য চেষ্টা করছেন বললেন। আমি তাঁকে এজন্য অশেষ কৃতজ্ঞতা জানাই।

ম্যাকডারমেটের অফিস থেকে ওয়ার্ল্ড ইউনিভার্সিটি সার্ভিসের অফিসে গেলাম। সেখানে সেক্রেটারী জেনারেল চিদামবরা নাথানের সঙ্গে দেখা করি। তাঁকেও সহানুভূতি ও সাহায্যের জন্য ধন্যবাদ জানাই। সেখানে অন্যান্য কর্মচারীর সঙ্গে তিনি আমার পরিচয় করিয়ে দেন।

সেদিন জেনেভায় থাকি। পরের দিন ৬ই আগষ্ট লন্ডনে ফিরে আসার আগেই সুইস পার্লামেন্টে প্রতিপত্তিশালী সদস্য জ্যো জিনল্যার এবং কয়েকজন সাংবাদিকদের সঙ্গে দেখা করি। জ্যো জিনলার সুইজারল্যান্ডে আমাদের যথেষ্ট সাহায্য করেছেন। পরের বার আমি জেনেভায় গেলে তাঁর আপিসে একটি সাংবাদিক সম্মেলন করি। সেসব কথা পরে বলবো।

এদিকে বাংলাদেশে জুলাই মাসের মাঝামাঝি থেকেই উৎপীড়নের মাত্রা বেড়ে গেল এবং সেই সঙ্গে মুক্তিযোদ্ধাদের তৎপরতাও বৃদ্ধি পায়। টাইমস পত্রিকায় চৌদ্দই জুলাইয়ের সম্পাদকীয়তে বিশিষ্ট বৃটিশ পার্লামেন্টারিয়ান আর্থার বটমলীর ঢাকাসহ কিছু জায়গা সফরের পর প্রদত্ত রিপোর্টের উল্লেখ করে বলা হয়, সন্ত্রাস সন্ত্রাসকেই স্থায়ী করে।

আন্তর্জাতিক জনমত সৃষ্টির কেন্দ্র লন্ডন। সেখানকার সবগুলো সংবাদপত্রে প্রতিদিন পাকিস্তানের নির্মমতার নতুন নতুন কাহিনী প্রকাশিত হতে থাকে।

পাকিস্তান সরকার খুবই ক্ষুব্ধ হয় এবং কমনওয়েলথ-এর সদস্যপদ ত্যাগ করার হুমকি দেয়। এসময় আমরা অবশ্য বিভিন্ন সমাবেশে বলি, 'পাকিস্তান কমনওয়েলথ-এর সদস্য থাকবে, না ত্যাগ করবে সেটা কথা নয়, পাকিস্তানকে কমনওয়েলথ-এর সদস্য থাকতে দেয়া কমনওয়েলথ-এর পক্ষেই লজ্জাজনক। এই প্রতিষ্ঠানের উচিত নির্মমতা, নিষ্ঠুরতা এবং অগণতান্ত্রিকতার জন্য পাকিস্তানের সদস্যপদ বাতিল করা।'

ছত্রিশ

বিশে জুলাই টাইমস-এ ঢাকা থেকে হেনরি ব্র্যাডশের প্রেরিত প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়। তাতে তিনি বলেন যে, সত্তরজন বাঙালী অফিসারকে পাকিস্তানীরা ধরে নিয়ে গেছে। তাঁদের কোন খোঁজ নেই। তিনি উল্লেখ করেন যে, ঢাকার একটি ব্যাংকের ডিরেক্টর ও আইনজীবী আবদুল আহাদেরও কোন খোঁজ-খবর নেই। তিনি বলেন যে, একজন বাঙালী কর্মচারী পাকিস্তানের

সৈন্যদের নিপীড়নের আরো অনেক কাহিনী তাঁর কাছে তুলে ধরেছেন। ব্র্যাডশের আরো জানান যে, ঢাকায় এসসো পেট্রোলের প্রধান আলমগীর রহমানেরও কোন খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না, তাঁকে ধরে নিয়ে গেছে। বাঙালী ভদ্রলোক ব্রাডশেরকে বলেন, 'আমরা বাঙালীরা কেউই জানি না, কখন পাকিস্তানী বাহিনী আমাদের ধরে নিয়ে যাবে।'

এই দুঃখজনক পরিস্থিতিতেও আশার আলো দেখতে পেলাম। ক্লেয়ার হেলিংওয়ার্থ প্রেরিত একটি খবর ডেইলি টেলিগ্রাফে প্রকাশিত হয় একুশে জুলাই। এই খবরে বলা হয় যে, সমগ্র ঢাকা শহরকে বাংলাদেশের গেরিলা বাহিনী সম্পূর্ণরূপে অন্ধকারাচ্ছন্ন করে রাখতে পেরেছেন। এই খবরে প্রবাসী বাঙালীরা খুবই গৌরব বোধ করেন। হেলিংওয়ার্থের আরেকটি প্রতিবেদন ডেইলি টেলিগ্রাফে প্রকাশিত হয় বাইশে জুলাই। তাতে উল্লেখ করা হয় যে, আওয়ামী লীগের নির্বাচিত সংসদ সদস্যদের কালো তালিকাভুক্ত করে তাঁদের সদস্যপদ বাতিল করা হয়েছে এবং এসব নির্বাচনী এলাকায় উপ-নির্বাচন অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। এইসব শূন্যপদে ধনলোভে কিছু লোক ভোটপ্রার্থী হয়েছে। এই খবরে প্রবাসী বাঙালীরা অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হন।

এই সময় ডেইলি টেলিগ্রাফ মারফত জানা যায়, ঢাকা শহরে পাঁচশ' বোমা নিক্ষিপ্ত হয়েছে। এই সংবাদে বাঙালীদের মধ্যে নতুন উৎসাহ ও উদ্দীপনার সৃষ্টি হয়। শুধু তাই নয়, প্রধান সেনাপতি এম, এ, জি ওসমানীর বরাত দিয়ে বলা হয় যে, মুক্তিযোদ্ধারা অন্ততঃ পনের হাজার পাকিস্তানী সৈন্য হত্যা করেছে এবং কমপক্ষে বিশ হাজার পাকিস্তানী গুরুতররূপে আহত হয়েছে। এই সাংবাদিক মুক্তিযোদ্ধাদের সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে আলাপ করে অভিমত প্রকাশ করেন যে, তাঁরা আরো বেশী সংখ্যক পাকিস্তানী সৈন্যকে পর্যুদস্ত করেছেন বলে তিনি মনে করেন। শুধু তাই নয়, ঢাকার বিভিন্ন রাস্তায় মুক্তিবাহিনী দেয়ালে, গাছে এবং পোস্ট বক্সে নাগরিকদের ঢাকা পরিত্যাগ করতে নির্দেশ দেয়। এসব খবরে প্রবাসী বাঙালীরা মুক্তিযোদ্ধাদের তৎপরতা, সাহসিকতা এবং দেশপ্রেমের সংবাদে জয় সুনিশ্চিত জেনে আশ্বস্তবোধ করেন।

বাংলাদেশে ইতিমধ্যে জাতিসংঘের একটি শান্তিবাহিনী স্থাপন এবং সংঘাত বিরতি পালনের প্রস্তাবকে আমরা অবাঞ্ছনীয় বলে বিবেচনা করি। আমাদের মতে, যখন বাঙালীদের হত্যা করা হচ্ছিল তখন এ ধরনের প্রস্তাব আসেনি, আর এখন বাঙালীদের জয়ের সময় যুদ্ধবিরতির কথা মনে হয়েছে।

জুলাই মাসের শেষের দিকে সামরিক আদালতে শেখ মুজিবের বিচারে আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য আমরা আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন আইনজীবী শোন ম্যাকব্রাইডকে প্রেরণ করি। তাঁর সঙ্গে বার্ণার্ড শেরিডেন সলিসিটার ফার্মের একজন সলিসিটারও যান। তাঁরা ইসলামাবাদে উচ্চ সরকারী পদে অধিষ্ঠিত কয়েকজন ব্যক্তির সঙ্গে দেখা করেন। ইয়াহিয়া খান দেখা করতে অস্বীকার করেন। তাঁরা অগত্যা ইয়াহিয়া খানের আইন উপদেষ্টা কর্ণেলিয়াসের সঙ্গে দেখা করেন। কর্ণেলিয়াস তাঁদের বলেন যে, কোন বিদেশী আইনজীবীকে শেখ মুজিবের সঙ্গে সাক্ষাৎ অথবা তাঁর পক্ষ সমর্থন করতে দেবেন না। ম্যাকব্রাইড আয়ারল্যান্ডের প্রাক্তন পররাষ্ট্রমন্ত্রী এবং তিনি কয়েক বছর আগে নোবেল শান্তি পুরস্কার পেয়েছেন। তাঁর

পাকিস্তানে গমনের সংবাদ সাতাশে জুলাই টাইমস পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। তিনি কয়েকদিন পর লন্ডনে ফিরে এসে তাঁকে শেখ মুজিবের পক্ষ সমর্থন করতে না দেয়ায় দুঃখ প্রকাশ করে বিবৃতি দেন।

আমরা আগেই শুনতে পেয়েছিলাম যে, আগষ্ট মাসের প্রথম দিকেই শেখ মুজিবের বিচার শুরু হবে এবং শোন ম্যাকব্রাইডকে হয়তো দেখা করতে দেবে না। তা সত্ত্বেও আমরা তাঁকে পাকিস্তানে প্রেরণ করি। ম্যাকব্রাইডকে শেখ মুজিবের পক্ষ সমর্থন করতে না দেয়ায় পাকিস্তানী দুরভিসন্ধি পৃথিবীর নিকট আরো স্পষ্ট হয়ে ওঠে। আমি অবশ্য তাঁকে ও সলিসিটারকে পাঠানোর আগে ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলামের সঙ্গে টেলিফোনে আলাপ করেছি। তিনি আমাকে বঙ্গবন্ধুর পক্ষ সমর্থনে যে কোন ব্যবস্থা গ্রহণে সম্মতি জ্ঞাপন করেন। আমি তাঁকে জানাই যে, তাঁদের যাতায়াত, হোটেল খরচ এবং কিছুটা নামমাত্র ফিস দিলেও বোধ করি তিন হাজার পাউন্ড খরচ হবে। তিনি বলেন, কাজ হোক বা না হোক বঙ্গবন্ধুর জন্য সকল রকম চেষ্টাই করতে হবে, তাতে যত খরচই হোক। ম্যাকব্রাইড এবং একজন সলিসিটার ইসলামাবাদে গিয়েছিলেন। আমি জানতাম আমি এই উত্তরই পাব।

এগারই আগষ্ট লন্ডনের হাইড পার্কে এক বিরাট জনসমাবেশ হয়। দুপুরের দিকেই দেখা যাচ্ছিল বৃটেনের নানা অঞ্চল থেকে অনেক কোচ বোঝাই করে বাঙালীরা দলে দলে এসে হাইড পার্ক মাঠে জমায়েত হচ্ছেন। ইংল্যান্ডের তো বটেই স্কটল্যান্ড থেকেও এই সভায় যোগদানের জন্য অনেকেই এসেছিলেন। এই সভায় বিদেশীদের সংখ্যাও ছিল অনেক। ঐদিন মানুষ বঙ্গবন্ধুর নিরাপত্তাহীনতার কথা ভেবে আবেগে প্রায় উন্মত্ত হয়ে ওঠে। তাদের মুখ-চোখে একদিকে শঙ্কা, অন্যদিকে দৃঢ়তা। যেমন করে হোক বাঙালী জাতির নেতার প্রাণরক্ষা করতেই হবে এই দৃঢ়প্রত্যয় সেদিন প্রতিভাত হয় সকলের মুখে-চোখে। এই সভায় আঞ্চলিক কমিটিগুলোর কয়েকজন নেতা সংক্ষিপ্ত বক্তব্যের মাধ্যমে এই দৃঢ়তা জ্ঞাপন করেন। তাছাড়া শেখ মান্নান এবং ব্যারিস্টার শাখাওয়াত হোসেনও পাকিস্তান সরকারকে সতর্ক করে দেন যে, বঙ্গবন্ধুর কোনরূপ ক্ষতি হলে সমগ্র বাঙালী জাতি অপরাধীর সমুচিত শাস্তির ব্যবস্থা করবে। এই সভায় লুৎফুল মতিন, ফজলুল হক চৌধুরী এবং আরো কয়েকজন পাকিস্তান সরকারের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে বাংলাদেশ সরকারের প্রতি আনুগত্য ঘোষণা করেন। এই সভায় বক্তৃতা করতে উঠে বঙ্গবন্ধুর মুক্তি দাবী করি। তাছাড়া আমি ঘোষণা করি, 'বঙ্গবন্ধুর নিরাপত্তা হানি বা জীবনের ক্ষতি হলে বাঙালী জাতি কোনদিন পাকিস্তানকে ক্ষমা করতে পারবে না। ক্ষমা শব্দটি বাঙালী চিরদিনের মতো ভুলে যাবে।' আমি এই কথাগুলো বলবার সময় এতটা উত্তেজিত হয়ে পড়ি যে, আমার পাশে যারা ছিলেন তাঁরা আমি যাতে পড়ে না যাই সেজন্য সতর্কতা অবলম্বন করেছিলেন।

সভার শেষে আমরা একটি শোভাযাত্রা নিয়ে দশ নম্বর ডাউনিং স্ট্রীটে যাই। এই সভার ও শোভাযাত্রার চলচ্চিত্র স্বাধীনতার পর ঢাকার টেলিভিশনে দেখানো হয়।

এই শোভাযাত্রা নিয়ে আগের দিন আমার অফিসে তুমুল আলোচনা হয়। আমি দশ তারিখে গোরিং স্ট্রীটের অফিসে বসে কাজ করছিলাম। এমন সময় কিছু ছাত্র এবং যুবক কর্মী

আমার অফিস রুমে প্রবেশ করল। তাঁরা সবাই পাকিস্তান হাইকমিশনের সামনে পরের দিন এই শোভাযাত্রাটি নিয়ে যাবার জন্য জোর দাবী জানান। আমি প্রায় প্রত্যেককে তাঁদের মতামত ব্যক্ত করতে অনুরোধ করি। এইভাবে প্রায় প্রত্যেকেই নিজ নিজ যুক্তি দিয়ে পাকিস্তান হাই কমিশনে যাওয়া সমর্থন করেন। সকলের কথা শেষ হবার পর আমি আস্তে আস্তে তাঁদের বুঝিয়ে বললাম যে, এই প্রস্তাবে স্বীকৃতি দেয়া আমার পক্ষে একেবারেই সম্ভব নয়। কেননা পাকিস্তান হাই কমিশনের সামনে উপস্থিত হলে কেউই নিজেকে ধরে রাখতে পারবে না এবং জনতা উত্তেজিত হয়ে হয়তো ঢিল ছুঁড়বে, এমনকি আগুনও দিতে পারে। তখন একজন ছাত্র জিজ্ঞেস করলো যে, তাতে ক্ষতিটা কি হবে। আমি বললাম, 'বৃটিশ সরকার কোন বিদেশী দূতাবাসে কোনরূপ আক্রমণ হতে দেবে না এবং যদি দূতাবাসের কোন ক্ষতি হয় তাহলে তাদের ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। এখন আমাদের এখানে একটি অফিস আছে, ঠিকানা আছে। আমাদের পরিচালিত শোভাযাত্রায় কোথাও শান্তিভঙ্গ হলে তার সকল দায়িত্ব আমাদের। পরের দেশে আমাদের আন্দোলন চালাতে দিচ্ছে এটাই যথেষ্ট। তারপরে আমরা যদি শান্তিভঙ্গের কারণ হয়ে দাঁড়াই তাহলে আমাদের ওপর থেকে সহানুভূতি চলে যাবে। দিনের পর দিন বৃটেনের সংবাদপত্রগুলো বাংলাদেশের ওপর পাকিস্তানের অত্যাচারের তীব্র নিন্দা প্রতিনিয়ত করে যাচ্ছে। আমরা যেন এদের এরূপ সমর্থনের যোগ্য নই, একথাও মনে হতে পারে। তারা বলবে, এরাও শান্তিভঙ্গ করে এবং উত্তেজনার কারণ সৃষ্টি করে।' এরপরেও একজন বললেন, 'আমরা অত্যন্ত সুশৃঙ্খল এবং শান্তিপূর্ণভাবে প্রতিবাদ জ্ঞাপন করব।' আমি বললাম, 'পাকিস্তান দূতাবাসের কাছে যেয়ে আমি নিজেই আমার ভেতরকার ক্রোধ সংবরণ করতে পারব না। আমার মনে পড়বে তারা দিনের পর দিন বাংলাদেশের মানুষের বাড়ীঘর পুড়িয়ে দিচ্ছে এবং স্বাভাবিকভাবেই আমি আর কিছু না হোক পাকিস্তানের প্রতীক যে দূতাবাস তাতে ঢিল ছুঁড়তে পারি এবং তখনই পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষ হবে, আমাদের বেশ কিছু লোক গ্রেফতার হবে, আন্দোলন বিদেশীদের সহানুভূতি হারাবে এবং সবচেয়ে বড় কথা বঙ্গবন্ধুর গোপন বিচারের বিষয় থেকে মানুষের দৃষ্টি চলে যাবে এসব ঘটনার দিকে।' এরপরেও হঠাৎ একজন বলে বসলেন, 'স্যার, আমাদের একবার পাকিস্তান দূতাবাসের সামনে যাবার অনুমতি দিয়ে দেখুন আমরা শান্তিভঙ্গ করি কিনা।' আমি হঠাৎ আমার স্বভাবের ব্যতিক্রম ঘটিয়ে বলে ফেললাম, "বেশ তাই হবে, কিন্তু তার আগে আপনাদের আন্দোলনের নেতৃত্ব বদলাতে হবে।" একথা শুনে যেন তারা কিছুটা স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। একটু চুপ করে থেকে বললেন, 'থাক স্যার, আপনি যে পথ দিয়ে শোভাযাত্রা নিয়ে যাওয়ার কথা ঠিক করেছেন সেই পথ দিয়েই যাবো।' আমি বললাম, 'অশেষ ধন্যবাদ। আপনারা লক্ষ্য রাখবেন যে, আগামীকাল আমাদের সভা বা শোভাযাত্রায় পাকিস্তানীরা যেন মিশে যেতে না পারে। তারা আমাদের মধ্যে ঢুকে যেয়ে গোলমালের সৃষ্টি করে আমাদেরকে এই দেশের সরকার ও জনসাধারণের কাছে অপ্রিয় করে তোলার চেষ্টা করতে পারে।

সেদিন সভার শেষে আমাদের শোভাযাত্রাটি অত্যন্ত শান্তিপূর্ণভাবে পরিচালিত ও সমাপ্ত হয়েছিল। এক বিরাট শোভাযাত্রা পিকাডেলি সার্কাসসহ বিভিন্ন স্থান পরিভ্রমণ করে দশ নম্বর

ডাউনিং স্ট্রীটে পৌঁছায়। এই বিরাট শোভাযাত্রা 'শেখ মুজিবের মুক্তি চাই,' 'বিচার প্রহসন বন্ধ কর', 'গণহত্যা বন্ধ কর' ইত্যাদি ধ্বনি ইংরেজী ভাষায় দিতে থাকে। পিটার শোর, মাইকেল বার্নস, ব্রুস ডগলাসম্যান, জনস্টোন হাউস এবং আরো বেশ কয়েকজন পার্লামেন্ট সদস্য শোভাযাত্রার প্রথম সারিতে আমাদের সঙ্গে ছিলেন।

বৃটিশ প্রধানমন্ত্রীর ঐতিহ্যবাহী বাসভবন দশ নম্বর ডাউনিং স্ট্রীটে উপস্থিত হয়ে দেখি, সেখানেও সাংবাদিকগণ এবং রেডিও-টিভি'র প্রতিনিধিবৃন্দ তাদের সরঞ্জাম নিয়ে আমাদের জন্য অপেক্ষা করছেন। প্রধানমন্ত্রীর সরকারী ভবন থেকে একজন অফিসার বেরিয়ে এলেন, তাঁর হাতে স্মারকপত্রটি দিয়ে আমি বললাম, 'শেখ মুজিব একটি স্বাধীন সার্বভৌম দেশের রাষ্ট্রপতি। তাঁর বিচার করার অধিকার কারো নেই। গোপন বিচার একেবারেই সভ্যতা বহির্ভূত। এই প্রহসন বন্ধ করার জন্য এবং শেখ মুজিবের অবিলম্বে মুক্তির জন্য বৃটিশ সরকার পাকিস্তানের স্বৈরাচারী সরকারের ওপর প্রভাব বিস্তার করবেন, এটাই আমাদের আশা।' এই বলে আমি সবাইকে ধন্যবাদ দিয়ে শোভাযাত্রার পরিসমাপ্তি ঘোষণা করি।

সভার পরের দিন অর্থাৎ ১১ই আগষ্ট আমি এগারো নম্বর গোরিং স্ট্রীটে বসে কাজ করছি। এমন সময় শোভাযাত্রার আগের দিন যাঁরা আমাকে পাকিস্তান দূতাবাসের সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শনের জন্য চাপ দিচ্ছিলেন তাঁদের বেশ কয়েকজন আমার সঙ্গে দেখা করেন। তাঁদের একজন বলেন, 'স্যার, কাল বৃটিশ পুলিশ আমাদের বারবার অভিনন্দন জানিয়েছে। তারা বলেছে, এই শোভাযাত্রার সঙ্গে কোন পুলিশের প্রয়োজন ছিল না।' আরেকজন বললেন, 'আমরা মাঝে মাঝেই এরকম দাবী করব। আমরা যা ভাল বুঝব তাই বলব। কিন্তু তাই বলে আপনি আমাদের কথায় যেন ভুল সিদ্ধান্ত না নেন। আপনি আমাদের আন্দোলনের জন্য যা ভাল হয় তাই করবেন।' আমি বললাম, 'আপনাদের অনেক ধন্যবাদ। দেখুন, আমি সম্পূর্ণরূপে গণতন্ত্রে বিশ্বাস করি। এবং সেই দিক থেকে সহকর্মীদের সঙ্গে আলোচনা করে যখনই সম্ভব সংখ্যাগুরুর মতবাদ অনুসারে কাজ করা কর্তব্য বলে মনে করি। কিন্তু এই ধরনের সিদ্ধান্তে (অর্থাৎ কোন রাস্তায় শোভাযাত্রা যাবে কি যাবে না) মূল লক্ষ্য থেকে ভ্রষ্ট হলে চলবে না। সেখানে কেউ যদি আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করেন যে, তেমন একটি সিদ্ধান্ত নিলে মূল লক্ষ্যে পৌঁছানোর পথে বিঘ্ন ঘটবে তাহলে কিছুতেই সেই সিদ্ধান্তে অংশ নিতে সে পারে না। আপনারা সেদিন দাবী প্রত্যাহার করায় এবং সব জিনিসটাই বন্ধুত্বপূর্ণ পরিবেশে সমাপ্ত হওয়ায় আমি আপনাদের কাছে কৃতজ্ঞ।'

আমাদের সভার পরদিন অর্থাৎ আগষ্ট মাসের ১২ তারিখে টাইমস পত্রিকায় শেখ মুজিবের বিচারকে উপলক্ষ করে প্রধান সম্পাদকীয় লেখা হয়। তিন কলামব্যাপী এই সম্পাদকীয়তে তাঁর গোপন সামরিক আদালতে বিচারের তীব্র নিন্দা করা হয়।

এই সম্পাদকীয় পড়ে আমাদের মনে হয়েছিল যে, বৃটেনের সবচেয়ে সুপ্রতিষ্ঠিত এবং রক্ষণশীল পত্রিকা টাইমসও শেখ মুজিবের মৃত্যুদন্ডাজ্ঞার মতো উন্মত্ততাকে অসম্ভব বলে মনে করছে না। তাই এই দীর্ঘ সম্পাদকীয়তে শেখ মুজিবকে মৃত্যুদন্ডাজ্ঞা দেয়ার পরিণতি ও ভয়াবহতা ব্যক্ত করা হয়েছে। তাছাড়া গোপন বিচারকে লজ্জাকর এবং অন্যায় বলে অভিহিত

করা হয় এবং তা করলে বিশ্ববাসীর কাছে পাকিস্তান নিজেকে হেয় করবে বলে উল্লেখ করা হয়। নানাদিক বিশ্লেষণের পরে উপসংহারে এসে বলা হয়, 'শেখ মুজিবের জীবন রক্ষার জন্য আমরা সর্বান্তকরণে অনুরোধ করছি।' অন্যান্য বৃটিশ পত্রিকায় অনুরূপ মত ব্যক্ত করা হয় এবং হাইড পার্কের বিরাট জনসভার ছবিও প্রকাশিত হয়।

তাছাড়া বিখ্যাত সাংবাদিক পিটার হ্যাসেল হারসটের পাঠানো একটি সংবাদও ১২ই আগস্টের টাইমস পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। তাতে তিনি জানান, বাংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধারা অনেক পশ্চিম পাকিস্তানীকে বন্দী করেছে। শেখ মুজিবের কোনরূপ শারীরিক ক্ষতি করলে তাদের একজনকেও প্রাণে বাঁচিয়ে রাখা হবে না বলে মুক্তিযোদ্ধারা ঘোষণা করেছে।

সাঁইত্রিশ

বৃটেনে পুরোদমে স্বাধীনতা আন্দোলন শুরু হয়ে যাওয়ার পর একটি কেন্দ্রীয় ফান্ড গঠনের প্রয়োজনীয়তা সকলেই অনুভব করেন। কেননা সমরাস্ত্র ছাড়া শুধু শোভাযাত্রা ও বক্তৃতায় দেশ স্বাধীন হবে না। তাছাড়া প্রত্যেক বাঙালী অর্থ সাহায্যের মাধ্যমে স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশগ্রহণ করতে পারেন এবং বাঙালীদের মধ্যে সক্রিয় সহযোগিতার মনোভাব সৃষ্টি করতে অর্থের প্রয়োজন অনুভূত হয়।

চব্বিশে এপ্রিল কভেনট্রির সভায় আশাতীত সাফল্যের ফলে স্টিয়ারিং কমিটি গঠন সম্ভব হল। ইতিমধ্যে প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমদ অস্ত্রের জন্য অর্থসংগ্রহের প্রয়োজনীয়তার কথা জানালেন। ফান্ড গঠনের ব্যাপারে আলাপ-আলোচনা শুরু করেই দেখা গেল যে, বোর্ড অব ট্রাস্টি গঠন করা সহজ নয়। স্টিয়ারিং কমিটি গঠনের ব্যাপারে যে জটিলতা সৃষ্টি হয়েছিল, আবার তার পুনরাবৃত্তির সম্ভাবনা দেখা গেল। তাই অনেকের কাছ থেকেই ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্য হওয়ার জন্য আমার ওপর চাপ সৃষ্টি হয়।

ফান্ড খোলার ব্যাপারে আরেকটি অসুবিধা দেখা দেয়। কোন ব্যাংকই "বাংলাদেশ ফান্ড" নামে একাউন্ট খুলতে রাজী হচ্ছিল না। অনেক চেষ্টার পর হ্যামব্রুজ ব্যাংক নামে একটি মার্চেন্ট ব্যাংক একাউন্ট খুলতে দিতে সম্মত হয়।

আটই মে গোরিং স্ট্রিটের অফিসে ইংল্যান্ড ও স্কটল্যান্ডের প্রতিনিধিবৃন্দের এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় হ্যামব্রুজ ব্যাংকে বাংলাদেশ ফান্ডের একাউন্ট খোলার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় এবং ট্রাস্টি বোর্ডের অন্য বাঙালী সদস্য নির্বাচনে মতদ্বৈততা দেখা দেওয়ায় দু'জন ইংরেজ—স্টোনহাউজ ও ডোনাল্ড চেজওয়ার্থ এবং আমাকে সর্বসম্মতিক্রমে ট্রাস্টি বোর্ডের

সদস্য করা হয়। অবশ্য পরে সদস্য সংখ্যা বাড়ানোর বিধান থাকে। কিন্তু ট্রাস্টি নেয়ার ব্যাপারে পরে চেষ্টা করা হলেও সর্বসম্মত নাম পাওয়া যায়নি।

একাউন্ট খোলার পর বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন সময়ে প্রতিষ্ঠিত সমিতিগুলোকে একাউন্ট নম্বর জানানো হয় এবং তাঁরা নিজ নিজ অঞ্চলের বাঙালীদের একাউন্ট নম্বর জানিয়ে দেন। সরাসরি ব্যাংকে অথবা উপরোক্ত সমিতিগুলোর মারফত টাকা জমা দেওয়ার ব্যবস্থা ছিল। কিছুদিন পরে আমরা আবার অসুবিধার সম্মুখীন হই। হ্যামব্রুজ ব্যাংক হঠাৎ আমাদের একাউন্ট বন্ধ করে দেবার কথা জানায় এবং অবিলম্বে অন্য ব্যাংকে অর্থ স্থানান্তর করতে বলে। টাকা অন্য ব্যাংকে জমা করা নিয়ে আমরা খুবই বিপদে পড়ি। অনেক চেষ্টার পর ন্যাশনাল ওয়েস্ট মিনিষ্টার ব্যাংক এবারে একাউন্ট খুলতে দিতে রাজী হয়। এভাবে এক গুরুতর সমস্যা থেকে আমরা রক্ষা পাই। একাউন্ট বন্ধ করার কারণ হিসাবে হ্যামব্রুজ ব্যাংক জানায় যে, একটি মার্চেন্ট ব্যাংকের পক্ষে এ ধরনের একাউন্ট ম্যানেজ করা কষ্টসাধ্য। কিন্তু যতদূর জানতে পেরেছি, আসল কারণ ছিল পাকিস্তান দূতাবাসের প্রতিবাদ। যাহোক, হ্যামব্রুজ ব্যাংকের একাউন্ট বন্ধ করার কথা এবং ন্যাশনাল ওয়েষ্ট মিনিষ্টার ব্যাংকে নতুন একাউন্ট খোলার কথা ও নম্বর ইত্যাদি বাঙালীদের মধ্যে পুনরায় প্রচার করা হয়। নানা অঞ্চলের সমিতিগুলোকে, সহযোগিতা করতে অনুরোধ করে তাঁদের আদায় করা অর্থ নতুন একাউন্টে জমা দিতে বলা হয়। হ্যামব্রুজ ব্যাংক অবশ্য স্বীকার করে যে, এই স্থানান্তরের পরেও কোন টাকা জমা হলে তারা সে টাকা তৎক্ষণাৎ ন্যাশনাল ওয়েষ্ট মিনিষ্টার ব্যাংকে পাঠিয়ে দেবে।

বলাবাহুল্য বহু পূর্বে প্রতিষ্ঠিত এই সমিতিগুলো প্রথম থেকেই নিজস্ব রশিদ বইয়ের মাধ্যমে চাঁদা তুলেছিলো। অবশ্য যে টাকা তাঁরা বাংলাদেশ ফান্ডের রশিদ বইয়ে তোলে সেটা ফান্ডে জমা দেয়। একবার অনুরোধ করা হয়েছিল যে, বাংলাদেশ ফান্ডের রশিদ বই ছাড়া আর কোন রশিদ বইয়ে যেন টাকা তোলা না হয়। কিন্তু বাস্তব অসুবিধার কথা উল্লেখ করে প্রায় সকল সমিতিই এ প্রস্তাবে অসম্মতি জানায়। তাঁরা বলেন, স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য স্থানীয়ভাবে আন্দোলন চালাতে অর্থের প্রয়োজনে তারা নিজেদের রশিদ বইয়ে টাকা তুলবেন। আর কেন্দ্রীয় প্রয়োজনে বাংলাদেশ ফান্ডের রশিদ বইয়ে টাকা তুলবেন। প্রসঙ্গতঃ একটি কথা বলা প্রয়োজন, বিভিন্ন সমিতি চাঁদা তুললেও তাঁরা বোর্ড অব ট্রাস্টির এজেন্ট ছিলেন না।

তখনকার অবস্থাটা বুঝতে হলে এটা মনে রাখতে হবে যে, সেটা ছিল যুদ্ধকালীন সময়। প্রায় সকল প্রবাসী বাঙালী স্বাধীনতা আন্দোলন সমর্থন করেছেন একথা আমি বার বার বলেছি। কিন্তু তাঁরা সমর্থন করতে বাধ্য ছিলেন না। আরো মনে রাখতে হবে যে, পাকিস্তান দূতাবাস আমাদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির জন্য নানাভাবে অনবরত চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিল। শেষ পর্যন্ত আমরা যে ঐক্য রক্ষা করতে পেরেছি তা দেশের প্রতি অকৃত্রিম ভালবাসার কারণেই। এ প্রসঙ্গে ১৯৮০ সালে ঢাকার একটি সাপ্তাহিক পত্রিকায় অভিযোগ করা হয় যে, আমাদের কেন্দ্রীয় কমান্ড শক্ত ছিলনা। এর চেয়ে বেশী শক্ত কি করে হতে পারত আমি জানি না। তাছাড়াও

এই ফান্ডের ব্যাপারে ঐ পত্রিকাটি কিছুটা সন্দেহ প্রকাশ করেছে। যদিও সাধারণতঃ এসব মিথ্যা নিন্দা ও গ্লানির উত্তর দেওয়ার প্রয়োজন বোধ করি না, কিন্তু পত্রিকাটির প্রতিষ্ঠার কথা বিবেচনা করে আমি বিষয়টির সকল দিক বুঝিয়ে ঐ সাপ্তাহিকেই একটি নিবন্ধ প্রেরণ করি এবং সেটি ঐ পত্রিকায় যথাসময়ে প্রকাশিত হয়।

আমার ধারণা, কমান্ড বেশী শক্ত করতে গেলে সদ্য প্রতিষ্ঠিত ঐক্যের বন্ধন ছিঁড়ে যেতে পারত এবং কভেনট্রিতে অনুষ্ঠিত সভার পূর্বের অবস্থায় ফিরে আসত। এই নাজুক অবস্থায় ঐক্য রক্ষার জন্য আমাদের যে কতটা ধৈর্য ও বিবেচনা দেখাতে হয়েছে সেকথা বোঝানো যাবে না। অবশ্য এটাও স্বীকার করতে হবে যে, স্থানীয় সমিতিগুলোকে প্রত্যহ আন্দোলন চালাতে, সভা-সমিতি করতে যথেষ্ট টাকার প্রয়োজন ছিল; সেকথা চিন্তা করেও তাঁদের নিজস্ব কাজের জন্য টাকা তোলা বন্ধ করা সম্ভব ছিল না। কমিটিগুলো যদি শুধুমাত্র কেন্দ্রীয় ফান্ডের জন্য টাকা তুলতো তাহলে তাঁদের খরচের জন্য স্টিয়ারিং কমিটি থেকে টাকা দিতে হতো। তাহলে শুধু এই কাজের জন্যই বিরাট সচিবালয় প্রতিষ্ঠা করতে হতো। সারা বৃটেনে নানা অঞ্চলের সমিতির আন্দোলনের কাজে অসুবিধা হবে একথা খুব জোর দিয়ে বলেন সমিতিগুলোর প্রতিনিধিবৃন্দ। এই সমিতিগুলো আমাদের সহযোগিতা করলেও এগুলো ছিল স্বায়ত্তশাসিত। তাই তারা নিজেদের খরচ বহনের জন্য তাদের রশিদ বইয়ে চাঁদা তুলতো।

যাহোক, ১৯৭২ সালের ত্রিশে সেপ্টেম্বর বাংলাদেশ ফান্ডের অডিট রিপোর্ট এবং হিসাব বাংলাদেশ সরকারের প্রেসে ছাপা হয় (বিজিপি-৭২-৭৩-৩১৯৫ ডি-১ এম)। এই রিপোর্টটি 'বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ ঃ দলিলপত্র'-এর চতুর্থ খন্ডেও (পৃষ্ঠা ৭৭৬-৮০৩) প্রকাশিত হয়েছে। ১৯৭২ সালের ত্রিশে সেপ্টেম্বর অব্যবহিত পরেই বাংলাদেশ সরকারের অর্থমন্ত্রণালয়সহ অন্যান্য মন্ত্রণালয়ে অডিট করা রিপোর্ট পাঠানো হয়। লন্ডনস্থ বাংলাদেশ দূতাবাস মারফত আঞ্চলিক সমিতিগুলোকেও রিপোর্ট পাঠানো হয়। উক্ত রিপোর্টে বলা হয় যে, উনিশ শ' একাত্তর সালের একত্রিশে ডিসেম্বর পর্যন্ত বিভিন্ন কমিটির নিকট প্রায় একলাখ পাউন্ড পাওনা ছিল। সেসব সমিতিকে টাকা বাংলাদেশ ফান্ডের একাউন্টে জমা দেয়ার জন্য তাগিদ দান চলতে থাকে। আমার নিজের তখন বাংলাদেশ ছেড়ে লন্ডন যাওয়া সম্ভব ছিল না বলে বাংলাদেশেই লন্ডনস্থ প্রথম রাষ্ট্রদূত সৈয়দ আব্দুস সুলতানকে এ কাজের ভার দেওয়া হয়। তিনি এবং উক্ত দূতাবাসের ফাইন্যান্স ডিরেক্টর লুৎফুল মতিন অনেক চেষ্টা করে উনিশ শ' বাহাত্তর সনের ত্রিশে সেপ্টেম্বরের আগে প্রায় একলাখ পাউন্ড এবং রশিদ বই ফেরত নেন। এই ফান্ডের মোট চার লাখ বার হাজার তিরাশি পাউন্ড ছাব্বিশ পেনি আদায় হয়। তার মধ্যে মোট তিন লাখ আটাত্তর হাজার আটশ' একাত্তর পাউন্ড একুশ পেনি বাংলাদেশ সরকারকে অর্থ মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে প্রদান করা হয়। স্বাধীনতা অর্জনের পর এই টাকাটাই বাংলাদেশ সরকারের প্রথম বৈদেশিক মুদ্রা। চেকের মাধ্যমে কয়েক দফায় দেওয়া হয়। প্রথম চেকটি গ্রহণ করেছিলেন বঙ্গবন্ধু। তিনি এই চেকটি অর্থ মন্ত্রণালয়ে পাঠিয়ে দেন। বোর্ড অব ট্রাস্টি নয় মাসের আন্দোলনে ব্যয় করেছিলেন প্রায় ১১ হাজার চারশ' ত্রিশ পাউন্ড। স্টিয়ারিং কমিটি সংগ্রাম পরিচালনায় খরচ করেছিলেন একুশ হাজার সাতশ' বিরাশি পাউন্ড পাঁচ পেনি।

বাংলাদেশ ফান্ড থেকেই সেই টাকা দেয়া হয়। বাংলাদেশ ফান্ডের অডিট রিপোর্টের সংক্ষিপ্তসার ১৯৭২ সালের ত্রিশে সেপ্টেম্বরের অব্যবহিত পরে ঢাকার দৈনিক পত্রিকাগুলোতে প্রকাশিত হয়েছিল।

একটু আগেই বলেছি, আন্দোলন পরিচালনা করতে গিয়ে ট্রাস্টিগণ এগার হাজার চারশ' ত্রিশ পাউন্ড খরচ করেছেন। এই অর্থ কোন খাতে খরচ হয়েছে বলছি। ইসলামাবাদে বঙ্গবন্ধুর বিচারে তাঁকে সমর্থন করার জন্য শোন ম্যাকব্রাইড এবং অন্য আইনবিদদের পাঠানো হয়েছিল। সে বাবদে খরচ হয় তিন হাজার দু'শ পঞ্চাশ পাউন্ড। বিভিন্ন পত্রিকার বিজ্ঞাপনী প্রচারণা বাবদ খরচ হয় দু'হাজার আটশ' সাত পাউন্ড পঞ্চাশ পেনি, মুক্তিবাহিনীর কাছে পাঠানোর উদ্দেশ্যে কিছু দ্রব্য ক্রয় বাবদ খরচ হয় নয়শ' আটষট্টি পাউন্ড আটাত্তর পেনি, কয়েকটি কমিটিকে আন্দোলন পরিচালনার জন্য আর্থিক সাহায্য প্রদান করা হয় দু'হাজার দু'শ' পাউন্ড, নানা স্থানে প্রতিনিধি প্রেরণে খরচ হয়েছে দু'হাজার একশ' একানব্বই পাউন্ড বাইশ পেনি। ব্যাংক চার্জ দিতে হয়েছে বার পাউন্ড পঞ্চাশ পেনি। এইভাবে মোট এগার হাজার চারশ' ত্রিশ পাউন্ড ট্রাস্টিগণের সরাসরি অনুমোদনে ব্যয়িত হয়।

স্টিয়ারিং কমিটি নয় মাসে আন্দোলন পরিচালনা বাবদ একুশ হাজার সাতশ' বিরাশি পাউন্ড পাঁচ পেনি খরচ করেছে। বাড়ী ভাড়া, চিঠিপত্র প্রেরণ, কাগজ-পত্র ক্রয়, প্রকাশনা, সভার আয়োজন, প্রচার পত্রিকা, টেলিফোন, টেলিগ্রাম, যাতায়াত খরচ, মুজিবনগর থেকে আগত প্রতিনিধিদের জন্য ব্যয় ইত্যাদি বাবদ এই টাকা খরচ হয়। নয় মাসে স্টিয়ারিং কমিটি মাত্র একুশ হাজার সাতশ' বিরাশি পাউন্ড পাঁচ পেনি খরচ করে কাজ চালাতে পেরেছেন এই কারণে যে, ছাত্র এবং অন্য কর্মীবৃন্দ অনেকেই নিজের খরচ নিজে বহন করে আন্দোলনের কাজে নিজেদের নিয়োগ করেছিলেন। দূরে কোথাও যেতে হলে অত্যন্ত কম খরচে তাঁরা কাজ সম্পন্ন করেছেন। বাংলাদেশ ফান্ড থেকে স্টিয়ারিং কমিটির সদস্যবৃন্দ, ট্রাস্টিবৃন্দ এবং আমি নিজে ব্যক্তিগত খরচ বাবদ কোন অর্থ গ্রহণ করিনি।

স্বাধীনতার পর 'বৃটিশ-বাংলাদেশ ট্রাস্ট' নামে একটি ব্যাংক স্থাপন করেন জন স্টোনহাউস। এই ব্যাংকের সঙ্গে বাংলাদেশ ফান্ডের বিন্দুমাত্র সম্পর্ক নেই। আমাদের একাউন্টের নাম ছিল 'বাংলাদেশ ফান্ড।' ফান্ডের নামে 'ট্রাস্ট' শব্দটিও ছিল না এবং সেটি 'ব্যাংক'ও ছিল না। শুধুমাত্র বাংলাদেশ ছাড়া স্টোনহাউস প্রতিষ্ঠিত ব্যাংকের নামের সঙ্গে আর কোন সাদৃশ্য নেই। 'বৃটিশ-বাংলাদেশ ট্রাস্ট ব্যাংক' এবং অন্যান্য ব্যাপারে স্টোন হাউস ১৯৭৫ সালে অভিযুক্ত হন এবং বিচারে তার শাস্তি হয়। তিনি কিংবা আর কেউ বাংলাদেশ ফান্ডের জমা দেওয়া টাকা আত্মসাত করেননি। কয়েকজন বাঙালীর অনুরোধে জেম জনসন নামে একজন বৃটিশ পার্লামেন্ট সদস্য তদানীন্তন বৃটিশ সলিসিটার জেনারেল রাইট অনারেবল পিটার আর্চারের কাছে বাংলাদেশ ফান্ড সম্পর্কে জানতে চান। সলিসিটার জেনারেল বৃটিশ মন্ত্রী ও পার্লামেন্ট সদস্য এবং ফৌজদারী মামলার সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষ। তিনি ১৯৭৬ সালের নভেম্বরে লেখা এক চিঠিতে জেম জনসনকে যে উত্তর দেন তা এরকম ঃ

ROYAL COURTS OF JUSTICE
LONDON WC2A 2LL

November, 1976

Further to our conversations on the subject of the Bangladesh Fund, you may wish to know that the police have concluded a long and searching enquiry into the affairs of the Fund, but in the view of the Director of Public Prosecutions, no evidence has emerged which would justify a prosecution against anyone.

I have studied the position carefully, and agree with the D.P.P.

James Johnson, Esq., M.P.,
House of Commons,
London SW1A OAA

এছাড়া বৃটিশ সরকারের ডিপার্টমেন্ট অব ট্রেড মাইকেল সেরারড কিউ, সি এবং ইয়ান হে ডিভিশন এফসিএ দ্বারা একটি তদন্ত কমিটি গঠন করেন। এই কমিটি জন স্টোন হাউস কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত বৃটিশ–বাংলাদেশ ট্রাস্ট লিমিটেড ইত্যাদির হিসাব পরীক্ষা করেন। তাঁরাও তাঁদের রিপোর্টে বাংলাদেশ ফান্ড সম্পর্কে নিম্নলিখিত মন্তব্য করেন ঃ

The Bangladesh Fund

22 Mr. Stonehouse was one of three trustees of the Bangladesh Fund- sometimes known as the Banlgadesh Relief Fund. We were aware of rumours in the Press that he might have misappropriated or made use of the funds of that charity. Although not Strictly within our terms of reference, we kept a weather-eye open for any evidence or improper dealings with the funds of that charity or the possible mixing of such funds by Mr. Stonehouse: but our work did not reveal any hint of wrong going in this connection. We have seen many witneses hostile to Mr. Stonehouse: not one of them has suggested that he interfered in any way with charity monies. It is only fair to Mr. Stonehouse to any that, so far as our investigations can show, such rumours are without foundation.

We completed out report-on 31st march,1977.

Ian Hay Davison
Michael Sherrard Q.C. Ian Hay Davison. P.C.A.

আমার মনে হয় সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রতিষ্ঠানের নামে সাদৃশ্যের জন্য কারো কারো মনে বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়েছে। 'বাংলাদেশ ফান্ড' সৃষ্টি হয়েছিল স্বাধীনতা সংগ্রামের সময়, অর্থাৎ ১৯৭১ সনে। চার্টার্ড একাউন্টেন্ট ১৯৭২ সনের ৩০ শে সেপ্টেমবর এর অডিট রিপোর্ট প্রকাশ করেন। অন্যপক্ষে স্বাধীনতা অর্জনের বেশ কিছুদিন পরে জন স্টোনহাউস 'বৃটিশ–বাংলাদেশ

ROYAL COURTS OF JUSTICE.

LONDON. WC2A 2LL

SOLICITOR GENERAL

01-405 7641 Extn 3407

5 November, 1976

Dear Jim,

Further to our conversations on the subject of the Bangladesh Fund, you may wish to know that the police have concluded a long and searching enquiry into the affairs of the Fund, but in the view of the Director of Public Prosecutions, no evidence has emerged which would justify a prosecution against anyone.

I have studied the position carefully, and agree with the D.P.P.

James Johnson, Esq., M.P.,
House of Commons,
London SW1A 0AA

ট্রাস্ট ব্যাংক' স্থাপন করেন। এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে বাংলাদেশ সরকার বা আমার কোন প্রকার সম্পর্ক ছিল না।

আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় জন স্টোনহাউসকে আমাদের সাহায্যার্থে কঠোর পরিশ্রম করতে দেখেছি। স্বাধীনতা অর্জিত হবার পরে তিনি অন্য প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তাঁর কার্যকলাপের জন্য দন্ডিত হয়েছেন; কিন্তু স্বাধীনতা যুদ্ধ চলার সময় তাঁর আচার-ব্যবহারে এর বিন্দুমাত্র আভাস ছিল, এমন কথা কেউ বলতে পারবেন না।

আটত্রিশ

আগষ্ট মাস আমাদের স্বাধীনতা আন্দোলনের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। চারদিক থেকেই সাহায্য এবং সহানুভূতির খবর আসছিল। এক কথায় বলতে গেলে আন্দোলন যথেষ্ট নৈতিক শক্তিতে বলীয়ান হয়ে ওঠে। মার্চের শেষে শত্রু ঢাকায় চরম আঘাত হানে। আহত বাঙালী বাংলাদেশে এবং সারা বিশ্বে আত্মসম্ভ্রমবোধে জেগে ওঠে। মানবিকতাকে যাঁরা জীবনের আদর্শরূপে গ্রহণ করেছে, তাঁরা শুধু বাঙালীদের মৌখিক দু'একটি উৎসাহের বাণী বলেই কর্তব্য শেষ করছেন না, তাঁদের সহানুভূতি যাতে বাস্তব ক্ষেত্রেও ফলপ্রসূ হয় সেদিকে তাঁরা এগিয়ে আসছিলেন। তাঁদের এই সহানুভূতি কর্মক্ষেত্রেও নানা জায়গায় বিভিন্নরূপ গ্রহণ করে। আগষ্ট মাসের দিকে একথা সকলের কাছেই স্পষ্ট হয়ে দেখা দেয় যে, পাকিস্তান ভেঙ্গে গেছে। এই ভেঙ্গে যাওয়া কাঁচ আর কখনো জোড়া লাগবে না। বিশ্বব্যাপী এই সুসংহত প্রতিবাদের মুখে দিশেহারা হয়ে পাকিস্তান বাঙালী জাতির শক্তির উৎসকে অপসারণ করার এক ভ্রান্তপথ বেছে নেয়। তাদের এই দিশেহারা ভাবের পরিণতি দেখতে পাই শেখ মুজিবের বিচার প্রহসনে। বাঙালীদের সাংগঠনিক দুর্বলতা এবং একতায় যেটুকু ফাঁক ছিল তা একেবারে অপসারিত হয় শেখ মুজিবের জীবন শঙ্কার দুঃসহ সংবাদে। পাকিস্তানের চিন্তাধারায় একটি কথা কখনো ধরা পড়ল না যে, শেখ মুজিব জাতির প্রাণে ক্রমাগত শক্তি সঞ্চয়ের যে উৎস রচনা করেছিলেন তা ছিল ধ্বংসাতীত। তাই পাকিস্তানী সামরিক জান্তার একথা উপলব্ধি করা সম্ভব ছিল না যে, শেখ মুজিবের দেহ ধ্বংস করে তাঁর শক্তি ধ্বংস করাতো যাবেই না, বরং যথেষ্ট বৃদ্ধি পাবে সেই শক্তি। তাঁকে ধ্বংস করার প্রথম পদক্ষেপরূপে শুরু হলো বিচারের প্রহসন। এর একমাত্র ফল দেখতে পেলাম পৃথিবীর গণতন্ত্রমনা মানুষের স্বাভাবিকভাবে জাগ্রত মানবিক ঐক্যবোধ।

মে মাসে বৃটিশ পার্লামেন্টে আমাদের স্বাধীনতা আন্দোলন যুক্তিসঙ্গত, একথা অনেক সদস্যই বলেছেন। তারপর বিভিন্ন দেশে আমাদের প্রতি সহানুভূতি জানিয়ে বহু বিবৃতি

প্রকাশিত হয়েছে। ফ্রান্সের বিখ্যাত দার্শনিক আঁদ্রে মালরো প্রকাশ্যে আমাদের প্রতি সহানুভূতি জানিয়েছেন। মার্কিন পার্লামেন্টে (হাউস অব রিপ্রেজেন্টেটিভস) কংগ্রেসম্যান গ্যালাখার প্রস্তাব করেন পাকিস্তানকে অর্থনৈতিক ও সকল প্রকার সামরিক সাহায্য স্থগিত করার জন্য। যদিও জুলাই মাসে হেনরি কিসিঞ্জার পাকিস্তানে গমন করেন এবং সেখানে সামরিক সাহায্য দেওয়ার আশ্বাস দিয়ে আসেন। শুধু গ্যালাখার নন, বৃটিশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী লর্ড হিউম জুন মাসেই বলেন যে, পাকিস্তানে স্থিতিশীলতা না আসা পর্যন্ত সকল প্রকার সাহায্য বন্ধ রাখা কর্তব্য।

মার্কিন সিনেটের বিশিষ্ট সদস্য সিনেটর স্যামমবি চার্চ পাকিস্তানকে সামরিক সাহায্য দেওয়ার তীব্র প্রতিবাদ করেন। জুলাই মাসে নিউইয়র্ক টাইমস-এ একথাও প্রকাশিত হয় যে, 'পূর্ব পাকিস্তানে' নৈরাজ্য বিরাজ করছে। বর্তমান পৃথিবীর ক্ষয়িষ্ণু সভ্যতার কথা মনে হলে আমরা পৃথিবীব্যাপী যে সুসংহত সহানুভূতি লাভ করছিলাম তা ভেবে অবাক হতে হয়। জাহাজে করে পাকিস্তানে সমর উপকরণ যাচ্ছে, এই খবর প্রকাশিত হবার পর গণতন্ত্রে বিশ্বাসী মানুষের কাছে যুক্তরাষ্ট্রের মর্যাদাহানি ঘটে, বিশেষ করে ভারতের কাছে। ভারতের কাছ থেকে আমেরিকাকে লাভ করতে হয় তীব্র প্রতিবাদ।

এই আগস্ট মাসের প্রথম দিকেই ওয়াশিংটনে পাকিস্তান দূতাবাসের বাঙালী অফিসার এ, এম, এ মুহিত, এস, এ, করিম, এনায়েত করিম। এম, এ কিবরিয়া, এ, আর চৌধুরী, আবু রুশদ মতিনউদ্দীন, এস, এম, আলী প্রমুখ পাকিস্তানের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করেন।

উনচল্লিশ

ইংল্যান্ডে বাঙালী পরিচালিত অনেকগুলো সমিতি ছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও 'এ্যাকশন বাংলাদেশ' নামে একটি প্রতিষ্ঠান শুধুমাত্র ইংরেজ তরুণ-তরুণীদের নিয়েই গঠিত হয়। এর কমিটির প্রধান ছিলেন পল কনেট। তাঁর কর্মক্ষমতা, নিষ্ঠা এবং মানবপ্রেম আমাকে অভিভূত করেছে। বেশ কিছুদিন থেকেই পল কনেট আমাদের আন্দোলনের সমর্থনে সারাক্ষণ কাজ করে আসছিলেন। তাঁকে কখনো প্রবাসী বাঙালীরা বিদেশী মনে করতেন না। এই তরুণ শিক্ষক কর্মের দ্বারা তাঁদের জয় করেছিলেন। 'এ্যাকশন বাংলাদেশ' পহেলা আগস্ট ট্রাফালগার স্কোয়ারে বিরাট জন সমাবেশের আয়োজন করে। সভাস্থলে তিল ধারণের জায়গা ছিলনা। ট্রাফালগার স্কোয়ারের চার দিকের ফুটপাতগুলোতে অসংখ্য লোক দাঁড়িয়ে ছিলেন। তেমনি ট্রাফালগার স্কোয়ারের সামনে অবস্থিত ন্যাশনাল আর্ট গ্যালারীর বারান্দাগুলোও ছিল লোকে পূর্ণ। সে দৃশ্য

লন্ডনবাসীদের কাছে ছিল খুব আশ্চর্যজনক। কেননা লন্ডন শহরে বড় সভা হয় না। সেখানকার জনসভাগুলো আমাদের দেশের সেমিনারের মত।

পহেলা আগষ্ট 'এ্যাকশন বাংলাদেশ' কর্তৃক আয়োজিত এই সভায় অভূতপূর্ব উদ্দীপনা দেখতে পাই। এই সভায় রওনা হবার অল্পক্ষণ পূর্বে পাকিস্তান দূতাবাসের সেকেন্ড সেক্রেটারী মহিউদ্দিন আহমেদ বাংলাদেশ সরকারের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করতে প্রস্তুত একথা ফোনে জানান। এখানে পাকিস্তান সরকারে কর্মরত কূটনীতিবিদদের মধ্যে সমগ্র ইউরোপে মহিউদ্দিন আহমেদই প্রথম পাকিস্তানের সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ করেন। সে কারণেই অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম এবং প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন টেলিগ্রামে আমার মারফত তাঁকে শুভেচ্ছা জানান। আমি তাঁকে ধন্যবাদ দিয়ে কয়েক মিনিট পর ফোন করব বললাম। এরপর আমি গোরিং স্ট্রিটে আমাদের অফিসে ফোন করে এ খবর দিয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে জানাই। আমি মিনিট পাঁচেক পরে ফোন করে মহিউদ্দিনকে আমার বাসায় চলে আসতে বলি। তিনি অল্পক্ষণ পরেই তাঁর স্ত্রী সোহেল আখতার পান্নাকে সঙ্গে করে আমার বাসায় চলে আসেন। একটু পরেই মহিউদ্দিনকে নিয়ে আমি ট্রাফালগার স্কোয়ারের সভায় চলে যাই। তাঁর বাড়ী একেবারে খালি থাকায় এবং তিনি ঘোষণা দেয়ার পর তাঁর বাড়ীর উপর হামলা হতে পারে আশঙ্কায় আমি স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের পিটার ল্যাঙ্গলীকে ফোন করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধ জানাই। তিনি তৎক্ষণাৎ তাতে সম্মত হন।

আমি দশই এপ্রিল বিবিসিতে যখন সাক্ষাৎকার দিতে যাই তখনই অবশ্য মহিউদ্দিন বলে ছিলেন যে, তিনি আমার দিক থেকে নির্দেশের অপেক্ষা করছেন।

ট্রাফালগার স্কোয়ারের সভায় মহিউদ্দিন তাঁর বক্তৃতায় ঘোষণা করেন যে, তিনি পাকিস্তান সরকারের সঙ্গে সকল সম্পর্ক ত্যাগ করলেন। তাঁর এই ঘোষণা খুবই উদ্দীপনার সৃষ্টি করে। মহিউদ্দিন তাঁর বক্তৃতায় বাংলাদেশ সরকারের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেন। বর্তমানে তিনি বাংলাদেশ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অন্যতম মহাপরিচালক (ডিরেক্টর জেনারেল)।

এই সময় আমাদের আন্দোলন যেমন জোরদার হচ্ছিল শত্রুপক্ষের তৎপরতাও তেমনি বাড়ছিল। তারা আমাদের ঐক্যে ভাঙ্গন ধরাবার জন্য প্রচার করছিল যে, মুজিবনগর সরকার আপোষের চেষ্টা চালাচ্ছেন। এই কথাটা আগেও উঠেছে। আমি এর তীব্র প্রতিবাদ করেছি। আমি যখন এর প্রতিবাদ করি তখন নিজেও বিশ্বাস করেছিলাম যে, প্রচারণাটি সৰ্বৈব মিথ্যা। সে কারণেই আমি অত জোর দিয়ে প্রতিবাদ করতে পেরেছি। স্বাধীনতা অর্জনের পর অবশ্য শুনেছিলাম যে, মুজিবনগর সরকারের পক্ষ থেকে নয়, তবে মুজিবনগর সরকারের কয়েকজন ব্যক্তিগতভাবে আপোষ সম্পর্কে আলাপ-আলোচনা চালিয়ে ছিলেন। এ ব্যাপারে প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিনের সঙ্গে টেলিফোনে সে সময় আমার কথা হলে তিনিও বলেন যে, এই প্রচারণা সৰ্বৈব মিথ্যা, এবং আমাদের কর্মীদের মনে এরূপ ধারণা যাতে কোনভাবেই স্থান না পায় সে ব্যাপারে আমাকে সতর্ক থাকতে হবে। তিনি নিজেও এ সম্পর্কে খুবই সর্তক আছেন বলে জানালেন। যাহোক, পহেলা আগষ্ট আমি যখন এই প্রচারণার প্রতিবাদ করি তখন একে আমি পাকিস্তানী মিথ্যা প্রচারণা বলেই মনে করেছি। তাই সেদিন আমি মুজিবনগর সরকারের

পক্ষ থেকে কেউ যেন পাকিস্তানের মিথ্যা প্রচারণার দ্বারা বিভ্রান্ত না হন সে আহবান জানাই। আমি আরো ঘোষণা করি, 'বাংলাদেশের পূত-পবিত্র ভূমি থেকে হানাদার পাক বাহিনীদের সম্পূর্ণ বিতাড়িত না করা পর্যন্ত আমাদের আপোষহীন, বিরামহীন সংগ্রাম চলবে। এই সংগ্রাম সাড়ে সাত কোটি বাঙালীর সংগ্রাম। মুজিবনগর সরকার নজরুল ইসলাম—তাজউদ্দিনের পরিচালনায় সেই ইচ্ছাকে পূর্ণ করার দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। বাংলাদেশ স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র। সেই সার্বভৌমত্বের প্রশ্নে আপোষ করার অধিকার কোন সরকারের নেই। এবং মুজিবনগর সরকার কোন রূপ আপোষের কথা একেবারেই চিন্তা করছেন না। বাংলাদেশকে শত্রুমুক্ত করাই মুজিবনগর সরকারের একমাত্র কর্তব্য ও দায়িত্ব। বাংলাদেশের মানুষের পক্ষে কথা বলার অধিকার একমাত্র মুজিবনগর সরকারেরই আছে, আর কারো নেই। এমনকি ভারত সরকারেরও নেই।' আমি এই কথাগুলো বলার সময় সমবেত জনতা মুহুর্মুহু করতালির দ্বারা সমর্থন জানাচ্ছিল। এই সভায় শোন ম্যাকব্রাইড বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে পাকিস্তান থেকে ব্যর্থ হয়ে ফিরে এসেছেন জানানো হলে, সকলেই শেম, শেম, বলে তীব্র নিন্দা প্রকাশ করেন। আমি সভায় আরো বলি, 'আজ থেকে আপনারা কেউ পাকিস্তান এয়ার লাইন্স অর্থাৎ পিআইএ-তে ভ্রমণ করবেন না। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে আমি আপনাদের এই আবেদন জানাচ্ছি। পরাধীনতার শৃঙ্খল একেবারেই ছিন্ন হয়ে গেছে। আপনারা যাঁরা পিআইএ-র বিমান বয়কট করার সিদ্ধান্তে সমর্থন জানান তাঁরা হাত তুলুন।' এই কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র জনতা দু'হাত তুলে দাঁড়ান। এই সভায় অনেক বিদেশী উপস্থিত ছিলেন। তাঁরা আমাদের ঐক্য দেখে স্তম্ভিত হয়েছেন।

এই সভায় অত্যন্ত উদ্দীপনাময় বক্তৃতা দেন পল কনেট। তাঁর মুখে চোখে এবং বাচনভঙ্গিতে প্রতিফলিত হচ্ছিল বন্ধুত্ব, প্রীতি, একাগ্রতা ও আন্তরিকতা। তিনি বলেন, 'বাংলাদেশের সংগ্রামী মানুষের পাশে রয়েছেন বিশ্বের সকল দেশের, সকল ধর্মের, সকল বর্ণের মুক্তিকামী মানুষ। এই যুদ্ধ পাকিস্তানের বিরুদ্ধে বাঙালীর নয়, এই যুদ্ধ স্বাধীনতা হরণকারীদের বিরুদ্ধে মুক্তিকামী মানুষের। আপনাদের এই আদর্শের সংগ্রামের সঙ্গে আমরা সম্পূর্ণ একাত্মতা ঘোষণা করছি।'

এই সভায় অশোক সেন (বর্তমানে ভারতের আইনমন্ত্রী) বাঙালীর সংগ্রাম এবং একনিষ্ঠ দেশপ্রেমের কথা গর্বের সঙ্গে উল্লেখ করেন। বৃটিশ পার্লামেন্টের সদস্য ব্রুস ডগলাসম্যান, পিটার শোর, জন স্টোনহাউজ এবং ফেনার ব্রুকওয়ে বক্তৃতা করেন। এছাড়া লর্ড সিফার্ড অত্যন্ত জোরালো ভাষায় সমর্থন জ্ঞাপন করেন।

পঁচিশে এপ্রিল কভেনট্রিতে অনুষ্ঠিত ঐতিহাসিক সভার সভানেত্রী হিসাবে বেগম লুলু বিলকিস বানু অতি প্রাঞ্জল ভাষায় একটি মর্মস্পর্শী বক্তৃতা দেন। এই বিদূষী মহিলা মুক্তিযুদ্ধের সূচনা থেকেই লন্ডনস্থ বাঙালী মহিলা সমিতির কর্মপ্রবাহের সংক্ষিপ্ত বিবরণী দেন। মহিলাদের সংগ্রামী ভূমিকা আমাদের গৌরব দান করেছে।

সেদিন এ সভায় এমনই উত্তেজনা ছিল যে, আমার একটি করে বাক্য শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তুমুল করতালির দ্বারা উপস্থিত জনতা সংগ্রামের প্রতি সমর্থন জানান। বাঙালীদের ঐক্য

দেখে আমি অভিভূত হয়ে তাঁদেরকে কৃতজ্ঞতা জানাই। এই সভায় বৃটিশ পার্লামেন্টের বহু সদস্য উপস্থিত ছিলেন। সভার শেষে একটি শোভাযাত্রা করে আমরা দশ নম্বর ডাইনিং স্ট্রিটে গিয়ে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দান এবং শেখ মুজিবের মুক্তির জন্য পাকিস্তান সরকারকে চাপ দিতে বৃটিশ প্রধানমন্ত্রীকে স্মারক লিপি দেই। তিনি সেদিন লন্ডনের বাইরে ছিলেন। তাঁর পক্ষ থেকে তাঁর ব্যক্তিগত সচিবালয়ের একজন কর্মকর্তা এটি গ্রহণ করেন। এখানেও অপেক্ষমান সাংবাদিকদের কাছে আমি একটি ছোট ভাষণে বৃটিশ জনগণ ও সংবাদপত্রের এবং রাজনীতিবিদদের সহযোগিতার জন্য ধন্যবাদ জানাই। এখানেও আমাদের সঙ্গে পিটার শোর, জন স্টোনহাউস, পার্লামেন্টের বেশ কয়েকজন সদস্য উপস্থিত ছিলেন।

বৃটেনে অসংখ্য বাঙালী সপরিবারের বাস করেন। জাতির এই দুর্দিনে মহিলারাও ঘরে বসে ছিলেন না। পঁচিশে মার্চের খবরের পর তাঁরাও সংঘবদ্ধ হন। আঠাশে মার্চ লেডবেরী রোডে জেবুন্নেসা বখসের বাড়ীতে নেতৃস্থানীয় মহিলারা সমবেত হন। তাঁরা ঐদিনই বাংলাদেশ উইমেন্স এসোসিয়েশন (মহিলা সমিতি) গঠন করেন। সমিতির সভানেত্রী হন জেবুন্নেসা বখস। এরপর থেকেই শুরু হয় তাঁদের কাজ এবং আমাদের প্রতিটি সভাতেই মহিলা সমিতি যোগদান করেছে ও নানাভাবে সহযোগিতা করেছে। তাঁরা পোস্টার লিখেছেন, প্রচার পত্রিকা প্রকাশ করেছেন এবং হাউস অব কমন্সে যেয়ে বৃটিশ পার্লামেন্ট সদস্যদের সঙ্গে সাক্ষাৎকারে আন্দোলনের প্রতি সমর্থন কামনা করেছেন। এই সমিতির জনসংযোগের দায়িত্ব বিশেষ ভাবে গ্রহণ করেন ফেরদৌস রহমান, আনোয়ারা জাহান ও মুন্নী রহমান। তাছাড়া সমিতির প্রায় সার্বক্ষণিক কাজে নিয়োজিত ছিলেন সাবেতা চৌধুরী, কুলসুম উল্লাহ, তাহেরা কাজী, শেফালী হক, বেগম রকিব এবং আরো অনেকে।

চল্লিশ

আগস্টের মাঝামাঝি ওয়ালডরফ এ্যাসটোরিয়া হোটেলে ইন্টারন্যাশনাল ফ্রেন্ডশীপ এসোসিয়েশন একটি প্রীতি অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। এসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে পুলিন বিহারী শীল (পি, বি, শীল) ও গিয়াসউদ্দীন মিয়া আমাকে প্রধান অতিথি হতে আমন্ত্রণ জানান। এই সংগঠনের সদস্য বিভিন্ন দেশের নাগরিক। গিয়াস উদ্দিন মিয়া বাঙালী। বহুদিন থেকে লন্ডনে, চিকিৎসা পেশায় নিয়োজিত। তিনি আমাদের আন্দোলনের সমর্থনে কাজ করছিলেন। তবে বিশেষভাবে জড়িত ছিলেন ইন্টারন্যাশনাল ফ্রেন্ডশীপ এসোসিয়েশনের সঙ্গে।

এই এসোসিয়েশনের প্রাণকেন্দ্রে ছিলেন পি,বি, শীল। তাঁর সম্বন্ধে কিছু বলি। তিনি বাঙালী। চট্টগ্রামের অধিবাসী। কিন্তু বহুদিন থেকে বৃটিশ নাগরিক হিসেবে বৃটেনেই জীবনযাপন করছেন। ত্রিশের দশকে অর্থাৎ ইংরেজ শাসনামলে অধ্যয়নের উদ্দেশ্যে বিলেতে এসেছিলেন। এখানেই এক বৃটিশ মহিলাকে বিয়ে করে বসবাস করছেন। পেশাগতভাবে তিনি সাংবাদিক। তবে ১৯৭১ সালে তার বয়স সত্তর অতিক্রম করেছে। সুভাষ চন্দ্র বসু এবং জওহর লাল নেহরুর সঙ্গে প্রথম জীবনেই বেশ বন্ধুত্ব ছিল তাঁর। সেই সময়ের কিছু চিঠিপত্র তিনি আমাকে দেখিয়েছেন। তাতে বোঝা যায়, যৌবনে ইউরোপে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন জোরদার করার চেষ্টা করেছেন। মরিশাসের প্রধানমন্ত্রী স্যার সিউ সাগর রাম গোলামের সঙ্গেও তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব হয় ছাত্র জীবনে।

আমি পি, বি, শীল এবং গিয়াসউদ্দীন মিয়াকে এরূপ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে অযথা তাঁদের সংগঠনের অর্থ ব্যয় করতে নিষেধ করি। এর জবাবে পি. বি. শীল বললেন যে, এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে নানা দেশের রাষ্ট্রদূতদের নিমন্ত্রণ জানানো হবে এবং আমি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের প্রতিনিধিরূপে উপস্থিত থাকব। এভাবে আমাদের সরকারকে অন্যান্য সরকারের কাছাকাছি আনাই তাঁদের উদ্দেশ্য। আমি শেষ পর্যন্ত সম্মত হই।

এই অনুষ্ঠানে মুসলিম দেশের রাষ্ট্রদূত ছাড়া সব অঞ্চলের রাষ্ট্রদূতই উপস্থিত ছিলেন। পূর্ব ইউরোপের প্রায় সকলেই এসেছিলেন। সাইপ্রাস, কিউবা, মরিশাস-এর রাষ্ট্রদূতগণ অনুষ্ঠানকে সাফল্যমন্ডিত করার ব্যাপারেও অংশ গ্রহণ করেন। এছাড়া বৃটিশ পার্লামেন্টের অনেক সাংবাদিক অনুষ্ঠানে যোগ দেন। ভারতের রাষ্ট্রদূত তাঁর ডেপুটি হাই কমিশনারকে পাঠান।

এই অনুষ্ঠানে আমি একটি ছোট বক্তৃতার মাধ্যমে আমাদের আন্দোলন সমর্থনের জন্য সবাইকে ধন্যবাদ জানাই। কয়েকজন রাষ্ট্রদূত এবং বৃটিশ পার্লামেন্টের সদস্য বাংলাদেশের জনগণের কল্যাণ কামনা করে বক্তৃতা করেন।

এই অনুষ্ঠানের সমস্ত ব্যয় স্বাগতিক সংগঠনই বহন করে। সেদিন পি,বি,শীলের রচিত একটি প্রচারপত্রও বিতরণ করা হয়। তাঁর প্রচারপত্রটি ছিল সহজ সরল ইংরেজী ভাষায়। প্রথম পৃষ্ঠায় একজন শিল্পীকে দিয়ে দৈত্যের ছবি আঁকিয়েছেন। সেখানে একটি নিরীহ মানুষের বুকে দৈত্যটি তরবারি ঢুকিয়ে দিচ্ছে। বলা বাহুল্য দৈত্যটির মুখের সঙ্গে ইয়াহিয়া খানের মুখের সাদৃশ্য বুঝতে কষ্ট করতে হয় না। আর এই ছবিটির শিরোনামে লেখা ছিল 'গভর্নম্যান্ট বাই মার্ডার' অর্থাৎ হত্যার দ্বারা শাসন। প্রচারপত্রটির ব্যাপক চাহিদা হওয়ায় তাঁদের এটি পুনর্মুদ্রণ করতে হয়েছিল।

একচল্লিশ

এবার মরিশাসের প্রধানমন্ত্রীর কথা কিছু বলতে চাই। তিনি ১৯৭০ সালে ঢাকা রাষ্ট্রীয় সফরে আসেন। সে সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট হলে আমি তাঁকে সম্বর্ধনা জানাই। পরে ভাইস চ্যান্সেলর হাউসে তিনি একটি চা চক্রে মিলিত হয়েছিলেন। তিনি সকলের মনে সেই একদিনেই একজন উদারমনা প্রীতিপূর্ণ মানুষের ছবি এঁকে দিয়ে যান।

পি,বি, শীলের কাছ থেকে খবর পেয়ে চৌদ্দই মে সকাল সাড়ে দশটায় লন্ডনে হোটেলে গিয়ে মরিশাসের প্রধানমন্ত্রী স্যার সিউ সাগরের সঙ্গে দেখা করি। পি, বি, শীল সঙ্গে ছিলেন। স্যার সিউ সাগর বলেন যে, পঁচিশে মার্চের খবর পাওয়ার পরেই বাংলাদেশের জন্য এবং আমার ও আমার পরিবারের জন্য তিনি খুব উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন। কিছুদিন পরে আমি যখন প্যারিসে যাই তখন তিনিও সেখানে।

সে সময় তাঁর সঙ্গে আমি একটি দিন অতিবাহিত করি। এবারও সঙ্গে ছিলেন পি, বি, শীল। আমি স্যার সিউ সাগরকে অনুরোধ করলাম বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়ার জন্য। তিনি বললেন, 'আমাদের পার্লামেন্টে মুসলমান সদস্য সংখ্যা কম নয়। তাদের সমন্বয়েই আমার সরকার গঠিত। দলের সম্মতি ছাড়া প্রধানমন্ত্রী এ জাতীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারেন না। আমি নিজে স্বীকৃতি দিতে আগ্রহী, কিন্তু দলের মুসলমান সদস্যদের কাছ থেকে সম্মতি পেতে হবে। স্যার আবদুর রাজ্জাক আমার কৃষিমন্ত্রী। তিনি শিগগিরই সরকারী কাজে লন্ডনে আসবেন। তাঁকে আপনারা যদি সম্মত করাতে পারেন তাহলে স্বীকৃতি দিতে আর কোন অসুবিধা হবে না। স্যার সিউ সাগরের প্যারিস ত্যাগের সময় আমি তাঁর হোটেলে ছিলাম। তিনি আমাকে সঙ্গে করে বিমান বন্দরে নিয়ে এলেন এবং ভি আই পি রুমে সকলের নিকট আমাকে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রতিনিধিরূপে পরিচয় করিয়ে দিলেন। এও এক ধরনের স্বীকৃতি নয়কি ?

কিছুদিন পর স্যার আবদুর রাজ্জাক লন্ডনে এলেন। আমি তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গেলে অত্যন্ত সৌজন্যপূর্ণ এবং বিনয়নম্র ব্যবহার করেন। চুপ করে আমার সব কথা শোনেন এবং শেষ পর্যন্ত খুব শান্তভাবে বলেন যে, পাকিস্তানের অঙ্গচ্ছেদের কোন ব্যাপারে তিনি সম্মতি দিতে পারবেন না। সেদিন তাঁর কাছে ব্যর্থ না হলে ভারতের বহু আগেই মরিশাস বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেবার গৌরব অর্জন করতে পারত।

অক্টোবরের শেষের দিকে আবদুর রাজ্জাক আবার লন্ডনে আসেন। সে সময় আর্জেন্টিয়ায় পাকিস্তানের রাষ্ট্রদূত আবদুল মোমেন পাকিস্তানের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে

আমাদের লন্ডনস্থ দূতাবাসে যোগ দিয়েছেন। আমি তাঁকে গল্পোচ্ছলে আবদুর রাজ্জাকের কথা বললে তিনি তাঁর সঙ্গে দেখা করতে খুব আগ্রহ প্রকাশ করেন। আমি মোমেনকে সঙ্গে করে দ্বিতীয়বার আবদুর রাজ্জাকের সঙ্গে দেখা করি। এবারে আমি ইচ্ছে করেই আবদুল মোমেনকে আমাদের বিষয়টা বুঝিয়ে বলার সুযোগ দেই। আমি ছিলাম শ্রোতা। আবদুর রাজ্জাককে ঠিক আগের মতোই দেখলাম। সব কথা চুপ করে শুনে তিনি বললেন, 'পাকিস্তানকে ভেঙ্গে দেওয়া ঠিক হবে না। অতীতের অন্যায় ক্ষমা করে নতুন পরিবেশ সৃষ্টি করতে এগিয়ে যেতে হবে'। আমরা আবার ব্যর্থ হয়ে ফিরে এলাম। কিন্তু তাঁর বলার ভঙ্গি এবং নম্রতার জন্য কোন তিক্ততার সৃষ্টি হলো না। দু'দিকেই ছিল পরমত সহিষ্ণুতা। আবদুল মোমেন কিছু দিন আগে বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূতরূপে অবসর গ্রহণ করে ঢাকার আছেন।

বিয়াল্লিশ

আগষ্ট মাসের একটি ঘটনার কথা উল্লেখ না করে পারছি না। লন্ডনে স্বাধীনতা আন্দোলনের পক্ষে এক ভদ্রলোক কাজ করতেন। তিনি শাখাওয়াত হোসেন, আবদুল মান্নান, ডাঃ জোয়ারদার এবং আমাকে আগষ্ট মাসের তৃতীয় সপ্তাহে তাঁর বাড়ীতে নিমন্ত্রণ করলেন। বললেন, ঢাকা থেকে এক ভদ্রলোক এসেছেন। তিনি আমাদের সঙ্গে দেখা করতে চান। ঢাকা থেকে আগত ভদ্রলোকটি আমার কাছে প্রস্তাব করলেন যে, মুক্তিবাহিনীর কিছু সদস্য পাট রপ্তানী শুরু করলে ভাল লাভ হবে। এবং সেই অর্থ আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের কাজে লাগবে। মুক্তিবাহিনীর পক্ষে সেই সময় পাটের ব্যবসা করা সম্ভব নয়, সেকথা তাঁকে বুঝিয়ে দিলাম। তাঁর প্রস্তাব গ্রহণযোগ্য নয় একথা অল্পক্ষণেই বুঝেছিলাম। তাই বিশেষ আলোচনা করারও প্রয়োজন বোধ করিনি। আমি সেদিনই বাড়ীতে ফেরার সময় শেখ মান্নানকে বলেছিলাম যে, এই ভদ্রলোকের সঙ্গে আমাদের দেখা করতে যাওয়া ঠিক হয়নি। কারণ তিনি কয়েক দিনের মধ্যেই দেশে ফিরবেন বললেন। যেখানে অন্য বাঙালীরা ঢাকায় আসতে অত্যন্ত ভীত, সেখানে তার মধ্যে কোন ভীতির চিহ্ন না দেখাটা আমার কাছে খুব অস্বাভাবিক লেগেছিল। একপর্যায়ে তিনি আমাকে বলেন যে, আমার বাড়ীঘর ঠিকই আছে। তিনি ঢাকা চলে যাবার কিছুদিন পরই খবর পেলাম যে, পাকিস্তান হানাদার বাহিনী আমার টাঙ্গাইলের বাড়ীতে যেয়ে প্রথমে লুট করে পরে আগুন লাগায় এবং বাড়ীর গেটে দাঁড় করিয়ে ম্যানেজার শামসুদ্দোহাকে (মুচু মিয়া) গুলী করে হত্যা করে। আমার ঢাকার বাসাটিও কিছুদিন পরে তারা লুট করে অলঙ্কারাদিসহ সমস্ত জিনিস নিয়ে যায়। লন্ডনে এই দেখা করার সঙ্গে আমার দুই

বাড়ীর ওপরে হামলা ও লুটতরাজের কোন সম্বন্ধ নাও থাকতে পারে। ব্যাপারটি হয়তো বা একেবারেই কাকতালীয়।

তেতাল্লিশ

একুশে আগষ্ট সকালবেলা আমি হঠাৎ ইরাকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রদূত আবুল ফতেহ'র কাছ থেকে টেলিফোন পেলাম। তিনি ইরাক থেকে কাউকে কিছু না বলে লন্ডনে চলে এসেছেন। তিনি লন্ডন থেকে বাংলাদেশ সরকারের প্রতি আনুগত্য ঘোষণা করবেন বলে জানালেন। কোন মুসলিম রাষ্ট্র থেকে এটা করা নিরাপদ ছিল না। আমি তাঁকে আন্তরিক মোবারকবাদ জানালাম। তখনই আমি গোরিং স্ট্রিটের অফিসে টেলিফোন করে সেদিন অপরাহ্নেই সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করতে বললাম। যথাসময়ে সাংবাদিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হলো। সম্মেলনে সাংবাদিক ছাড়াও অনেক বাঙালী কর্মী উপস্থিত ছিলেন। আমি ফতেহকে সাংবাদিকদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবার পর তিনি একটি ছোট বক্তৃতা দিয়ে বাংলাদেশ সরকারের প্রতি আনুগত্য এবং স্বাধীনতা সংগ্রামে যোগদানের কথা ঘোষণা করেন। আবুল ফতেহ'র যোগদানের কথা আমি সেদিনই টেলিগ্রাম করে মুজিবনগর সরকারকে জানালাম। আবুল ফতেহ ইরাকে পাকিস্তানের রাষ্টদূত ছিলেন। পাকিস্তান দূতাবাসের ব্যাংক একাউন্টের অর্থ রাষ্ট্রদূত আবুল ফতেহ'র একার দস্তখতে ওঠানো যেত। ইরাকের রাজধানী বাগদাদ ত্যাগ করার দিনে তিনি তাঁর দূতাবাস থেকে বেরিয়ে সোজা ব্যাংকে যান। ব্যাংকে হাজার পঁচিশেক পাউন্ড জমা ছিল। তিনি সমস্ত অর্থ তুলে ভারতীয় রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে দেখা করেন। এবং তাঁকে মুজিবনগর সরকারের কাছে সমুদয় অর্থ পাঠিয়ে দিতে অনুরোধ করেন। ভারতীয় রাষ্ট্রদূত এতে সম্মত হলে তিনি তাঁর নিকট পাউন্ডগুলো দিয়ে লন্ডনে চলে আসেন। ভারতীয় রাষ্ট্রদূত সেগুলো পরে মুজিবনগর সরকারের কাছে পাঠিয়ে দেন।

রাষ্টদূত আবুল ফতেহ'র পাউন্ড তোলা সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত রক্ষণশীল কার্যক্রমের অন্তর্গত নয়। কিন্তু সেদিনকার নানা দুঃসহ ও দুর্দৈবের মধ্যে অন্ততঃ এ ব্যাপারে পাকিস্তান সরকারকে কিছুটা শিক্ষা দেওয়া হয়েছে মনে করে লন্ডনের বাঙালীরা সন্তুষ্ট হয়েছিলেন। পাকিস্তান আমাদের রপ্তানীকৃত পাটের দ্বারা অর্জিত বিদেশী মুদ্রা আটকিয়েছে এবং সকল অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেই আমাদের প্রাপ্য অংশ থেকে বঞ্চিত করেছে। অতএব, যে অর্থ যুদ্ধাবস্থায় আমাদের হাতে পড়েছে তা ন্যায়সঙ্গতভাবে মুজিবনগর সরকার আটক করতে পারেন। আবুল ফতেহ এই অর্থ নিজের প্রয়োজনে লাগাননি। তিনি সমুদয় অর্থ যে সরকারকে বৈধ বলে মনে করেন

সেই সরকারে অর্পণ করেছেন। এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আবুল ফতেহ এই কাজের জন্য মুজিবনগর সরকার ও বাঙালীদের সমর্থন ও প্রশংসা অর্জন করেন।

পহেলা আগষ্ট ট্রাফালগার স্কোয়ারে অনুষ্ঠিত জনসভায় আমি ঘোষণা করি যে, মুজিব নগর সরকার লন্ডনে কয়েক দিনের মধ্যেই একটি দূতাবাস স্থাপন করছেন। আমার ইচ্ছা ছিল আবুল ফতেহ'র মতো একজন অভিজ্ঞ রাষ্ট্রদূত লন্ডনে আমার কাজের সহায়তার জন্য যেন থাকেন। দূতাবাস স্থাপিত হবার পর তিনি কয়েকদিন অফিসে এসেও ছিলেন। এমন সময় বৃটিশ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে ফোনে আমাদের জানানো হয় যে, আবুল ফতেহ'র বিরুদ্ধে পাকিস্তান হাইকমিশন একটি অভিযোগ প্রেরণ করেছে। ইরাকের ব্যাংক থেকে পাকিস্তান সরকারের অর্থ তুলে নিয়ে আসার অভিযোগে তাকে পাকিস্তান সরকারের কাছে অর্পণ করার সরাসরি অনুরোধ আসার সম্ভাবনা আছে বলে আমাদের জানানো হয়। আবুল ফতেহ, সৈয়দ নজরুল ইসলাম এবং অন্যান্য নেতার সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য এমনিতেই মুজিবনগরে যেতে চাচ্ছিলেন। এই ফোনের পরে অবিলম্বে তাঁর মুজিবনগর চলে যাওয়া ভাল মনে করি। তিনি কয়েক দিনের মধ্যেই মুজিবনগর চলে যান। যাবার আগে তিনি বৃটিশ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের সঙ্গে দেখা করে যান।

১লা আগষ্ট ট্রাফালগার স্কোয়ারে শুধুমাত্র বিরাট জনসভা হয়নি, সেদিন থেকে 'বাংলাদেশ টু-ডে' নামে একটি মুখপত্র (নিউজ বুলেটিন) প্রকাশনা শুরু হয়। ২রা আগস্ট আমেরিকার বিখ্যাত সাপ্তাহিক ম্যাগাজিন নিউজ উইক-এর প্রচ্ছদে একজন দুস্থ বাঙালী বালকের ছবি ছাপানো হয়। তার পাশে লেখা ছিল, 'একটি জাতির হত্যা'। এই সংখ্যাটিতে বাংলাদেশের মানুষের অবর্ণনীয় দুর্দশার কাহিনী লিপিবদ্ধ হয়। এতে বঙ্গবন্ধুর সাতই মার্চের জনসভায় তোলা ছবিটিও মুদ্রিত হয়।

আগষ্ট মাসে পৃথিবীর নানাপ্রান্ত থেকে শেখ মুজিবের জীবনরক্ষার জন্য আবেদন করা হয়। দশই আগষ্ট তাঁর গোপন বিচার শুরু হবার পর এই তৎপরতা পৃথিবীর সর্বত্র বৃদ্ধি পায়। ভারত সরকার আনুষ্ঠানিকভাবে জাতিসংঘের নিকট এই বেআইনী বিচার বন্ধ করার জন্য সর্বপ্রকার পদক্ষেপ গ্রহণের দাবী জানান। এই সময় কমনওয়েলথ সেক্রেন্টারীয়েটের সেক্রেন্টারী জেনারেল আর্নল্ড স্মিথ পাকিস্তান এবং ভারত ভ্রমণ করেন।

চুয়াল্লিশ

ছাব্বিশে জুলাই বৃটিশ পার্লামেন্টের হাউস অব কমন্সের হারকোট কক্ষে বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে ডাকটিকেটের প্রকাশনা উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। এই টিকেট প্রকাশের একটি গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক দিক ছিল। এই টিকেট প্রকাশের দ্বারা মুজিবনগর সরকার বাংলাদেশে রাষ্ট্র পরিচালনা করছেন বিদেশে এরূপ ধারণা সমর্থন পায়। এই ডাকটিকেটগুলোর ডিজাইন করেছেন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন শিল্পী বিমান মল্লিক। উনিশ শ' উনসত্তর সালে বৃটেন কর্তৃক প্রকাশিত গান্ধী স্মৃতি ডাকটিকেটের অলঙ্করণও তিনিই করেছিলেন। বাংলাদেশের ডাকটিকেটের একটিতে বাংলাদেশের মানচিত্র ছিল, অন্যটিতে ছিল ব্যালটবক্স। ব্যালটবক্স গণতন্ত্রের প্রতীক। আরেকটি টিকেটে শিকল ভাঙ্গার ছবি। এর দ্বারা বলা হয়েছে বাংলাদেশ পাকিস্তানের পরাধীনতা থেকে মুক্ত হয়েছে। একটি টিকেটে ছিল বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতি। আরেকটি ডাকটিকেটে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে রক্ত ছড়ানো দেখানো হয়েছে।

এই টিকেটের প্রকাশনা উৎসবে পার্লামেন্টের সকল দলের অনেক সদস্য উপস্থিত ছিলেন। পার্লামেন্টের অনুরূপ অনুষ্ঠানের জন্য বেশ কয়েকটি কক্ষ আছে। এই কক্ষগুলো স্পীকারের অনুমতিসাপেক্ষে একজন সদস্য তাঁর নিজের নামে বরাদ্দ নিয়ে অনুষ্ঠানের আয়োজন করতে পারেন। সেভাবে জন স্টোনহাউস এই কক্ষটি তাঁর নামে বরাদ্দ করিয়ে নেন। অনুষ্ঠানে পিটার শোর, জন স্টোনহাউস এবং আরো কয়েকজন পার্লামেন্ট সদস্য বাংলাদেশের স্বাধীনতা সমর্থন করে বক্তৃতা করেন। বৃটিশ পার্লামেন্ট ভবনে অন্য দেশের স্বাধীনতা সমর্থনে এরূপ বেসরকারী সভার নজির আমার জানা নেই। বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে আমি সমবেত পার্লামেন্ট সদস্য, সম্মানিত অতিথি ও সাংবাদিকবৃন্দকে ধন্যবাদ জানাই। শিল্পী বিমান মল্লিক এই ডাকটিকেটগুলোতে যে চিন্তাশীলতার পরিচয় দিয়েছেন সেজন্য তাকে অভিনন্দন জানাই।

পার্লামেন্ট সদস্য জন স্টোনহাউস শরণার্থীদের অবস্থা পর্যবেক্ষণ এবং বাংলাদেশের নেতৃবৃন্দের সঙ্গে পরামর্শের জন্য 'ওয়ার অন ওয়ান্ট'-এর পক্ষ থেকে কয়েকবার মুজিবনগর যান। সেখানে প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমদ এবং অন্যান্য মন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনার সময় ডাকটিকেট প্রকাশনার একটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। এই ব্যাপারে জন স্টোনহাউস সরাসরি মুজিবনগর সরকারের নির্দেশে ও দায়িত্বে কাজ করছিলেন। বাংলাদেশ ফান্ড বা স্টিয়ারিং কমিটি ডাকটিকেট বাবদ কোন অর্থ ব্যয় করেনি। তবে আমাদের আঞ্চলিক কমিটির অনেক নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি প্রকাশনা উৎসবে উপস্থিত ছিলেন। স্টোন হাউস স্টিয়ারিং কমিটিকেও নিমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। স্টোনহাউস ডাকটিকেটগুলো মুজিবনগর সরকারের নিকট পাঠিয়েছেন এবং ইউরোপে বিতরণের ব্যবস্থা করেছেন। ডাকটিকেট তৈরির একটি বৃটিশ

প্রতিষ্ঠানের দ্বারা তিনি সকল কাজ করেছেন, এর খরচও ঐ প্রতিষ্ঠান বহন করেছে। এর বিক্রয়লব্ধ অর্থ এই প্রতিষ্ঠান গ্রহণ করেছে এবং আয়-ব্যয়ের হিসেব মুজিবনগর সরকারকে দেওয়ার দায়িত্ব তাদেরই ছিল। টিকেট প্রকাশের পাঁচ মাসের মধ্যে বাংলাদেশ স্বাধীনতা লাভ করে। আগস্ট মাসের পরে আমাকে অনেক সময়ই ইউরোপ-আমেরিকায় থাকতে হয়েছে। একারণে নিজে থেকেও টিকেটের ব্যাপারে কোন খবরাখবর রাখতে পারিনি এবং মুজিবনগর সরকারের নিকট থেকে কোন নির্দেশও পাইনি।

জুলাই মাসের শেষে বিখ্যাত মার্কিন রাজনীতিবিদ, প্রাক্তন সিনেটর ইউজিন ম্যাকার্থী লন্ডনে আসেন। তিনি লন্ডনের অন্যতম সেরা হোটেল ডরচ্যাস্টারে একত্রিশে জুলাই একটি সাংবাদিক সম্মেলন করেন। সেই সম্মেলনে তিনি বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনকে জোরালো ভাষায় সমর্থন জানান। আমাদের ট্রাফালগার স্কোয়ারের জনসভাতেও তাঁর উপস্থিত হওয়ার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু অত্যন্ত জরুরী কাজে তাকে আগের দিন অপরাহ্নে যুক্তরাষ্ট্রে ফিরে যেতে হয়।

পঁয়তাল্লিশ

আগষ্ট মাসেই ভারতীয় রাজনীতিবিদ কৃষ্ণ মেনন লন্ডনে আসেন। বৃটেনের কাছ থেকে স্বাধীনতা অর্জনের জন্য তিনি লন্ডনেই আন্দোলন চালিয়েছেন। সে সময়েই পন্ডিত জওহর লাল নেহেরুর সঙ্গে তাঁর গভীর বন্ধুত্ব হয়। রূঢ় সত্য বলতে তিনি কখনো দ্বিধা করতেন না। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি ছিলেন কূশাগ্রবুদ্ধি। আমি নিজেও দেখেছি একটি কথা উত্থাপন করতেই তিনি বিষয়টির একেবারে মূল ব্যাখ্যা সহজ ভাষায় দিয়ে ফেলতেন। সৌজন্যের প্রচলিত রীতি তাঁর মত ব্যক্ত করার পথে বাধা হয়ে উঠত না। এ কারণেই অনেকে তাঁকে ভয় করতেন।

আমি উনিশ শ' উনষাট সালে জাতিসংঘে কৃষ্ণ মেননের বক্তৃতা শুনেছি। আমি সেবার জাতিসংঘের সাধারণ অধিবেশনে পাকিস্তানের প্রতিনিধি ছিলাম এবং আইন বিষয়ক অর্থাৎ ষষ্ঠ কমিটির দায়িত্ব আমার ওপর অর্পিত হয়েছিল। আইনের ব্যাখ্যা দিয়ে আমার একটি বক্তৃতার পর তিনি আমাকে খুঁজে বের করে সন্তুষ্টি প্রকাশ করেন। আমি অবাক হয়েছিলাম, কেননা, আমি তখনো জানতাম কৃষ্ণ মেনন এ ধরনের কাজে সময় ব্যয় করেন না।

কৃষ্ণ মেননকে আমি প্রথম দেখি উনিশ শ' ছেচল্লিশ সালে। পন্ডিত জওহর লাল নেহরুকে অভ্যর্থনা জানানোর জন্য তিনি লন্ডনের বিমান বন্দরে ডিসেম্বর মাসের সকালে হাড়কাঁপা শীতে দাঁড়িয়েছিলেন। একই প্লেনে এসেছিলেন মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ। তাঁকে অভ্যর্থনা জানাতে ভারত মুসলিম ছাত্র ফেডারেশনের বৃটিশ শাখার সভাপতি হিসেবে আমিও উপস্থিত

ছিলাম। বৃটিশ ভারতের হাইকমিশনার নেতৃবৃন্দকে অভ্যর্থনা জানানোর জন্য আমাকে ও আমার সহকর্মীদের আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। সেই প্লেনে অন্যান্য কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ নেতা লর্ড ওয়াভেলসহ বৃটিশ সরকারের সঙ্গে আলোচনা করতে আসেন। সেই উপলক্ষে অনুষ্ঠানগুলোতেও আমি কৃষ্ণ মেননের সংস্পর্শে আসি। উনিশ শ' ছেচল্লিশ সালে আমি ছাত্র, তিনি সুপ্রতিষ্ঠিত নেতা। এক বছর পরে ভারতবর্ষ দ্বিখন্ডিত হয়ে স্বাধীন হলো। তিনি লন্ডনে প্রথম ভারতীয় হাইকমিশনার নিযুক্ত হলেন। সেই মুহূর্তে আমরা পাকিস্তানের নাগরিক হয়ে গেলাম। ১৪ই আগস্ট পাকিস্তানের হাইকমিশন আয়োজিত প্রথম অনুষ্ঠানে তিনিই সকলের আগে একটি ছোট বক্তৃতায় ভারতের পক্ষ থেকে পাকিস্তানকে শুভকামনা জানান।

আজ কৃষ্ণ মেনন অনেক দিনের পুরনো বন্ধুদের কাছে এসেছেন—তাঁর একটি মাত্র আবেদন, শেখ মুজিবের জীবন রক্ষা করতে হবে। আজ তিনি এসেছেন বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে ভারতীয় মনোভাব দৃঢ়তার সঙ্গে ব্যক্ত করতে।

তাঁর আগমনের পরেই আমি লন্ডনের অভিজাত হোটেল স্যাভয়ে দেখা করতে যাই। তাঁর সঙ্গে ছিলেন সুপ্রতিষ্ঠিত এবং লন্ডন মহলে সুপরিচিত সাংবাদিক তারাপদ বসু। কৃষ্ণ মেননের আগমনকে বেসরকারী রূপে দেখানোর উদ্দেশ্যে বোধ করি ভারতীয় হাইকমিশন দূরত্ব বজায় রেখে চলছিল। ভারতীয় লোকসভায় কৃষ্ণ মেনন তখন স্বতন্ত্র সদস্য। তারাপদ বসুর তখন স্বাস্থ্য ভাল ছিল, উৎসাহের অন্ত ছিল না। তাই কৃষ্ণ মেননের সকল দেখাশোনার দায়িত্ব তিনিই সানন্দে গ্রহণ করেছিলেন।

লন্ডনে আগমনের প্রথম দিনের পুরো অপরাহ্নটি কৃষ্ণ মেনন আমার সঙ্গে আলোচনায় কাটান। বৃটিশ সরকারের প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তিদের কার কি মনোভাব তিনি জানতে চাইলেন। আমি যতদূর জানি তাঁকে বললাম। তেমনি বিরোধীদলের কার কাছ থেকে কতটুকু তৎপরতা আশা করা যায় তাও বললাম। তিনি এঁদের সঙ্গে আলোচনা চালাবার কথা বললেন। শেখ মুজিবের বিচার প্রহসন শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তিনি লন্ডনে আসেন। তাই সামগ্রিকভাবে বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের চেয়েও তাৎক্ষণিক প্রয়োজনীয়তা ছিল বঙ্গবন্ধুর প্রাণরক্ষা করা। পরদিন থেকে লন্ডনে কৃষ্ণমেননের ব্যস্ততায় দিন কাটে। কনওয়ে হলে বাঙালীদের আয়োজিত এক সভায় তিনি ভারতীয় জনগণের পক্ষ থেকে জোরালো বক্তৃতা করেন। সে সভায় মুজিবনগর সরকারের পক্ষ থেকে আমি তাকে ধন্যবাদ জানাই। এবং দৃঢ়প্রত্যয়ের সঙ্গে ঘোষণা করি যে, আমাদের মরণজয়ী সংগ্রাম নিশ্চয়ই সার্থক হবে এবং স্বাধীন বাংলাদেশ পৃথিবীর মানচিত্রে গৌরবের আসন লাভ করবে।

কৃষ্ণ মেনন মহাত্মা গান্ধী হল এবং ওয়াই এম সি এ হলেও বক্তৃতা করেন। এ দু'টি সভায় আমি শ্রোতা হিসেবে উপস্থিত ছিলাম। কেননা এ সভাগুলো ছিল আমাদের সমর্থনে ভারতীয় নাগরিকদের। ভারতীয়রা স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে সভার আয়োজন করেছেন, আমাদের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে নয়।

ভারতে আশ্রয় গ্রহণকারী অসংখ্য ছিন্নমূল শরণার্থীর চরম দুর্দশাগ্রস্থ জীবন-যাপন নিয়ে তৈরী করা একটি প্রামাণ্য প্রদর্শনী কৃষ্ণমেনন তেরই আগস্ট উদ্বোধন করেন। বললেন, তিনি

নিজের চোখে যা দেখেছেন তা আরো করুণ ও হৃদয় বিদারক। মানুষের এমন অবর্ণনীয় দুর্দশার নজির ইতিহাসে নেই। বাংলাদেশের অসংখ্য নাগরিক পাকিস্তানের সামরিক বাহিনীর অত্যাচারের ফলে দেশ ত্যাগ করে অন্য দেশে আশ্রয় গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছেন। যুক্তরাষ্ট্রের সিনেটর এডওয়ার্ড কেনেডি বলেন যে, এসময় প্রতিদিন এক লাখের মতো বাঙালী ভারতে আশ্রয় গ্রহণ করেছেন।

আমাদের প্রবীণ সহকর্মী এবং লন্ডনস্থ আওয়ামী লীগ নেতা জনাব গাউস খান কৃষ্ণমেননের সম্মানে একটি ঘরোয়া ভোজসভার আয়োজন করেন। এতে আরো আমন্ত্রিত হন আমাদের স্টিয়ারিং কমিটির নেতৃবৃন্দ ও কয়েকজন বিশিষ্ট নেতা-কর্মী। কৃষ্ণ মেনন আমার সহকর্মীদের সঙ্গে সরাসরি নানা বিষয়ে আলোচনা করলেন। স্যাভয় হোটেলে আমার সঙ্গে আগেই দীর্ঘ আলোচনা হয়েছে, তাই আমি চাচ্ছিলাম যে, তিনি অন্যদেরও বক্তব্য শুনুন। জীবনের নানা অভিজ্ঞতায় পূর্ণ এই মানুষটি তরুণ কর্মীদের কথা বেশ আগ্রহের সঙ্গে শুনছিলেন। শেখ মুজিবের বিচার প্রহসন শুরু হওয়ায় আমরা মুখে যতই সতর্কবাণী উচ্চারণ করিনা কেন, ভিতরে ভিতরে একটি দুর্বিষহ শঙ্কা আমাদের অস্থির করে তুলেছিল। একদল দিকহারা মানুষ সেদিন কৃষ্ণ মেননকে কাছে পেয়ে কিছুটা আশার আলো দেখতে পেয়েছিল। কেননা, বৃটেন এবং আমেরিকার সকল দলের প্রথম সারির রাজনীতিবিদদের সঙ্গে তাঁর ছিল পরিচয় এবং অনেকের সঙ্গে বন্ধুত্ব। জীবনের প্রায় অর্ধ শতাব্দীকাল তিনি তাঁদের মধ্যে অতিবাহিত করেছেন। তিনি লন্ডনে অনেকের সঙ্গেই দেখা করে কয়েকদিন পর যুক্তরাষ্ট্রে চলে যান। ব্যক্তিগতভাবে যতদূর সম্ভব বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে তিনি আন্তরিকভাবে সাহায্য করেছিলেন। কৃষ্ণ মেনন এবং তারাপদ বসু দু'জনই আজ লোকান্তরে।

ছেচল্লিশ

আগস্ট মাসেই লন্ডনে বাংলাদেশ হাই কমিশন স্থাপিত হয়। আমি লন্ডনে দূতাবাস স্থাপনের ঘোষণা করেছিলাম পহেলা আগস্ট ট্রাফালগার স্কয়ারে। রাজনৈতিক দিক থেকে লন্ডনে একটি দূতাবাস স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা মুজিবনগর সরকার গভীরভাবে অনুভব করেন।

আমাদের গোরিং স্ট্রীটের কেন্দ্রীয় অফিসের কথা আগেই উল্লেখ করেছি। অফিসটি এর মধ্যেই বাঙালীদের কাছে পরিচিতি লাভ করেছিল। প্রায় সবসময়ই অফিসটি লোকে পূর্ণ থাকত। তবে কেউ স্বীকৃতি দিক বা না দিক আমাদের পক্ষে একটি অফিসকে দূতাবাস রূপে ঘোষণা করতে পারলে আমাদের সংকল্পের দৃঢ়তাই প্রকাশ পায়। কিন্তু একটি অসুবিধা দাঁড়িয়ে গেল যে, ব্যক্তিগতভাবে বাঙালীদের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ এই দূতাবাসের খরচের জন্য 'বাংলাদেশ ফান্ড' থেকে কোন অর্থ ব্যয় না করতে অনুরোধ জানালেন। কেননা ফান্ডের

প্রধান উদ্দেশ্য ছিল অস্ত্র ক্রয়। আমি নিজেও সেই মত পোষণ করি।

আগস্ট মাসের দিকে লন্ডনের প্রায় সকল বিদেশী দূতাবাসই বাংলাদেশ আন্দোলনের প্রতি সহানুভূতিশীল মনোভাব প্রকাশ করেছে। তাঁদের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্বন্ধ ঘনীভূত করার জন্য একটি দূতাবাসের প্রয়োজন আমিও অনুভব করি। একটি পত্রে আমি প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিনকে এ সম্পর্কে সচেতন আছি বলে জানাই এবং বাস্তব পদক্ষেপের দিকে দৃষ্টি নিই। এবার দূতাবাসের জন্য একটি উপযুক্ত স্থান দরকার হয়ে পড়ল, সেটা যত ছোটই হোক কিছু আসে যায় না। সিদ্ধান্ত নেয়া হলো দূতাবাসের খরচের জন্য কোন অবস্থাতেই বাংলাদেশ ফান্ডের টাকা ব্যয় করা হবে না।

সাতচল্লিশ

আমি যখন মনে মনে এই সব চিন্তা পোষণ করছি, তখন দু'টি ঘটনা ঘটল। ওয়ার অন ওয়ান্ট-এর চেয়ারম্যান ডোনাল্ড চেজওয়ার্থ বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহ থেকেই নানাভাবে সাহায্য করে আসছিলেন। তিনি ভারতে বাঙালী শরণার্থীদের সাহায্যের ব্যবস্থার জন্য ওয়ার অন ওয়ান্ট এর পক্ষ থেকে কয়েক বার কলকাতায় যান। এবং প্রত্যেকবারই বাংলাদেশের অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি এবং প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। চেজওয়ার্থ তিন সদস্য বিশিষ্ট বাংলাদেশ ফান্ডের ট্রাস্টিও ছিলেন। তাঁকে একদিন বাংলাদেশ দূতাবাস সম্পর্কে আমার সমস্যার কথা বলি।

চেজওয়ার্থ একটি বৃটিশ ট্রাষ্ট কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত আন্তর্জাতিক হোস্টেলের ওয়ার্ডেন রূপে কাজ করছিলেন। এই হোস্টেলের নিচের তলায় বেশ প্রশস্ত কয়েকটি কক্ষ ছিল। এই বাড়ীটি চব্বিশ নম্বর পেমব্রিজ গার্ডেনস-এ অবস্থিত। পেমব্রিজ গার্ডেন ওয়েস্ট এন্ডে। বেশ ভাল জায়গা। আন্ডার গ্রাউন্ড ষ্টেশন থেকে মাত্র দু' মিনিটের পথ। তিনি গ্রাউন্ড ফ্লোরের কক্ষগুলো আমাদের দূতাবাসের জন্য ভাড়া দিতে সম্মত হলেন। ভাড়াটা নাম মাত্র। ট্রাস্ট প্রপার্টি ভাড়া না নিয়ে অন্যকে দেয়া চলে না। আমরা একটি মহৎ সংগ্রামে লিপ্ত, তাই ট্রাস্টের কর্মকর্তাগণ নামমাত্র ভাড়ায় থাকতে দিতে রাজী হলেন। আমরা একশ' পাউন্ড ভাড়া দিয়ে রুমগুলো নিই। এই কক্ষগুলো যিনি দেখেছেন তিনি স্বীকার করেছেন যে, ভাড়াতো নয়, এমনিতেই আমাদের দেয়া হয়েছে।

জুলাই মাসের শেষের দিকে একজন বাঙালী যুবক আমাকে একা পেয়ে জহুরুল ইসলামের সঙ্গে দেখা করতে অনুরোধ করেন। এই যুবকটি বাঙালী হলেও ইতিপূর্বে আমাদের সঙ্গে কোন যোগাযোগ করেননি। শেখ আবদুল মান্নান এবং আরো দু'একজন ঘনিষ্ঠ সহকর্মীকে একথা বলায় তাঁরা এভাবে সাক্ষাতের ঘোরতর আপত্তি করেন। তখন আমি যুবকটিকে বললাম,

'আজ খুবই ব্যস্ত, পরে দেখা যাবে।' তিনি চলে গেলেন। কর্মব্যস্ততার মাঝে কথাটা আমিও ভুলে গেলাম। এর পাঁচ ছ'দিন পর মোশাররফ হোসেন জোয়ারদার আমাকে এসে বললেন জহুরুল ইসলাম লুইসহ্যাম হাসপাতালে আছেন। তাঁর কোন অসুখ নেই। তিনি অসুখের কথা বলে পাকিস্তানের সামরিক কর্তৃপক্ষের অনুমতিক্রমে লন্ডনে এসেছেন। তিনি আপনার সঙ্গে দেখা করতে চাচ্ছেন। আমি সেদিনই জোয়ারদারের গাড়ীতে হাসপাতালে যাই। জহুরুল ইসলামের সঙ্গে সেটাই আমার প্রথম দেখা।

মোশাররফ হোসেন জোয়ারদার আমাকে পরিচয় করিয়ে দেবার পর আমরা এমনভাবে আলাপ-আলোচনা করলাম যেন অনেকদিন থেকেই পরস্পর পরিচিত। তিনি তাঁর দুর্দশার কথা বললেন। ঢাকার রমনা প্রেসিডেন্ট ভবনে (পরে গণভবন) তাঁকে নিয়ে গিয়েছিল পাকিস্তানী সৈন্যরা। সেখানে তাঁকে দেয়ালের সঙ্গে দাঁড় করিয়ে গুলী করার ভয় দেখায়। এমন সময় তাঁর একজন পাঞ্জাবী বন্ধু খবর পেয়ে আসে এবং অনুনয়-বিনয় করে তাঁকে সেদিনকার মতো মুক্ত করে আনে। সেই বন্ধুরই সাহায্যে তিনি লন্ডনে চিকিৎসার জন্য আসার অনুমতি পেয়েছেন। বুঝলাম তিনি শংকিত এবং দেশ স্বাধীন না হওয়া পর্যন্ত ঢাকায় ফিরবেন না। তিনি বললেন যে, তিনি মুজিবনগর, বিশেষ করে তাজউদ্দিন সাহেবের কাছ থেকে আমাদেরকে অর্থ সাহায্য করার অনুরোধ পেয়েছেন। তিনি নিজেও স্বাধীনতা আন্দোলনে সাহায্য করতে চান। আমি তখন তাঁকে বলি যে, বাংলাদেশ ফান্ড নামে আমরা একটি ফান্ড করেছি মূলতঃ স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রয়োজনে অস্ত্র কিনে প্রেরণ করতে ও স্টিয়ারিং কমিটির খরচ চালাতে। সেই ফান্ড থেকে অন্য কোন খরচ করা বাঙালীদের বা আমার ব্যক্তিগত মত নয়। কিন্তু আমাদের দূতাবাস করার প্রয়োজন রয়েছে। তাঁকে আরো বলি যে, দেখা গেছে বেতন এবং অন্যান্য খরচ বাবদ প্রতিমাসে দু'থেকে আড়াই হাজার পাউন্ডের মতো লাগবে। পরে আরো কূটনীতিবিদ যোগ দিলে বেশী লাগতে পারে। এই দূতাবাসের খরচ যদি তিনি চালিয়ে নেন তাহলে আমি নিশ্চিন্ত মনে কূটনৈতিক কাজ সুচারুরূপে করতে পারি। তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন যে, আমার এস্টিমেট অনুযায়ী তিনি যদি দু'-তিন বছরের টাকা একসঙ্গে দিয়ে দেন তাতে আমি সন্তুষ্ট হব কিনা। আমি উত্তর দিলাম যে, দেশ স্বাধীন না হওয়া পর্যন্ত তিনি যদি আমাদের দূতাবাসের মাসিক খরচ প্রতি মাসে দেন তাহলেই ভাল হয়। তিনি এককথায় রাজী হয়ে বললেন যে, প্রতিমাসে তিনি মোশাররফ হোসেন জোয়ারদারের মাধ্যমে তাঁর দেয় অর্থ পাঠিয়ে দেবেন। তবে সেটা অন্য কারো নামে জমা করে নিতে হবে। অন্যথায় পাকিস্তানীরা কোনভাবে এ খবর পেলে ঢাকায় অবস্থানরত তাঁর স্ত্রী ও সন্তানদের জীবন বিপন্ন হতে পারে। তখনই আমরা তিনজনে মিলে একটি নাম ঠিক করলাম। প্রতি মাসের প্রথম সপ্তাহে মোশাররফ হোসেন জোয়ারদার সুবিদ আলি নামে একজন রোগীর পক্ষ থেকে দূতাবাসের খরচ বাবদ প্রয়োজনীয় অর্থ দিয়ে আসবেন। যতদূর মনে পড়ে মাসিক আড়াই হাজার পাউন্ড দেয়ার কথা ধার্য হয়। এর মাত্র কয়েক মাস পরেই দেশ স্বাধীন হয়ে যায়। তারপর আর তাঁকে দিতে হয়নি। অথচ তিনি দু'তিন বছরের খরচ এক সঙ্গে দিতে চেয়েছিলেন। একেই বলে ভাগ্য।

দূতাবাসের ফিনান্স ডিরেক্টর লুৎফর মতিন এই পাউন্ড গ্রহণ করে সুবিদ আলীর নামে যথারীতি রশিদ দিতেন। এই অর্থ দিয়ে বাংলাদেশ দূতাবাসের নামে অন্য একাউন্ট খোলা হয়। দূতাবাসের খরচ এই একাউন্ট থেকে চলত। এই একাউন্টের সঙ্গে 'বাংলাদেশ ফান্ডের' কোন সমবন্ধ ছিল না। দূতাবাস একাউন্ট পরিচালনা করেছে। তদানীন্তন ফিনান্স ডিরেক্টর লুৎফুল মতিন বর্তমানে বাংলাদেশ সরকারের অর্থ মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব।

জহুরুল ইসলাম সেদিন এক পর্যায়ে নিজে থেকেই আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'স্যার আপনার খরচ চলে কি করে ?' আমি উত্তর দিলাম, ন্যাশনাল ওয়েস্ট মিনিষ্টার ব্যাংকে ১৯৪৬ সাল থেকে আমার একটি একাউন্ট আছে। এই পুরনো সমবন্ধ এবং একজন বন্ধু গ্যারান্টার হওয়াতে ওভারড্রাফট-এর ব্যবস্থা করেছি। অবশ্য বর্তমান পরিস্থিতিতে আমার ব্যক্তিগত খরচ খুবই কমিয়ে রেখেছি। তাছাড়া আমার পরিবার আমার সঙ্গে জেনেভায় আসাতে স্টেট ব্যাংকের অনুমোদন নিয়ে কিছু অর্থ বেশী আনতে পেরেছিলাম। তিনি বললেন, 'আমি আপনার জন্য জোয়ারদারের মাধ্যমে এককালীন তিন হাজার পাউন্ড পাঠিয়ে দেব।' আমি বললাম, 'অশেষ ধন্যবাদ। আমি সেই অর্থ গ্রহণ করব এই শর্তে যে, দেশ স্বাধীন হলে সেই সময়কার সরকারী বিনিময় হার অনুসারে আমি এই টাকা পরিশোধ করব, আর আপনি গ্রহণ করবেন। আর যদি দেশ স্বাধীন হওয়া পর্যন্ত বেঁচে না থাকি আপনি কোন দাবী রাখবেন না। তবে যখনই সম্ভব হবে আমার পরিবার এটা শোধ করে দেবে।' এই তিন হাজার পাউন্ড শেষ হওয়ার আগেই দেশ স্বাধীন হয়ে যায়।

দেশ স্বাধীন হবার পর জহুরুল ইসলামকে তখনকার বিনিময় হারে তিন হাজার পাউন্ডের সমপরিমাণ বাংলাদেশী টাকা সোনালী ব্যাংকের মারফত আমার নিজের একাউন্ট থেকে চেক দ্বারা পরিশোধ করেছি। এই ঋণ গ্রহণের কথা প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবকে জানিয়ে ছিলাম এবং তাঁর জ্ঞাতসারেই পরিশোধ করেছি।

এভাবে স্থান এবং খরচের ব্যবস্থা হয়ে যাওয়ায় সাতাশে আগস্ট ২৪ নম্বর পেমব্রিজ গার্ডেনস-এ বাংলাদেশ দূতাবাস উদ্বোধন করা হয়। ভারত ছাড়া এটিই বিশ্বে বাংলাদেশের প্রথম দূতাবাস। মুজিবনগর সরকার এই বিষয়টিকে খুবই গুরুত্ব প্রদান করেন। অবিশ্যি এগার নম্বর গোরিং স্ট্রীটে আমাদের কার্যালয় মে মাসে স্থাপিত হয়।

আটচল্লিশ

সাতাশে আগস্ট সকালে সমবেত বাঙালী ও সাংবাদিকদের উপস্থিতিতে আমি দূতাবাসের সামনে আনুষ্ঠানিকভাবে বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করি। দূতাবাস উদ্বোধনের খবর 'লন্ডন টাইমস' সহ অন্যান্য পত্রিকায় ছাপা হয়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রায় তিনশ' বাঙালী এবং অনেক

বিদেশী সাংবাদিক উপস্থিত ছিলেন।

দূতাবাস উদ্বোধনের পর কয়েকজন বৃটিশ পার্লামেন্ট সদস্য বক্তৃতা করেন এবং আমাদের সংগ্রামের সর্বাঙ্গীন সাফল্য কামনা করেন। উদ্বোধনের দিন দূতাবাসের সদস্য ছিলেন আবুল ফতেহ, মহিউদ্দিন আহমেদ, লুৎফুল মতিন, শিল্পী আবদুর রউফ, মহিউদ্দিন চৌধুরী, আবদুস সালাম এবং এ, কে, এম নূরুল হুদা ও ফজলুল হক চৌধুরী।

মুজিবনগর সরকার বহু দিন আগেই আমাকে হাইকমিশনার ঘোষণা করে লেটার অব ক্রেডেন্স অর্থাৎ পরিচয়পত্র প্রেরণ করেন। সেই পরিচয়পত্র নতুন করে আবার বৃটিশ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে পাঠানো হয়। পতাকা উত্তোলনের পর আমি যখন হলঘরে সাংবাদিক এবং অতিথিবৃন্দকে অভ্যর্থনা করে ভাষণ দিচ্ছিলাম, কয়েকটি লরি বোঝাই করে আসা পুলিশ মিশনের সামনে প্রহরায় দাঁড়িয়ে গেল। আমাদের অনুষ্ঠান শেষে তাঁদেরও আমাদের প্রীতি অনুষ্ঠানে যোগদানের আমন্ত্রণ জানাই। হঠাৎ পুলিশের আগমনের কারণ সেদিন তৎক্ষণাৎ বুঝতে পারিনি। পরের দিন খবরের কাগজ পড়ে বিষয়টা পরিস্কার হলো। ঠিক যে সময় আমাদের অনুষ্ঠান চলছিল সে সময়ই পাকিস্তানের হাইকমিশনার বৃটিশ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে গিয়ে প্রতিমন্ত্রী জোসেফ গডবারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং বলেন যে, বৃটেন পাকিস্তানকে বন্ধুরাষ্ট্ররূপে গণ্য করে। সেই রাষ্ট্রের এক অংশের নাম পূর্ব পাকিস্তান। পূর্ব পাকিস্তানের নাম বদলে বাংলাদেশ রেখে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের একটি দূতাবাস স্থাপন পাকিস্তানের সার্বভৌমত্বের প্রতি অপমান। বৃটিশ সরকারের উচিত এই অনুষ্ঠান বন্ধ করে দেওয়া এবং অনুরূপ নাম নিয়ে যাতে কোনরূপ দূতাবাস স্থাপিত হতে না পারে তার ব্যবস্থা করা। খবরের কাগজে যা বেরিয়েছিল, তাছাড়াও পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে আমাদের যোগাযোগের মাধ্যমে জানতে পারি যে, বৃটিশ প্রতিমন্ত্রী বলেছেন, 'এদেশে চিন্তা ও কর্মের স্বাধীনতা আছে এবং এমন কোন আইন নেই যে, কেউ তাঁর অফিসের একটি বিশেষ নাম দিতে পারবেন না। তাই কেউ যদি একটি অফিস খুলে তাকে হাইকমিশন বলে আনন্দ পান তাতে আমাদের বাধা দেবার কোন অধিকার নেই। তবে ভুল বোঝাবুঝি হয় এমন নাম দেওয়া এবং কোনরূপ বেআইনী বা শান্তি ভঙ্গের কাজে লিপ্ত হলে তাদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে। কিন্তু তার পূর্বে নয়।' পরে শুনতে পাই যে, পাকিস্তানের হাইকমিশনার প্রতিবাদ করতে যাওয়ায় আমাদের দূতাবাসে তাড়াতাড়ি পুলিশ পাঠানো হয়েছিল যাতে করে বৃটেনস্থ পাকিস্তানী নাগরিকগণ আমাদের আক্রমণ করতে না পারে।

লন্ডনে বাংলাদেশ হাইকমিশন নাম দিয়ে একটি অফিস স্থাপন মুজিবনগর সরকারে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা বলে মনে করা হয়। তাঁরা এ ঘটনাকে এতটা প্রাধান্য দিবেন জানলে এমন একটি দূতাবাস আগেই খুলতে পারতাম। অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম, প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমদ ও সেনাবাহিনীর সর্বাধিনায়ক জেনারেল ওসমানী দীর্ঘ পত্র মারফত আমাকে অভিনন্দন জানান এবং এই দূতাবাসের সর্বাঙ্গীন সাফল্য কামনা করেন। তাঁরা প্রায় সকলেই একটি কথা উল্লেখ করেন যে, এটিই বহির্বিশ্বে স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম দূতাবাস।

এই দূতাবাস স্থাপনের পর স্বভাবতঃই আন্দোলনের কাজ ভাগ করে দিতে হয়। ১১ নম্বর গোরিং স্ট্রিটে যে সব সাংগঠনিক ও প্রচার কাজ আগে চলছিল সেগুলো সেখান থেকেই চালাবার সিদ্ধান্ত নিলাম। দূতাবাসের অফিসারবৃন্দ বিভিন্ন সরকারের নিকট চিঠিপত্র আদান প্রদান করবেন এবং বৃটিশ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রক্ষা করে চলবেন বলে ঠিক করা হলো। তাছাড়া বিদেশী কূটনীতিবিদ কেউ আমাদের সঙ্গে দেখা করতে চাইলে তাঁকেও সাধারণতঃ আমি দূতাবাসে আসতে বলতাম। অবশ্য কাকে কোথায় আসতে বললে ভাল হয় সেটা বিবেচনা করেই সেভাবে বলা হতো। গোরিং স্ট্রিটের প্রাণচঞ্চল কর্মপ্রবাহ দেখলে যাঁরা আনন্দিত হবেন, তাঁদের সেখানেই যেতে বলেছি। আর যাঁদের সঙ্গে ধীর-স্থির ও শান্ত পরিবেশে আলোচনার প্রয়োজন তাঁদেরকে পেমব্রিজ গার্ডেনস-এ আসতে বলেছি। আমার নিজের পক্ষে দৌড়াদৌড়িটা বেশ কিছুটা বেড়ে গেল। আমি প্রত্যহ সকালের দিকে গোরিং স্ট্রিটে যেতাম। তাছাড়া বিকেলের দিকে পেমব্রিজ গার্ডেনস-এ আসতাম। খুব কম দামে পুরনো আসবাবপত্র কিনে দূতাবাস সুরুচিসম্পন্নরূপে সাজানো হয়। স্বেচ্ছাসেবক এবং দূতাবাসের কর্মচারীবৃন্দ দূতাবাস সাজানোর ব্যাপারে বেশ পরিশ্রম করেন। এমনকি, আমার বেশ মনে আছে, জন স্টোনহাউসের দশ-বার বছরের ছেলে এবং একটি মেয়েও এই কাজে অংশগ্রহণ করেন। লুলু বিলকিস বানুর মেয়েরাও এ ব্যাপারে খুবই পরিশ্রম করে।

দূতাবাস খোলার পর অনেকে শুভেচ্ছা জানাতে আসেন। তাঁদের জন্য দূতাবাসে দর্শক বই বা ভিজিটার্স বুক রাখা হয়।

উনপঞ্চাশ

দূতাবাস স্থাপনের কয়েক দিনের মধ্যেই অর্থাৎ পহেলা সেপ্টেম্বর আমি নরওয়ে পৌঁছাই। আধুনিক অসলো শহরটি উনিশ শ' পঞ্চাশ সনে নয়শ' বছর পূর্তি উৎসব পালন করে। সেই বছর এ উপলক্ষে যে নগর প্রাসাদ তৈরী করে সেখান থেকেই মেয়র পৌরসভার কাজ পরিচালনা করেন। শহরের বিখ্যাত রাস্তা কার্ল জোহাসে এই প্রাসাদটি অবস্থিত। পার্লামেন্ট বা জাতীয় সংসদ এবং বিশ্ববিদ্যালয়টিও এই রাস্তার উপরেই অবস্থিত। সমস্ত শহরটিই যেন পার্ক দিয়ে ঘেরা। বসন্তে ও গ্রীষ্মে পর্যটকে এই শহর ভরে যায়।

অসলোতে আসার সময় আমার সঙ্গে ছিলেন রাজিউল হাসান রঞ্জু। নরওয়ে বিমান বন্দরে আমাদেরকে অভ্যর্থনা জানান কয়েকজন বাঙালী যুবক। রফিকুজ্জামান, হামিদুল ইসলাম ও আরো কয়েকজন বাঙালী যুবক এখানে অভূতপূর্ব সাংগঠনিক নৈপুণ্য দেখিয়েছেন। মাত্র ছ'-সাতজন বাঙালী যুবক একতা, অধ্যবসায় এবং একাগ্রতার দ্বারা আমাদের আন্দোলনকে সকল মহলে পরিচিত করেন ও সহানুভূতি অর্জন করেন। এখানে পৌঁছার পর তাঁরা আমাকে

হোটেলে রাখতে চান। আমি ছাত্রাবাসগুলোর ব্যবস্থায় ছাত্রাবাসেই তাঁদের সঙ্গে থাকার ইচ্ছা প্রকাশ করলাম। কেননা, তাতে এই সংগ্রামের সময় অনেক খরচ বেঁচে যাবে। আমাকে হামিদুল ইসলাম তাঁর কক্ষে রাখলেন। খুবই ছোট কক্ষ, ছাত্রদের জন্য ইউরোপে যেমনটি হয়। আমাকে কক্ষটি ছেড়ে দিয়ে হামিদুল ইসলাম নিজের জন্য অন্য একটি কক্ষে থাকার ব্যবস্থা করেন। তাঁর সঙ্গে সেবারই আমার প্রথম পরিচয় ঘটে। আমি একটি ব্যাপার লক্ষ্য করলাম। আমি কক্ষে ঢুকলেই তিনি রেকর্ড বাজাতে শুরু করতেন। রবীন্দ্র সঙ্গীতের সুরলহরী কক্ষটিকে আচ্ছন্ন করে ফেলত। আমি তাকে একবার বললাম, 'রুমে ঢুকতেই দেখি, আপনি রেকর্ড প্লেয়ার ছেড়ে দেন।' উত্তরে তিনি বলেন, 'আপনাকে এ ছাড়া আর কিইবা আমরা দিতে পারি, স্যার। আপনি রবীন্দ্রসঙ্গীত ভালবাসেন, একথা আমি জানি। তাই কাজের ফাঁকে ফাঁকে দু'মিনিট যদিও আপনাকে আনন্দ দিতে পারি সেটুকুতেই আমাদের তৃপ্তি।' তাঁর কথাগুলি আমার হৃদয় স্পর্শ করেছিল। যে ক'দিন অসলোতে ছিলাম তিনি সারাক্ষণ আমার সঙ্গে ছিলেন। বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের তরুণ শিক্ষক অসলো বিশ্ববিদ্যালয়ে ডক্টরেটের জন্য গবেষণা করছিলেন। মুখে হাসিটি লেগেই থাকত। অথচ কাজ ও কথার ফাঁকে ফাঁকে স্ত্রীর কথা বলেন, পরিবারের কথা বলেন, তাদের সঙ্গে কোন চিঠিপত্রের আদান-প্রদান নেই, এই অবস্থা চলছে। পঁচিশে মার্চের পর থেকে এখানে সক্রিয়ভাবে আন্দোলনকে সমর্থন করে কাজ করে যাচ্ছেন। এবং সে কারণেই তিনি নিজে থেকেও দেশে চিঠিপত্র লেখা বন্ধ করেছেন। কেননা, তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ ধরা পড়লে তাঁর পরিবারেরও বিপদ হতে পারে।

হামিদুল ইসলামকে আমার খুব ভাল লেগেছিল। সহজ, সরল, আন্তরিক এই মানুষটির অমায়িক ব্যবহার আমার চিরদিন মনে থাকবে। আমাদের কর্মচঞ্চল মুহূর্তগুলোর মাঝে মাঝে ট্রামে বাসে দেশের কথা কি মমত্ব দিয়েই না বলতেন।

দু'তিন বছর আগে হঠাৎ একদিন তিনি এবং তাঁর স্ত্রী আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন। মুখে সেই স্বভাবজাত হাসিটি ছিল। কিন্তু নরওয়ের সেই ঔজ্জ্বল্য ছিল না। কিছুটা হৃদরোগে ভুগছেন, বললেন। আমি বললাম, 'কোন চিন্তা করবেন না। ইনশাআল্লাহ সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে যাবেন।'

এর কিছুদিন পর হঠাৎ তাঁর ইন্তেকালের খবর পেলাম। সেই হৃদরোগই আমাদের কাছ থেকে তাঁকে কেড়ে নিয়ে গেল। দেশের প্রতি তাঁর অকুণ্ঠ ভালবাসার কথা আমি যতদিন বেঁচে আছি মনে থাকবে। কিন্তু তাতে কি আসে-যায় ? দেশের লোক কি জানতে পেরেছে তাঁর অকৃত্রিম দেশপ্রেমের কথা।

অসলোতে পৌঁছার অল্পক্ষণ পরই হামিদুল ইসলাম ও রফিকুজ্জামান আমাকে টেলিভিশন ষ্টেশন কেন্দ্রে নিয়ে গেলেন। তাঁদের সঙ্গে আগে কথা বলে রাখা হয়েছিল আমার সাক্ষাৎকারের ব্যাপারে। সেই অনুযায়ী টিভি কর্তৃপক্ষ আমার সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা করেন। আমি টেলিভিশন ষ্টেশনে উপস্থিত হলে আমাকে টেলিভিশনের সংশ্লিষ্ট কর্মচারীবৃন্দ স্বাগত জানান। বাংলাদেশের প্রতি তাঁদের আন্তরিক সহানুভূতি লক্ষ্য করে আনন্দিত হলাম। হামিদুল ইসলাম এবং রফিকুজ্জামানের সঙ্গেও তাঁদের পরিচিতি এবং বন্ধুত্ব লক্ষ্য করলাম। টেলিভিশনে

আমার দীর্ঘ সাক্ষাৎকার নেয়া হলো এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের মূল কথাগুলো প্রশ্নের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে নরওয়েবাসীদের কাছে তুলে ধরলাম। সেদিনই বিকেলে এই সাক্ষাৎকার প্রচারিত হয়।

সন্ধ্যায় অসলো বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রনেতাদের সঙ্গে ঘরোয়াভাবে মিলিত হলাম। এই তরুণ ছাত্রদের মধ্যে বাংলাদেশের ছাত্রদের জন্য প্রীতি, ভালবাসা ও ভ্রাতৃত্ব লক্ষ্য করে সেই পরম দুঃখের দিনেও আমি অসীম সান্ত্বনা লাভ করি।

অসলোর মেয়রের পুত্র তরুণ নেতা বুলের মধ্যে আমি দেখতে পাই আন্তরিক সহানুভূতি, মানবপ্রেম, কর্মচাঞ্চল্য এবং একাগ্রতা।

পরদিন দোসরা সেপ্টেম্বর নরওয়ের প্রধান বিচারপতি পিয়ারে অল্ড–এর কফির আমন্ত্রণে বেলা ১১টার দিকে সুপ্রীম কোর্টে গেলাম। তিনি সুপ্রীম কোর্টের সকল বিচারপতিকে আমার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতে ও মিলিত হবার জন্য তাঁর কক্ষে আসতে বলে রেখেছিলেন। আমি যাবার পর তিনি পরিচয় করিয়ে দিলেন সবার সাথে। তাঁরা জানতে চাইলেন বাংলাদেশ কেন পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে স্বাধীনতা চাইছে। আমি সংক্ষেপে তাঁদের কাছে বাঙালীর স্বাধীনতা কামনার মূল কারণগুলো বিশ্লেষণ করলাম। তাঁরা আমাদের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করেন এবং আন্দোলনের সাফল্য কামনা করলেন।

একথা ঠিক যে, নরওয়ের সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতিগণ আমাদের স্বাধীনতা আন্দোলনে আমাদের হয়ে কোন সক্রিয় ভূমিকা পালন করবেন না। এ অবস্থায় মনে করা যেতে পারে যে, তাঁদের কাছে সময়ক্ষেপণের কোন প্রয়োজনীয়তা ছিল না ; কিন্তু আমি নিজে বিচারপতি এবং ভাইস চ্যান্সেলর বলে যেখানেই গিয়েছি, বিচারপতি এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মকর্তাদের সঙ্গে দেখা করেছি। নরওয়ে আসার আগেই আমাদের নরওয়ে কর্মীরা সুপ্রীম কোর্টের রেজিস্ট্রারকে আমার আগমনের কথা জানালে প্রধান বিচারপতি কফির আমন্ত্রণ জানান। এঁদের সঙ্গে আমার দেখা করার উদ্দেশ্য একটি। আমাদের আন্দোলনের বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে তাঁদের ধারণা স্পষ্ট থাকলে আলাপ–আলোচনার মাধ্যমে রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী বা প্রভাবশালী মহলে মতামত ব্যক্ত করতে পারেন। এভাবেই জনমত গড়ে ওঠে।

সেদিন দুপুরে অসলোর রোটারী ক্লাবের অতিথি রূপে আমার আমন্ত্রণ ছিল। এর ব্যবস্থা করেছিলেন ছাত্রনেতা রব। ক্লাবের প্রেসিডেন্ট, সেক্রেটারী এবং বিশিষ্ট সদস্যগণ সভা শুরুর আগে আমাকে অভ্যর্থনা জানান এবং সভায় কিছু বলতে অনুরোধ করেন। আমি তাঁদের বলি যে, রাজনৈতিক আলোচনা রোটারী ক্লাবে নিষিদ্ধ, একথা রোটারীর একজন পুরনো সদস্য হিসেবে আমার জানা আছে। কিন্তু গণতন্ত্র একটি জীবনের ধারা, জীবনের দর্শন; সেই সত্যতা সম্মত জীবন ধারা থেকে বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষ আজ বঞ্চিত। তাই তারা জীবনমরণ সংগ্রামে লিপ্ত। এই কথাটি শুধু জানাতে চাই। এর উত্তরে তাঁরা বললেন, 'একবার আপনাকে কিছু বলার জন্য আহবান করলে আপনাকে তো আর আমরা থামাতে যাব না। আপনি যদি আরো প্রত্যক্ষভাবেও কিছু বলেন, তাতেও আমাদের আপত্তি থাকবে না।' বেশ মনে আছে, মাত্র মিনিট দশেক বলেছিলাম কিন্তু সেই সংক্ষিপ্ত ভাষণেই সংগ্রামী বাংলার

দৃঢ়প্রত্যয়ের বাণী তাঁদের কাছে পৌঁছে দেই। কোন রোটারিয়ান অন্য কোন ক্লাবের সভায় যোগ দিলে তিনি যে ক্লাবের সদস্য সেখানে একটি কার্ড পাঠানোর নিয়ম আছে। ঢাকা ক্লাবের অনারেরী রোটারিয়ান হিসাবে আমি ঢাকা ক্লাবের ঠিকানা দিয়ে কার্ড পূরণ করে দিলাম। ঢাকার সঙ্গে আমার যোগাযোগ পঁচিশে মার্চের মধ্যরাত থেকে ছিন্ন হয়ে গেছে। এই ক'মাসে বাংলাদেশে আমি কারো কাছে কোন চিঠি লিখিনি। কিন্তু অসলোর এই ক্লাব ঢাকা ক্লাবে আমার কার্ডটি পাঠিয়েছিল। স্বাধীনতার পর বন্ধুদের জিজ্ঞেস করে জানতে পারি যে, কার্ডটি ক্লাবে এসেছিল এবং তাতে করে তাঁরা জানতে পারেন যে, আমি সেই তারিখে নরওয়েতে ছিলাম।

রোটারী ক্লাবের পরে সেদিন খুব গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষাৎকার ঘটে। আমি নরওয়ের পার্লামেন্টে গিয়ে অনেক সদস্যের সঙ্গে দেখা করি, তাঁদের সঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা করি। অল্পদিন পরেই আবার তাদের কারো কারো সঙ্গে নিউইয়র্কে জাতিসংঘের দপ্তরে দেখা হয়। নরওয়ে পার্লামেন্টে একটি আন্তর্জাতিক কমিটি আছে। কোন কোন দেশের পার্লামেন্টে এই কমিটিকে বৈদেশিক কমিটি বলা হয়। এই কমিটির সদস্যদের আমাদের দাবীর যৌক্তিকতা বুঝিয়ে বলি।

এরপর অসলো বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের প্রধানের সঙ্গেও দেখা করি। তিনি একজন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন অধ্যাপক। তাঁর সঙ্গে বিশেষ আলোচনার বিষয় ছিল গণহত্যা কমিশন (Genocide Commission)। এ্যামনেষ্টি ইন্টারন্যাশনাল এবং ইন্টারন্যাশনাল কমিশন অফ জুরিষ্টের সহযোগিতায় আমরা একটি ট্রিবিউনাল গঠনের চেষ্টায় ছিলাম। আমাদের ইচ্ছে ছিল, পৃথিবীর নানা প্রান্তের আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন আইন বিশেষজ্ঞদের দ্বারা একটি ট্রিবিউনাল গঠন করে পাকিস্তানের গণহত্যার ওপর রিপোর্ট প্রকাশ করা। আমরা জানতাম পাকিস্তান এই ট্রিবিউনালের সম্মুখে কিছুতেই উপস্থিত হবে না। কিন্তু আমাদের ইচ্ছে ছিল বিদেশী পার্লামেন্টের সদস্যগণ, রাষ্ট্রনায়কগণ, বিশেষ করে সাংবাদিকগণ পঁচিশে মার্চের পরে যাঁরা বাংলাদেশে এসেছিলেন তাঁদের সাক্ষ্য গ্রহণ করা এবং তার ওপর ভিত্তি করে একটি রিপোর্ট প্রণয়ন করা। এ ব্যাপারে আমরা আইন বিভাগের ডীনের কাছ থেকে শুধু উৎসাহ নয়, কমিশনের সদস্যরূপে কাজ করারও সম্মতি পাই।

তেসরা সেপ্টেম্বর সকালে আমি অসলোর মেয়রের অফিসে গেলাম। অসলোর পৌর প্রাসাদে মেয়রের সুসজ্জিত কক্ষে তিনি আমাকে স্বাগত জানালেন। তাঁর পুত্র বুল আমার সঙ্গে ছিলেন। এছাড়াও হামিদুল ইসলাম, রফিকুজ্জামান, রাজিউল হাসান আমার সঙ্গে ছিলেন। অত্যন্ত হৃদ্যতাপূর্ণ পরিবেশে এই সাক্ষাৎকার অনুষ্ঠিত হয়। তিনি বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনকে পূর্ণ সমর্থন জানালেন। শুধু তাই নয়, তিনি অসলো শহরের যে ছবির বইটি আমাকে দেন তাতে আমাকে বাংলাদেশের বিশেষ প্রতিনিধিরূপে উল্লেখ করেন। এই ঘটনাটি সেদিন আমাদের যথেষ্ট আনন্দ দান করে। নরওয়ের রাজধানী শহরের মেয়র স্বীকার করে নিলেন, পৃথিবীতে বাংলাদেশ বলে একটি দেশ আছে এবং তার একটি সরকার আছে। নরওয়ে সরকারের স্বীকৃতির বহু পূর্বে নরওয়ের নগর প্রধান স্বীকৃতি দিলেন। সেদিন বেলা তিনটায় নরওয়ের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী স্টলটেনবার্গ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে আমাকে

আনুষ্ঠানিকভাবে স্বাগত জানান। এর সকল কৃতিত্ব নরওয়ের ছাত্র ফেডারেশনের এবং তার নেতা বুলের। বুল আমাদের সঙ্গে এমনভাবে জড়িয়ে পড়েছিলেন যে, তাঁর একাগ্রতা দেখে মনে হতো, তিনি নিজের দেশের মুক্তির জন্য সংগ্রাম করছেন। প্রতিমন্ত্রী স্টলটেনবার্গের সঙ্গে প্রায় ঘন্টা দেড়েক আলোচনা হয়। আলোচনা শেষে তিনি আমাদের কথা দেন যে, স্ক্যান্ডেনেভিয়ান দেশসমূহের পররাষ্ট্র মন্ত্রীদের সভায় নরওয়ে বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনকে সমর্থন জানিয়ে বিবৃতি ও কমিউনিকে প্রকাশ করবেন। সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি পররাষ্ট্র মন্ত্রীদের এই বৈঠক হবে। সাধারণতঃ কূটনৈতিক ভাষায় সমর্থন জানানো হয়, কিন্তু স্টলটেনবার্গের ব্যাপারে আমি ব্যতিক্রম দেখতে পাই। নরওয়ে যখন অনুভব করে যে, বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষ অকথিত নিপীড়ন এবং নির্যাতনের ভেতর দিয়ে মুক্তির জন্য লড়ছে, নরওয়ে তাতে স্পষ্টভাবে সমর্থন জানাতে দ্বিধা করেনি। স্টলটেনবার্গের কথা আমার আজও মনে আছে। অত্যন্ত ধীর এবং স্থিরভাবে তিনি আমাদের অবস্থা নিয়ে আলোচনা করছিলেন এবং তার হৃদয়ানুভূতি আমরা অনুভব করেছি। তিনি বর্তমানে নরওয়ের পররাষ্ট্র মন্ত্রী।

ছয়ই সেপ্টেম্বর সোমবার বিকেলে অসলো বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রদের সভায় বক্তৃতা করতে হবে। তাই শনিবার এবং রোববার আমাকে নরওয়ে থাকতে হলো। তবে চৌঠা সেপ্টেম্বর সকালে বুল ছাত্র ইউনিয়নের সভায় আমাদের নিয়ে যান এবং সেদিন কর্মকর্তাদের সঙ্গে লম্বা আলোচনার পর একটি কর্মতালিকা গ্রহণ করা হয়।

অপরাহ্ন পাঁচটায় প্রধান বিচারপতি অন্ডের বাড়ীতে চায়ের নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে গেলাম। পাহাড়ের উপরে বৃক্ষরাজি শোভিত একটি উদ্যানের মাঝখানে বাড়িটি। সেখানে উপস্থিত হয়ে মনে হলো কাব্যকুঞ্জে প্রবেশ করেছি। তিনি আমাদের দোতলায় একটি ড্রইংরুমে নিয়ে গেলেন। বিরাট বাগানের মাঝখানে এই বাড়ীটির প্রত্যেকটি কক্ষের দেয়াল বই দিয়ে ঢাকা। দেখলেই বোঝা যায় যে, জীবনব্যাপী অধ্যয়ন ও গবেষণায় রত একটি মানুষের বাসস্থান। এই পন্ডিত এবং বিদগ্ধ মানুষটির সঙ্গে ব্যাংককে অনুষ্ঠিত বিশ্ব বিচারপতি সম্মেলনে প্রথম দেখা হয়েছিল। সে বছর সম্মেলনে সভাপতিত্ব করছিলেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রধান বিচারপতি। পরের বছরের জন্য কর্মকর্তা নির্বাচন সেই বছরেই সম্পন্ন হয়েছিল। পরবর্তী বছরের কর্মকর্তা নিয়োগের জন্য চার সদস্য বিশিষ্ট কমিটি গঠন করা হয়েছিল। আমি ছিলাম সেই কমিটির একজন; আমি চেয়ারম্যান নির্বাচনের জন্য অন্ডের নাম প্রস্তাব করি এবং অন্ড সর্বসম্মতিক্রমে নির্বাচিত হন। সেই থেকে অন্ডের সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত সম্পর্ক গড়ে ওঠে। চা পানের সময় মিসেস অন্ডও উপস্থিত ছিলেন। এখানে ঘরোয়াভাবে বাংলাদেশের পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করলাম।

পরের দিন ছিল রোববার। ইউরোপের কোন শহরে রোববারে কোন কাজ করা সম্ভব নয়। তাই সেদিনটি কিছু বিশ্রামে এবং নরওয়ের বাঙালী সহকর্মীদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনায় কাটলো। নরওয়েতে তাঁরা স্বাধীনতার পক্ষে যে কাজ করে যাচ্ছেন সে জন্য আন্তরিকভাবে অভিনন্দন জানালাম তাঁদের।

ছয়ই সেপ্টেমবর সকাল দশটায় একটি পূর্ণাঙ্গ সাংবাদিক সম্মেলনে আমি বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের কারণ, বর্তমান পরিস্থিতি এবং আন্দোলনের অগ্রগতি সম্বন্ধে বিস্তারিত তথ্য তুলে ধরি। সাংবাদিকগণ সকলেই বেশ সহানুভূতিশীল ছিলেন, এটা তাঁদের প্রশ্নের ধরন থেকেই বোঝা যাচ্ছিল। এই সাংবাদিক সম্মেলনের খবর পরের দিন নরওয়ের সবগুলো সংবাদপত্রই গুরুত্বের সঙ্গে প্রকাশ করে। সাংবাদিক সম্মেলনের শেষে একটি পত্রিকার জন্য বিশেষ সাক্ষাৎকারও দিতে হয়েছিল। বেলা তিনটায় পার্লামেন্টের প্রভাবশালী সদস্য ইংবান হেলের সঙ্গে দেখা করলাম। বেলা চারটার দিকে দেখা করলাম বিশ্ববিদ্যালয়ে রেক্টরের সঙ্গে। সন্ধ্যা সাতটায় বিশ্ববিদ্যালয়ের মিলনায়তনে এক বিরাট ছাত্র সমাবেশের আয়োজন করা হয়। এব্যাপারে রেক্টর হল ব্যবহারের অনুমতিও দিয়েছিলেন। তাই সভার পূর্বে রেক্টরের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎকারে মিলিত হওয়া অবশ্য কর্তব্য বলে মনে করি এবং সাক্ষাৎকারে বাংলাদেশের পরিস্থিতি সম্পর্কে তাঁকে সবকিছু অবহিত করি। বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন অধ্যাপক হিসেবে তিনি স্বভাবতঃই বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ছাত্র নিপীড়নের সংবাদে খুব মর্মাহত হন।

সন্ধ্যা সাতটার কয়েক মিনিট আগে হামিদুল ইসলাম, রফিকুজ্জামান, আলী ইউসুফ প্রমুখ স্থানীয় বাঙালী সহকর্মীর সঙ্গে ছাত্র সমাবেশে উপস্থিত হয়ে দেখি নরওয়েজিয়ান ছাত্রদের মধ্যে বেশ উত্তেজনা এবং চাঞ্চল্য। নরওয়ের একজন বিশিষ্ট শিল্পীকে দিয়ে ছাত্র ইউনিয়ন একটি পোস্টারে ইয়াহিয়া খানের ব্যঙ্গচিত্র অঙ্কন করিয়ে প্রচার করে। এটা অনেকটা লন্ডনে পি, বি, শীল কর্তৃক প্রকাশিত ব্যঙ্গ চিত্রের অনুকরণে ইয়াহিয়া খানকে দৈত্যরূপে অঙ্কিত করে তাকে নরহত্যায় লিপ্ত দেখানো হয়। আর পোস্টারের একপাশে ছিল এই সভার বিজ্ঞপ্তি।

সভায় উপস্থিত হলে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ইউনিয়ন কর্মকর্তাগণ জানান যে, কয়েকজন পাকিস্তানী ছাত্র মিলনায়তনের গেটে কয়েকটি পোস্টার ছিঁড়ে ফেলেছে। এই উত্তেজনার ফলে মিলনায়তন এতো জনাকীর্ণ হয় যে, তিল ধারণের জায়গা ছিল না। আমার বক্তৃতার পূর্বেই অসলো বিশ্ববিদ্যালয়ের দু'তিনজন ছাত্রনেতা বাংলাদেশে ছাত্র নিপীড়নের তীব্র নিন্দা করে বক্তৃতা করেন। তাঁরা সকলেই বলেন, "নরওয়ে বাক স্বাধীনতার দেশ, এখানে এসেও যদি পাকিস্তানী ছাত্ররা পোস্টার ছিঁড়ে ফেলতে সাহস করে তাহলে নিজের দেশে তাদের এবং তাদের সরকারের ব্যবহার সহজেই অনুমেয়।" এক ছাত্র নেতাতো এতোটা উত্তেজিত হয়ে পড়েছিলেন যে, তিনি ইয়াহিয়া খানের শির যে এনে দিতে পারবে তাঁকে বিশ হাজার ক্রোনার (নরওয়ের মুদ্রা) পুরস্কার দেয়ার কথা ঘোষণা করে বসেন। এরপর আমার কি আর বক্তৃতা দেয়ার প্রয়োজন থাকে ? আমি এই ঘটনার মধ্যেও সাফল্যের একটি অদৃশ্য ইঙ্গিত লক্ষ্য করলাম। কারণ আমাদের উদ্দেশ্য ছিল পাকিস্তানের বিরুদ্ধে জনমত গঠন করা। কিন্তু পাকিস্তানী ছাত্রদের সেই অগণতান্ত্রিক কাজের ফলে আমাদের বক্তৃতার আগেই পাকিস্তানের বিরুদ্ধে তীব্র জনমত গড়ে উঠল এবং ছাত্রনেতাগণ সভায় তাঁদের ভাষণে বাংলাদেশের ছাত্রদের সঙ্গে একাত্মতা ঘোষণা করলেন।

সভায় যখন এমনি একটি পরিবেশ বিরাজমান, সেই সময় আমার ভাষণ দেয়ার আহবান

এলো। আমি মনে করলাম, আমার দিক থেকে আজকের ভাষণে যতদূর সম্ভব সংযম ও প্রশান্তি প্রকাশ প্রয়োজন। তাই রাজনৈতিক বক্তৃতার ধরন সম্পূর্ণ ত্যাগ করে ধৈর্য ও স্থৈর্যের সঙ্গে নিপীড়িত জনগণের মুক্তির কামনা ব্যক্ত করি। আমার সেদিনকার ভাষণে আমি পাকিস্তানী ছাত্রদের উস্কানিমূলক কাজের প্রত্যুত্তর দিলাম নমনীয় মনোভাবের দ্বারা। নরওয়ের ছাত্রদের আন্তরিক সহমর্মিতার কথা চিরদিন শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করতে হবে।

পঞ্চাশ

সাতই সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার সকালে নরওয়ে ত্যাগ করে সুইডেন বিমান বন্দরে পৌঁছেই দেখি আবদুর রাজ্জাক অপেক্ষা করছেন। আমার সঙ্গে ছিলেন আমার একান্ত সচিব রাজিউল হাসান রঞ্জু। আবদুর রাজ্জাক একজন উপচে পড়া উৎসাহী মানুষ। তাঁর সম্বন্ধে অনেক গল্প আছে। তিনি পাকিস্তান পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের একজন অফিসার ছিলেন। কয়েকটি পাকিস্তানী দূতাবাসে চাকরি করেছেন। শুধু তাকে নয়, দূতাবাসের যে কোন বাঙালী কর্মচারীকে কোন অবাঙালী কর্মচারী কোনভাবে অবহেলা বা অসম্মান করলে তার প্রতিবাদ করার সমুদয় দায়িত্ব যেন তাঁরই ছিল।

স্টকহোম পৌঁছার দু'ঘন্টা পরই বিশ্ববিখ্যাত অর্থনীতিবিদ গুনার মীরডালের সঙ্গে দেখা হলো। আবদুর রাজ্জাক তাঁর সঙ্গে আগেই সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা করে রেখেছিলেন এবং নির্ধারিত সময় আমরা উপস্থিত হলে তিনি আমাদের অভ্যর্থনা জানালেন। তাঁর কক্ষটির চারদিকের দেয়ালও ছিল বই দিয়ে ঘেরা। আমাদের স্বাধীনতা আন্দোলনের আনুপূর্বিক ঘটনা ব্যক্ত করলাম তাঁর কাছে। এতে তাঁর সহানুভূতিশীল মনে বেশ দাগ কাটে। বিমান বন্দর থেকে তাঁর অফিসে যাওয়ার পথেই রাজ্জাক আমাকে বলে রেখেছিলেন, গুনার মীরডালকে আমি যেন সুইডেনে বাংলাদেশ এ্যাকশন কমিটির চেয়ারম্যান হতে অনুরোধ করি। আমাদের সব কথা শুনে অধ্যাপক মীরডাল স্বভাবতঃই খুব অভিভূত হন। সেই সময়ে আমি তাঁকে বাংলাদেশ এ্যাকশন কমিটির চেয়ারম্যান হওয়ার জন্যে অনুরোধ করি। তিনি সানন্দে রাজী হলেন। আমি তখন আমার ব্রিফকেস থেকে বাংলাদেশের একটি পিতলের ব্যাজ বের করে তাঁর কোটে লাগাবার অনুমতি চাইলাম। তিনি সানন্দে সম্মতি দিয়ে উঠে দাঁড়ালে আমি ব্যাজটি লাগিয়ে তাঁর সঙ্গে করমর্দন করলাম এবং চেয়ারম্যান হতে সম্মত হওয়ায় বাংলাদেশের জনগণ ও সরকারের পক্ষ থেকে কৃতজ্ঞতা জানালাম। তারপরেও 'এশিয়ান ড্রামা'র রচয়িতা এই সর্বজনশ্রদ্ধেয় পন্ডিত ব্যক্তি আমাদের জন্য অনেকটা সময় দিলেন এবং বেশ কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তির সঙ্গে টেলিফোনে তাঁর নাম করে সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা করতে তাঁর সেক্রেটারীকে বললেন। শুনেছি, সুইডেনের প্রধানমন্ত্রী, পররাষ্ট্রমন্ত্রীসহ বহু বিখ্যাত ব্যক্তি

তাঁর ছাত্র।

সেদিনই অপরাহ্নে আবদুর রাজ্জাক, রাজিউল হাসান রঞ্জু এবং আমি স্টেন এন্ডারসনের সঙ্গে দেখা করি। তিনি তখন সুইডিশ সোস্যালিস্ট ডেমোক্রেটিক পার্টির সেক্রেটারী জেনারেল। তিনি অত্যন্ত মনোযোগের সঙ্গে আমাদের সব কথা শুনলেন। এই ধরনের মানব সেবায় নিবেদিতপ্রাণ ব্যক্তিদের কাছে অপরিচয় কোন বাধাই নয়। আমাদের সব কথা শুনে নিতান্তই আপনজনের মতো বলে উঠলেন, 'আমাদের পার্টির সমর্থন জানিয়ে দু'একটি প্রস্তাব পাস করে আমি সন্তুষ্ট হতে পারিনা। আপনাদের সত্যিকার সাহায্য করতে হলে আপনাদের বীর মুক্তিযোদ্ধাদের অস্ত্র সরবরাহ করতে হবে। আমি চেষ্টা করব, আমাদের পার্টি থেকে আপনাদের জন্য অস্ত্র সরবরাহ করতে।' আমি রাজ্জাককে দেখিয়ে বললাম, 'ইনি সুইডেন থাকেন, আপনার সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করবেন।' এন্ডারসন বললেন, 'আপনাদের কথা আমি আমার সহকর্মীদের জানাব। বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম সম্পর্কে তাঁদের ধারণা স্বচ্ছ থাকা চাই। আমাদের সমর্থন অবশ্যই আশা করতে পারেন। আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় যাতে আপনাদের সমর্থন করে সে জন্য জনমত তো গঠন করতেই হবে। তবে অস্ত্র সরবরাহ করতে পারলে সাহায্য হবে বাস্তব ও ফলপ্রসূ।' আমি আসন্ন স্ক্যান্ডেনেভিয়ান পররাষ্ট্রমন্ত্রী সম্মেলনের উল্লেখ করলাম এবং নরওয়ে সরকার আমাদের সমর্থন জানিয়ে কমিউনিকে বা সম্মিলনীর সরকারী বিবৃতি প্রকাশের প্রস্তাব দেবেন; একথা জানালাম। এন্ডারসন বললেন, 'এইটুকুতো আমাদের করতেই হবে।' তাঁকে ধন্যবাদ দিয়ে তাঁর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে গেলাম। সেখানে ক্যালবার্গের সঙ্গে দেখা করলাম। তাঁকেও বাংলাদেশের সংগ্রামের সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে পরিচিত করালাম। সেখান থেকে আমরা সুইডেনের প্রধানমন্ত্রীর প্রিন্সিপাল সেক্রেটারী পিয়ের শোরীর সঙ্গে দেখা করলাম। প্রধানমন্ত্রী সুইডেনে ছিলেন না। থাকলে অধ্যাপক মীরডালের টেলিফোনেই তাঁর সঙ্গে অনায়াসে দেখা করতে পারতাম।

আমরা পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সচিবের সঙ্গে দেখা করে সেদিনকার মতো আমাদের বাসস্থানে ফিরে এলাম। সুইডেনের বিশ্ববিদ্যালয়ে তখন ছুটি ছিল। ছুটির সময় ছাত্রাবাসের কক্ষগুলো নামমাত্র অর্থে ভাড়া দেওয়া হয়। নরওয়েতে আমি ছাত্রাবাসে ছিলাম। খরচ কমানোর জন্য আমার অনুরোধে আবদুর রাজ্জাক এখানে একটি ছাত্রাবাসে থাকার ব্যবস্থা করেন।

সন্ধ্যায় আবদুর রাজ্জাক আমাদের একটি রেস্টুরেন্টে নিয়ে গেলেন। সারাদিন পরিশ্রমের পরে সেখানে আমরা তিনজন অনেকক্ষণ গল্প করলাম।

পরের দিন ৮ই সেপ্টেম্বর আবার অল্পক্ষণের জন্য গুনার মীরডালের অফিসে গেলাম। আগেরদিন আমাদের দেখা সাক্ষাতের একটি বিবরণী দিলাম তাঁকে। তারপর সেখান থেকে সুপ্রীমকোর্টে গেলাম। অধ্যাপক মীরডালের সেক্রেটারী সুপ্রীমকোর্টে ফোন করে প্রধান বিচারপতির সঙ্গে আমার সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা করেছিলেন। তখন সুইডেনের সুপ্রীম কোর্টে ছুটি ছিল। সে সময় অস্থায়ী প্রধান বিচারপতি ছিলেন একজন মহিলা নাম মিসেস ইনগ্রিড গার্ডে ওয়াইডেমার। তাঁর সঙ্গে ছিলেন ই, ওয়াল বার্গ। অস্থায়ী প্রধান বিচারপতি ওয়াইডেমার বললেন, প্রধান বিচারপতি সুইডেনে না থাকায় তাঁর সঙ্গে আমার দেখা হলোনা

বলে তাঁরা দুঃখিত। আমি বললাম, 'আপনার সঙ্গে দেখা হওয়াতে আমি একইভাবে আনন্দিত।' বিচারপতি ওয়াইডেমার এবং বিচারপতি ওয়ালবার্থ দু'জনের মধ্যে একটি সহজ স্বাভাবিক নম্রতা দেখতে পেলাম। অবশ্য যেকোন দেশে সর্বোচ্চ বিচারালয়ের বিচারপতিদের মধ্যে এগুলো স্বাভাবিক। আইনের ঔদার্য প্রতিফলিত হয় ব্যবহারের নম্রতায় এবং সংকল্পের ইস্পাত কঠিন দৃঢ়তায়। তাঁরা নিজেরাই বাংলাদেশের পরিস্থিতি সম্পর্কে জানতে চাইলেন। যতটা সম্ভব সংক্ষেপে তাঁদের কাছে আমাদের অবস্থা তুলে ধরলাম।

আমরা অপরাহ্নে সুইডেনের পার্লামেন্ট হাউসে (সংসদ ভবন) গেলাম। সেখানে লিবারেল পার্টির হুইপ ইয়ান স্টিফেনামের সঙ্গে অত্যন্ত হৃদ্যতাপূর্ণ পরিবেশে আলাপ-আলোচনা হলো। আলোচনার সময় আরো কয়েকজন পার্লামেন্ট সদস্য উপস্থিত ছিলেন। তিনি নির্দ্বিধায় আমাদের বললেন যে, তাঁদের পার্টির সাহায্য ও সহানুভূতি আমাদের জন্য আছে এবং থাকবে। আমি তাঁকে বললাম, 'পাকিস্তানের সামরিক শাসন কর্তারাতো আর গণতান্ত্রিক মানসিকতা নিয়ে চিন্তা করেন না; তাই বিশ্ব জনমতকে উপেক্ষা করে চলার প্রবণতা তাদের স্বাভাবিক। তথাপি বিশ্বের শান্তিকামী মানুষের সমর্থন আমাদের আছে একথা জানলে তাদের মনে যে ভীতির সঞ্চার হবে তাতে হয়তো বা কিছু নিরীহ মানুষের প্রাণ রক্ষা পাবে। তাই উদারনৈতিক দলের উদার সাহায্য কামনা করে বাংলার মানুষ।' তিনি তাঁর পার্টির পক্ষ থেকে সমর্থনের আশ্বাস দিলেন।

এই সময়ই সুইডেনে অবস্থানরত বাঙালী দীপক লাহিড়ী বাংলাদেশের সাহায্যার্থে একটি ছবি প্রদর্শনীর আয়োজন করেন। আমাদের আন্দোলনে তিনি সক্রিয়ভাবে সহযোগিতা করেন। তখন তিনি সুইডেনে শিক্ষকতা করতেন।

সেদিনই আমরা সুইডেনের সুপ্রতিষ্ঠিত সাংবাদিক এবং 'এক্সপ্রেসেন ইভনিং ডেইলি' পত্রিকার সম্পাদক টমাস হ্যামানবার্গের সঙ্গে দেখা করি। তিনি অধ্যাপক গুনার মীরডালের সঙ্গে সম্পূর্ণ সহযোগিতা করে আমাদের সংগ্রামে সার্বিক সাহায্য দেওয়ার কথা সানন্দে বললেন। আমাদের সঙ্গে কিছু প্রচার পুস্তিকা ছিল। সেগুলোও তাঁকে দিলাম। তিনি বললেন, বাংলাদেশ সম্পর্কে সম্পাদকীয় লিখতে সেগুলো কাজে লাগবে।

পরদিন ৯ই সেপ্টেম্বর সকালে সাংবাদিক বো কার্লশন 'সভেন্‌স্ কা ডাগ ব্লাডেট' পত্রিকার জন্য আমার একটি বিশেষ সাক্ষাৎকার নেন। তিনি বাংলাদেশের সকল বিষয় সম্পর্কে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে অনেক প্রশ্ন করলেন। বাংলাদেশের সংগ্রামের একজন সমর্থক বলেই সব জানতে চাইলেন।

সেদিন অপরাহ্নে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অর্থনীতি প্রশাখার প্রধানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করি। সুইডেনের অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মতো তার মধ্যেও নম্রতা এবং সহমর্মিতা দেখতে পাই।

বিকেলে একটি সাংবাদিক সম্মেলনে বাংলাদেশ পরিস্থিতির বিশ্লেষণ করি। সম্মেলনে সুইডেনের প্রায় সব পত্রিকার প্রতিনিধি ছিলেন। তাঁদের প্রশ্নের ধারা থেকেই বুঝতে পারলাম বাংলাদেশের ঘটনাবলী তাঁরা উদ্বেগের সঙ্গে লক্ষ্য করে আসছেন। সত্যি কথা বলতে কি, কোন একটি বিষয় নিয়ে বিশ্বজনমত এভাবে চঞ্চল হয়ে ওঠেনি।

সন্ধ্যার পর একটু বেড়িয়ে ছাত্রাবাসে ফিরে এলাম, বলা বাহুল্য কাজের ফাঁকে ফাঁকে যখনই সময় পাওয়া গেছে রাজ্জাক গল্প করে কাটিয়ে দিয়েছেন। সাংবাদিক সম্মেলনে আমাদের বক্তব্য পরের দিনের সব পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

দশই সেপ্টেম্বর শুক্রবার 'এ্যাফটন ব্লাডেট' পত্রিকার খ্যাতনামা সম্পাদক ফ্রেডারিকসেনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলাম। তাঁর মধ্যেও লক্ষ্য করলাম, কর্মচাঞ্চল্য ও পান্ডিত্যের সমন্বয়। তিনি খুব দৃঢ়তার সঙ্গেই জানালেন যে, নিপীড়িত মানুষের সঙ্গে তিনি চিরদিনই ছিলেন, এখনো থাকবেন। তিনিও মীরডালের কমিটির সঙ্গে কাজ করার আশ্বাস দিলেন আমাদের।

১১ এবং ১২ই সেপ্টেম্বর যথাক্রমে শনি ও রোববার। ছুটির এই দুই দিন সুইডেনের ছাত্রাবাসেই কাটালাম। কেননা ফিনল্যান্ডে গিয়ে হোটেলে থাকতে হতো এবং স্বভাবতই খরচ পড়ত অনেক বেশী। সুইডেন ত্যাগের পূর্বে পররাষ্ট্র মন্ত্রী খন্দকার মোশতাক আহমদের নিকট একটি চিঠি লিখে আবদুর রাজ্জাককে সুইডেনে আমাদের প্রতিনিধিত্বের দায়িত্ব দিতে অনুরোধ করি।

একান্ন

তেরই সেপ্টেম্বর সোমবার সকালের প্লেনে ফিনল্যান্ডের রাজধানী হেলসিংকিতে পৌঁছলাম। আমি স্টকহোম থেকে টেলিফোনে হেলসিংকিতে রয়ফক্সকে আমার পৌঁছার খবর দিয়েছিলাম। রয়ফক্স হেলসিংকিতে বৃটিশ কনসাল জেনারেল। সেখানে বিমান বন্দরে পৌঁছেই রয়ফক্সকে দেখতে পেলাম। তিনি বিমান বন্দর থেকে আমাকে ও রঞ্জুকে তাঁর বাড়ীতে নিয়ে এলেন। তাঁর গাড়ীতে উড়ছিল বৃটিশ পতাকা ইউনিয়ন জ্যাক, আর আমার কোটে লাগানো বাংলাদেশের মানচিত্র আঁকা পিতলের ব্যাজ। দ্রুতবেগে এগিয়ে চলছে গাড়ী। এক সময় আমি তাঁকে বললাম, 'আপনি বৃটেনের কনসাল জেনারেল, আর আমি পাকিস্তানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণাকারী এক বাঙালী। পাকিস্তান আপনাদের বন্ধুরাষ্ট্র। এ অবস্থায় বিমান বন্দরে আমাকে সাদরে গ্রহণ এবং বাড়ীতে নিয়ে যাওয়াতে অসুবিধা হবে না আপনার ?' উত্তরে তিনি বললেন, 'আমি বৃটিশ সরকারের চাকরি করি, সরকারী দায়িত্ব পালনের জন্য আমার কাজের কোনরূপ ক্ষতি না করে আমি যদি আমার বন্ধুদের সঙ্গে আমার নিজস্ব সময় ব্যয় করি, সেক্ষেত্রে বৃটিশ সরকারের কোন কথা বলার অধিকার নেই। আমি আমার বন্ধুদের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করতে পারবনা, এরূপ একটি শর্ত আরোপ করলে সরকারকে নিশ্চয় ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। কেননা একজন বৃটিশ নাগরিক হিসেবে সকলের সঙ্গেই মেলামেশার অধিকার আমার আছে। এটি একটি মৌলিক অধিকার।' বললাম, 'এই অধিকারসহ অন্যান্য মৌলিক অধিকার

লাভের জন্য পাকিস্তানের বিরুদ্ধে আমাদের সংগ্রাম।'

তাঁর ড্রইং রুমে ঢুকেই তিনি ঢাকার ও আমাদের সংগ্রামের আদ্যপান্ত জানতে চাইলেন। ইতিমধ্যে লাঞ্চের সময় হলো। মিসেস রয়ফক্স আমাদের অভ্যর্থনা জানিয়ে এতক্ষণ লাঞ্চের ব্যবস্থা করতে ব্যস্ত ছিলেন। এবারে তিনিও আমাদের সঙ্গে যোগ দিলেন। সুরুচি ও সংস্কৃতি লক্ষ্যণীয় তাঁর আচার-ব্যবহারে। লাঞ্চের পরে রয়ফক্স বললেন যে, তিনি সেদিনই সরকারী কাজে হেলসিংকির বাইরে যাচ্ছেন। মিঃ এবং মিসেস রয়ফক্স দু'জনই আমাদেরকে তাঁদের ফ্ল্যাটে থাকতে খুব অনুরোধ করলেন। আমি তাঁকে বললাম যে, তাঁদের আন্তরিকতা আমার হৃদয় স্পর্শ করেছে। কিন্তু আমাকে অনেকের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করতে হবে, সাংবাদিক সম্মেলন করতে হবে। এসব তাঁর বাসস্থানে করা খুবই অন্যায় হবে। তিনি আমাকে রেলওয়ে স্টেশনের কাছে হোটেলে আমাদের জন্য রিজার্ভ করা কক্ষে পৌঁছে দিলেন।

ঢাকার আন্দোলনের কাহিনী যতটুকু সম্ভব বললাম রয়ফক্সকে। তিনি শুনলেন গণহত্যার নৃশংস বর্ণনা। তিনি জানতে চাইলেন বঙ্গবন্ধুর নিরাপত্তার কথা। বললাম, 'তিনি পাকিস্তানের কারাগারে আবদ্ধ, এইটুকু জানি মাত্র। বঙ্গবন্ধু বেঁচে আছেন, ভাল আছেন। এইটুকুই শুধু মাঝে মাঝে জানতে পারি আপনাদের পররাষ্ট্রমন্ত্রী লর্ড হিউমের কাছ থেকে।' তিনি বললেন, 'আহা! শেখ মুজিব আবার কারাগারে' ? এই বলে তিনি একটি হৃদয়স্পর্শী ঘটনার উল্লেখ করলেন। একদিন গুলশানে বৃটিশ ডেপুটি হাইকমিশনারের বাড়ীতে তিনি বঙ্গবন্ধুকে একা লাঞ্চে নিমন্ত্রণ করেছিলেন। লাঞ্চের পরে প্রশস্ত বারান্দায় বসে তাঁরা দু'জনে গল্প করছিলেন। রয়ফক্সের পোষা কুকুরটি এসে মাঝে মাঝেই বিরক্ত করছিল। রয়ফক্স বঙ্গবন্ধুর কথা শোনার জন্য উদগ্রীব। তাই কতক্ষণের জন্য তিনি কুকুরটিকে নিয়ে একটি কক্ষে রেখে বাইরে থেকে দরজা বন্ধ করে দেন। কুকুরটি তখন সেখান থেকে মাঝে মাঝে চিৎকার করে উঠছিল। বঙ্গবন্ধু যখন জানতে পারেন কুকুরটিকে আটকে রাখা হয়েছে, তাঁর মুখটা বিষণ্ণ হয়ে ওঠে। বলেন, 'আহা, রয়ফক্স, স্বাধীনতা হারালে কেমন লাগে আমি জানি, তুমি জান না। কুকুরটির মর্মস্পর্শী চিৎকারের পর আমার পক্ষে স্বাভাবিকভাবে কথা বলা সম্ভব নয়।' রয়ফক্স উঠে যেয়ে দরজা খুলে দিলেন। কুকুরটি এসে তাদের মাঝখানে মেঝেতে চুপ করে শুয়ে ছিল। তাদের গল্প চলতে থাকে।

বঙ্গবন্ধুর হৃদয়ের কোমলতার কথা উল্লেখ করে আমি রয়ফক্সকে বলি, "যাঁর নির্ভীকতা একমাত্র সুভাষ চন্দ্রের মধ্যে দেখেছি, বাঘের মতো যাঁর সাহস তিনিই আবার ফুলের মতো কোমল, এই ঘটনা তারই প্রকাশ।"

রয়ফক্স বৃটিশ কূটনীতিবিদ, সরকারী চাকরী করেন। কিন্তু আমাকে দ্বিধাহীনচিত্তে বললেন, কখনো কোন কাজ লাগলে তাঁকে বলতে যেন দ্বিধা না করি। তিনি লন্ডনে টেলিফোন করে মাঝে মাঝে আমার খবর নিতেন।

হোটেলে জিনিসপত্র রেখে রঞ্জুকে সঙ্গে নিয়ে আমি বিশ্বশান্তি পরিষদের অফিসে গেলাম। পরিষদের চেয়ারম্যান রমেশ চন্দ্র আমাদের সাদর অভ্যর্থনা জানালেন; বললেন, যে ক'দিন হেলসিংকিতে থাকি আমি যেন তাঁর অফিসকে নিজের অফিস বলে মনে করি। টেলিফোন

টেলেক্স ইত্যাদি ব্যবহার করতে যেন দ্বিধা না করি। তিনি আমাকে তাঁর অফিসের সব সহকর্মীর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন। তাঁরাও একই কথা বললেন।

সেখানে বসেই আমাদের হেলসিংকির সম্পূর্ণ কর্মসূচী তৈরী করলাম। এসব করতেই সন্ধ্যা হয়ে গেল। এরপর ফিরে এলাম হোটেলে। রাতে রমেশ চন্দ্র হোটেলে এসে নৈশভোজের জন্য আমাদের একটি রেস্টুরেন্টে নিয়ে গেলেন। সমস্ত দিন পরিশ্রমের পর রেস্টুরেন্টের শান্ত পরিবেশ খুব ভাল লাগছিল আর তার চেয়েও ভাল লাগছিল রমেশ চন্দ্রের প্রীতিপূর্ণ ব্যবহার। আমাদের স্বাধীনতার জন্য তাঁর আন্তরিকতা আমরা প্রথম থেকেই অনুভব করছিলাম।

পরদিন সকালে হোটেলে এসে ফিনল্যান্ড টেলিভিশন আমার একটি সাক্ষাৎকার নিয়ে গেল। তাঁদের প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়েই আমাদের বক্তব্য তুলে ধরার সুযোগ পেলাম। অপরাহ্নে ছাত্রদের আয়োজিত সভায় বক্তৃতা করলাম। ছাত্রদের সভার পর পার্লামেন্ট হাউসে গিয়ে অনেক সদস্যের সঙ্গে দেখা করি। খুব সহানুভূতিপূর্ণ ব্যবহার পাই তাদের কাছ থেকে। পার্লামেন্ট সদস্য পেরটি হেনিনেন আমাদের সঙ্গে সহৃদয় ব্যবহার করলেন এবং পরিচয় করিয়ে দিলেন বেশ কিছু সদস্যের সঙ্গে। এম,পি, অসমো কক সে বছর ফিনল্যান্ডের প্রতিনিধি হয়ে কয়েক দিনের মধ্যে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে যোগ দিতে যাবার কথা। তিনি ফিনল্যান্ড সরকারকে আমাদের সংগ্রাম সম্পর্কে অবহিত করা এবং জাতিসংঘেও আমাদের সমর্থনে কাজ করার আশ্বাস দিলেন। পার্লামেন্ট সদস্য মীরজামভিরে বোমিনিভের কাছেও সদয় ব্যবহার পেলাম।

পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে আমাদের স্বাগত জানালেন অস্টোট্যাংকা। তিনি পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের একজন পদস্থ কর্মকর্তা। তিনি বলেন যে, বাংলাদেশের আন্দোলনের কথা ফিনল্যান্ড সরকার অবহিত আছেন এবং গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে আমরা নিঃসন্দেহে তাঁদের সহায়তার আশা করতে পারি। আমরা তাঁদের ধন্যবাদ দিয়ে ফিনল্যান্ডের সুপরিচিত সংবাদপত্র 'সুয়োম্যান মোসিয়লি ডোমোএনাত'-এর অফিসে যাই। সুয়োম্যান শব্দের অর্থ ফিনল্যান্ডীয় ভাষায় ফিনল্যান্ড। সম্পাদক কেরী ভার ভিকিকোর সঙ্গে অনেকক্ষণ আলোচনা হলো। তাঁকে বাংলাদেশে রক্তপাত বন্ধ এবং আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের সমর্থনে তাঁর শক্তিশালী লেখনী পরিচালনার অনুরোধ জানালাম। তাঁকে বিশেষ করে বলি, 'সাড়ে সাত কোটি বাঙালীর নেতা শেখ মুজিবের কোন খবরই পাচ্ছি না। আন্তর্জাতিক রেডক্রস এবং অন্যান্য সংস্থা তাঁর সঙ্গে দেখা করতে ব্যর্থ হয়েছে। এমনকি আমাদের পাঠানো আইনজীবী শোন ম্যাকব্রাইডকে পাকিস্তান সরকার তাঁর সঙ্গে দেখা করতে দেয়নি। আমি তাঁর পত্রিকায় এই অন্যায়ের প্রতিবাদ দেখতে চাই, বললাম। এ ব্যাপারে তাঁর কাছ থেকে আশ্বাসও পেলাম।

আমি সেদিনই ফিনল্যান্ডের সুপ্রীম কোর্টের জজ ভ্যাটিও সারিওর সঙ্গে দেখা করি। তিনি তখন মানবাধিকার কমিশনের সদস্য। কয়েক মাস আগে জেনেভায় তাঁর সঙ্গে কাজ করেছিলাম। তিনিও জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের সভার সময় নিউইয়র্কে যাবার সম্ভাবনার কথা বললেন এবং সেখানে যতদূর সম্ভব সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি দিলেন আমাদের। ফিনল্যান্ডের আরো দু'জন এমপি গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় আমাদের সকল প্রকার

সাহায্যের আশ্বাস দেন। এঁরা হলেন, এস্কিট্যুয়োমিওরা এবং এভিপারহিন্ডুপা। সেই দুর্দিনে এঁদের উৎসাহব্যঞ্জক কথা আমাদের চলার পথে উদ্দীপনা জুগিয়েছে।

হেলসিংকি ত্যাগের সময় সকলের কথা, বিশেষ করে শান্তি পরিষদের কথা মনে পড়ছিল। পরিষদের সচিবালয়ের প্রত্যেকেই আমাদের প্রতি অত্যন্ত সহানুভূতিশীল ছিলেন। আজ এতদিন পরেও কয়েকজনের নাম বিশেষ করে মনে পড়ছে। এলেন হ্যামারশ্ল্যাগ অস্ট্রিয়ার অধিবাসী। তিনি ৬টি ভাষা জানতেন। এই বিদুষী মহিলা বাংলাদেশের অত্যাচারের কাহিনী বিভিন্ন ভাষাভাষীর কাছে কি মমত্বের সঙ্গেই না প্রকাশ করতেন। ঐ অফিসে তখন আর্জেন্টিনার একজন লেখক ছিলেন–তাঁরও হৃদ্যতার কথা ভুলব না, তাঁর নাম এলফ্রেডো ভেরেরা। একই অফিসের টাইপিস্ট ক্যারোলিনা গ্রাভিনস্কাকে দিয়ে আমরা অনেক কিছু টাইপ করিয়েছি–এঁদের ব্যবহারে মনে হতো এঁরা কেউই এ অফিসে চাকরি করছেন না, তাঁরা প্রত্যেকেই মানবিকতার আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে সত্য প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে লিপ্ত। পৃথিবীর নানা প্রান্তে কত চেনা অচেনা মানুষের কাছে তাঁদের আন্তরিক সহানুভূতি এবং মমত্ববোধের জন্য আমরা—বাঙালীরা চিরঋণী হয়ে আছি।

বায়ান্ন

চৌদ্দই সেপ্টেমবর সন্ধ্যায় কৃতজ্ঞচিত্তে হেলসিংকি ত্যাগ করে ডেনমার্কের রাজধানী কোপেনহেগেনে পৌঁছলাম। বিমান বন্দরে মতিউর রহমান এবং লিয়াকতসহ কয়েকজন কর্মী আমাদের স্বাগত জানালেন। একজন ডেনিশ মহিলা বাঙালীদের বেশ সাহায্য করছিলেন। তার নাম মিমি ক্রিস্টিয়ান সেন। তাঁর বাড়ীটি বেশ বড়। সেখানে আমার ও রঞ্জুর থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। প্লেনেই আমরা রাতের খাবার খেয়ে নিয়েছিলাম।

পরদিন সকালে আমাদের কাজ শুরু করলাম। সকাল দশটায় আমরা ডেনমার্কের বহুল প্রচারিত দৈনিক পত্রিকা 'ইনফরমেশন' অফিসে গিয়ে সম্পাদক পলট স্তিস্ট্রাপ নিয়েলসেনের সঙ্গে দেখা করি। এই পত্রিকায় কয়েকজন সম্পাদক আছেন। নিয়েলসেন বিদেশ সংক্রান্ত বিষয়ে সম্পাদকীয় লেখেন। তাঁর সঙ্গে আলাপ করে খুব খুশী হলাম। দেখলাম আমাদের ঘটনাগুলো তাঁর শুধু জানাই নয়, সে সব সম্পর্কে তাঁর বিশ্লেষণের যৌক্তিকতাও আমাকে মুগ্ধ করে। তিনি এর আগেও আমাদের সংগ্রাম সমর্থন করে সম্পাদকীয় লিখেছেন এবং ভবিষ্যতে আরো লিখবেন বলে আমাকে জানালেন। তাঁকে আমি বললাম, আপনার ওপরে দাবী করার কোন অধিকার আমার নেই। আপনি যথেষ্ট করছেন, কৃতজ্ঞচিত্তে আমরা সেগুলো অনুভব করি। কিন্তু দাবী করার একটি সূত্র আমি এখন পেয়েছি। আপনার সম্পাদকীয় আর আপনার

মনোভাব আমার কাছে আপনাকে একজন হৃদয়বান মানুষরূপে তুলে ধরেছে সেই দাবীতেই আমি আশা করে থাকব যে, আপনার শক্তিশালী লেখনী দিয়ে বিশ্বের বিশেষ করে বাংলাদেশের নিপীড়িত মানুষের জন্য সমর্থন জানাতে থাকবেন, গঠন করবেন সঠিক জনমত।

আমি কয়েকটি বিষয়ের প্রতি তাঁকে দৃষ্টি রাখতে অনুরোধ করলাম, পাকিস্তান যেন কোনক্রমেই ডেনমার্ক বা অন্য কোন দেশ থেকে অস্ত্র সংগ্রহ করতে না পারে। এ ব্যাপারে দৃঢ় অসহযোগিতার পরিবেশ তাঁরাই সৃষ্টি করতে পারেন। রাষ্ট্রের মূল স্তম্ভ মানুষ, সরকারী কাঠামো নয়। বাংলাদেশের মানুষ আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারের বলে স্বাধীনতা ঘোষণা করেছে। একটা দেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষ বড় না হয়ে শুধুমাত্র বিদেশী ব্যক্তির দ্বারা পরিচালিত সরকারী কাঠামো বড় হতে পারে না। ঢাকায় পাকিস্তানের একটি জনবিচ্ছিন্ন কাঠামো আছে; শাঁসটিকে বাদ দিয়ে খোলসটির মতো। পাকিস্তানীদের বাংলাদেশের শাসনকর্তা মনে করলে খোলসটাকে স্বীকৃতি দেয়া হবে। ডেনমার্কের সহানুভূতিশীল সরকার জনগণের অনুপ্রেরণা পেলে নিশ্চয়ই আমাদের স্বীকৃতি দেবেন। তিনি আমাকে বললেন, 'ডেনমার্ক উপলব্ধি করে যে, বাংলাদেশের জনগণ পাকিস্তানকে প্রত্যাখ্যান করেছে। কিন্তু যতদিন পর্যন্ত পাকিস্তানীরা আপনাদের রাজধানী ঢাকায় অবস্থান করছে; বেতার, টেলিভিশন, ডাক বিভাগ ইত্যাদি পরিচালনা করছে, অনিচ্ছায় হলেও তাদের দ্বারা শাসিত হচ্ছে, ততদিন কোন বিদেশী সরকারের পক্ষে আপনাদের সরকারকে স্বীকৃতি দেয়া সহজ হবে না। সাধারণ রীতিনীতি থেকে ব্যতিক্রমপন্থী একটি রাষ্ট্র পাওয়া সহজ নয়। তাই ঢাকা দখল করতে হবে এবং সে ব্যাপারে যাতে বিশ্ববাসীর সাহায্য পান সে চেষ্টা চালাতে হবে।' অমি বললাম, 'আমাদের মুক্তিযোদ্ধাগণ মরণপণ করে সেই সংগ্রামই চালাচ্ছেন। ঢাকার বুকে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলিত না হওয়া পর্যন্ত আমাদের জয়যাত্রা থামবে না। আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রের বিরুদ্ধে আমাদের মুক্তিবাহিনী শুধুমাত্র মনের বল ও রণ-নৈপুণ্যের দ্বারা সেকেলে অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে।'

নিয়েলসেনকে আরো বলি, 'শেখ মুজিব একটি দেশের রাষ্ট্রপতি। সেদেশের নাম বাংলাদেশ। তাঁর বিদ্রোহ অন্য একটি দেশের বিরুদ্ধে। সে দেশের নাম পাকিস্তান। পাকিস্তানের আগ্রাসনের বিরুদ্ধে প্রতিআক্রমণ চালানোয় কেউ দেশদ্রোহী হতে পারেন না। অথচ দেশদ্রোহের অভিযোগে বাংলাদেশের নির্বাচিত প্রতিনিধিবৃন্দের নেতা আজ কারাগারে বন্দী এবং বাংলাদেশসহ বিশ্বের সকল দেশ থেকে বিচ্ছিন্ন জীবনযাপন করছেন। নিয়েলসেন তাঁর সম্পাদকীয়তে এসব কথা তাঁর দেশবাসীকে মাঝে মাঝেই মনে করিয়ে দেবেন বললেন। আমাদের ডেনমার্কের কাজের শুভ সূচনা আমাকে যথেষ্ট আনন্দ দান করে।

সেখান থেকে আমার তরুণ বাঙালী বন্ধুগণ আমাকে পার্লামেন্ট ভবনে নিয়ে গেলেন। সেখানে আমি বেশ কয়েকজন সংবেদনশীল মানুষের সংস্পর্শে আসি। পার্লামেন্টের সদস্যদের বিশ্রাম কক্ষে অনেকের সঙ্গে আলাপ হলো। সংক্ষিপ্ত আলাপের মাঝে যতটুকু সম্ভব বাংলাদেশ পরিস্থিতি তাঁদের গোচরে আনতে চেষ্টা করলাম। এতদিন পরেও কৃতজ্ঞতাভরে যাঁদের কথা মনে পড়ছে, তাঁদের মধ্যে রয়েছেন এ্যানস্টিনাস, গার্ড পিটারসন এবং কিয়েল অলস্যোন।

এঁরা বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সদস্য হলেও বাংলাদেশের ব্যাপারে অভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী পোষণ করতেন। এঁদের মধ্যে পিটারসেন ও অলস্যোন আসন্ন জাতিসংঘের সাধারণ অধিবেশনে যোগদানের জন্য সপ্তাহখানেকের মধ্যেই নিউইয়র্ক যাচ্ছেন বললেন। আমি তাঁদের বললাম যে, নিউইয়র্কে আমার বাঙালী সহকর্মীগণ তাঁদের সঙ্গে যোগাযোগ করবেন। কারণ তখনও আমার নিউইয়র্ক যাবার কথা জানতাম না। সেখান থেকে আমরা টিভি স্টেশনে গেলাম। ডেনমার্কে গঠিত বাংলাদেশ এ্যাকশন কমিটি টিভি সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা করেছিল। ছয়–সাতজন বাঙালীর প্রচেষ্টায় গঠিত এই এ্যাকশন কমিটিতে ডেনমার্কের নাগরিকই বেশী। কমিটির আহবায়িকা কিস্টেন ওয়েস্টগার্ড খুবই উৎসাহের সঙ্গে কাজ করছিলেন। এই মহিলা একজন বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ। ১৯৭১–এর পঁচিশে মার্চ তিনি ঢাকায় ছিলেন। কয়েকদিন আগে কুমিল্লার পল্লী উন্নয়ন একাডেমীতে অর্থনৈতিক পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা করতে এসেছিলেন। সেদিনকার হত্যাযজ্ঞ নিজের চোখে দেখেছিলেন বলেই দেশে যেয়ে ভুলতে পারেন নি। কোপেনহেগেনে তাঁর অফিসে যেয়ে দেখলাম বঙ্গবন্ধুর ছবি। রাতে তাঁর বাড়ীতে রিসেপশনের ব্যবস্থা করেছিলেন। সেখানে অনেকের সঙ্গে দেখা হল। তিনি আমাদেরকে টিভি স্টেশনে নিয়ে এলেন। সেখানে একটি হৃদয়স্পর্শী ঘটনা ঘটে। যে ভদ্রলোক সাক্ষাৎকারটি পরিচালনা করছিলেন, তিনি কাজ শুরু করার আগে আমাকে জানালেন যে, তাঁর কানে এসেছে পাকিস্তান সরকার ডেনমার্কের একজন অস্ত্র ব্যবসায়ীকে অস্ত্র সরবরাহের অনুরোধ জানিয়েছে। তিনি বললেন যে, তাঁর একটি প্রশ্নের উত্তরে আমি যেন খুব জোরের সঙ্গে এই অস্ত্র সরবরাহের প্রতিবাদ করি এবং অস্ত্র সরবরাহ বন্ধ করার জন্য যেন ডেনমার্ক সরকার এবং জনগণের নিকট আবেদন জানাই। নানা প্রশ্নের মধ্যে আমাকে জিজ্ঞেস করা হয়, 'পাকিস্তান কি ইউরোপ থেকে অস্ত্র সংগ্রহ করছে ?' উত্তরে আমি বললাম, 'ইউরোপ গণতন্ত্রে বিশ্বাসী, তাই গণতন্ত্রের হত্যাকারী পাকিস্তানকে অস্ত্র সাহায্য দিয়ে গণতন্ত্রকে ধ্বংস করতে পারে না, এই আমাদের বিশ্বাস। সাহায্য অর্থ শুধুমাত্র সহানুভূতি প্রদর্শন বা অর্থ সাহায্য নয়, এর অর্থ শত্রুকেও কোনভাবে সাহায্য না করা। তাই আমি আশা করব, গণতন্ত্রে অটল বিশ্বাসী ডেনমার্ক কখনো পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীর স্বৈরশাসন চিরস্থায়ী করার উদ্দেশ্যে তাকে অস্ত্র সরবরাহ করবে না। তাদের অস্ত্র সরবরাহ করার ফলে যে নারী নির্যাতন, শিশু হত্যা ও নির্দোষ মানুষের প্রাণহানি হবে, তার জন্য দায়ী থাকবে অস্ত্র সরবরাহকারী দেশ। আমি আশা করি, এ ব্যাপারে ডেনমার্কের সচেতনতা অন্য দেশকেও অস্ত্র সরবরাহ বন্ধ করতে দৃঢ়সংকল্প করবে।' সাক্ষাৎকার গ্রহণকারী ভদ্রলোক আমার একান্ত সচিব রবিউল হাসান রঞ্জুর সঙ্গে টাই বিনিময় করেন এবং বাংলাদেশ মানচিত্র আঁকা টাই পরে আমার সাক্ষাৎকার নেন।

ডেনমার্কে আমরা পার্লামেন্টের স্পীকারের সঙ্গে দেখা করি। গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় আমাদের সংগ্রামের সাফল্য তিনি কামনা করেন। পার্লামেন্টের একটি বৈদেশিক কমিটিও আছে। সেই কমিটির সদস্যগণ আমাদের সঙ্গে বাংলাদেশ পরিস্থিতি নিয়ে খোলাখুলি আলোচনা করলেন। সংবাদপত্রের স্বাধীনতা হরণ, নির্বাচিত প্রতিনিধিদের আইন পরিষদে সমবেত হতে না দেয়া

এবং পাকিস্তানের বৈষম্যমূলক নীতিতে তাঁরা স্বভাবতঃই ক্ষুব্ধ হন। আমরা ডেনমার্কের সহানুভূতি পাবার আশ্বাস লাভ করি। উক্ত কমিটির চেয়ারম্যান কিয়েল অলস্যোন খুবই প্রভাবশালী ব্যক্তি। তিনি আমাদের সকল প্রকার সাহায্য করার কথা বেশ জোর দিয়ে বলেন। আমাদের দেখা করার মাস দুয়েক পর তিনি ডেনমার্কের প্রতিরক্ষামন্ত্রী হন। এঁদের সকলের চেস্টার ফলেই পাকিস্তানকে অস্ত্র সরবরাহের জন্য যে কটি ব্যবসায়ী প্রতিস্ঠান চুক্তি সম্পাদন করেছিল তারা যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে পাকিস্তানে অস্ত্র সরবরাহ করতে অসমমতি জ্ঞাপন করে। আমাদের এই সাফল্যের মূলে ছিলেন পার্লামেন্টের সদস্যবৃন্দ, বিশিস্ট জননেতা পল হার্টলিং এবং কে, বি এন্ডারসনের সহানুভূতি। তাঁরা তাঁদের প্রচুর ব্যস্ততার মধ্যেও আমাদের সঙ্গে অল্পক্ষণের জন্য দেখা করেন এবং বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ যাতে পাকিস্তানে অস্ত্র সরবরাহের দ্বারা কোনরূপ ব্যাহত না হয় সেদিকে সতর্ক দৃস্টি রাখবেন বলে জানান। পররাস্ট্র মন্ত্রণালয়ে দক্ষিণ এশিয়া বিভাগের প্রধান স্যান একজন বিশিস্ট কূটনীতিবিদ। তিনি কয়েক দিনের মধ্যেই স্ক্যান্ডেনেভিয়ান পররাস্ট্রমন্ত্রী সম্মেলনে যোগ দেবেন। নরওয়ে আমাদের সমর্থনে যে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছে তিনি সেকথা জানতেন। স্ক্যান্ডেনেভিয়ান দেশসমূহের আসন্ন পররাস্ট্রমন্ত্রী সম্মেলনে বাংলাদেশ পরিস্থিতি নিয়ে কমিউনিকে প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা নরওয়ে ইতিমধ্যে তাঁদেরকেও জানিয়েছে এবং এই প্রচেষ্টা তাঁদের পূর্ণ সমর্থন লাভ করবে একথা আমরা জানতে পারলাম। পরের দিন ষোলই সেপ্টেম্বর সমস্ত দিন কর্মব্যস্ততায় কাটল। সকাল দশটায় জাতিসংঘের আসন্ন সাধারণ পরিষদে যোগদানকারী প্রতিনিধিদলের নেতার সঙ্গে সাক্ষাৎ করি। তিনি জাতিসংঘে অন্যান্য দেশের প্রতিনিধিদের নিকট বাংলাদেশের পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করবেন এবং আমাদের পক্ষে জনমত গঠনে সহায়তা করবেন, এই আশ্বাস তাঁর কাছ থেকেও পাই।

আমরা বিস্ময় মিশ্রিত আনন্দের সঙ্গে স্ক্যান্ডেনেভিয়ান দেশসমূহে একইরূপ মনোভাব দেখতে পাই। 'পলিটেকেন' ডেনমার্কের একটি অতি প্রভাবশালী দৈনিক পত্রিকা। এই পত্রিকাটি আন্তর্জাতিক দৃষ্টিভঙ্গী থেকে রাজনৈতিক বিষয়াদি জনগণের সামনে তুলে ধরে। এই পত্রিকার সম্পাদক জন ডানস্ট্রাপ সাংবাদিক মহলে নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি এবং আন্তর্জাতিক বিষয়ে তাঁর মতামত ডেনমার্কের জনগণকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে। পূর্ব নির্ধারিত সাক্ষাৎকারের সময়ানুযায়ী সকাল এগারটার দিকে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গেলে তিনি স্মিতহাস্যে আমাদের স্বাগত জানান এবং মিনিট খানেকের মধ্যেই এমন অন্তরঙ্গতার সঙ্গে কথা বলতে শুরু করলেন যেন আমাদের সঙ্গে কতকালের চেনা। আমি আরো কয়েকজন ব্যক্তিত্বের মধ্যে এই বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করেছি। মানুষের মধ্যে এরূপ একটি ভাবধারা তখনই সৃষ্টি হয়, যখন তাঁদের অন্তরের স্বচ্ছ-চিন্তাধারা স্বাভাবিকভাবে বাইরে প্রকাশ পায় এবং সেই চিন্তাধারা যখন অভিজ্ঞতা ও নির্ভুল জ্ঞানের দ্বারা মানুষকে দ্বিধাদ্বন্দ্বের বাইরে একটি নির্ধারিত কর্মপন্থায় উদ্বুদ্ধ করে। শুধু তাই নয়, অন্যকেও বিশ্বাস করে কাছে টেনে নিতে সক্ষম হয়। আমাদের দিক থেকে একথা আজ প্রায় পনের বছর পরে বিনাদ্বিধায় বলতে পারি যে, এই অপরিচিত মানুষটির সঙ্গে দেখা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই মনে হলো নিতান্ত আপনজনের কাছে এসে

পড়েছি। এটি আমি বেশ কয়েকটি বিশিষ্ট ব্যক্তির মধ্যে লক্ষ্য করেছি। এই চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের মূল কারণ আন্তরিকতা ও সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের বিচক্ষণতা। এখানে আরো একটি জিনিস আমাকে প্রায় মুগ্ধ করে। সেটি হচ্ছে যে, দেখা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের সমস্যাগুলো সম্পর্কে অভিমত প্রকাশ করতে থাকলেন। তিনি তার মতবাদকে পুনঃ পুনঃ বিশ্ববাসীর কাছে তুলে ধরবেন, এই আশাই আমরা ব্যক্ত করলাম।

সেদিনই অপরাহ্নে আমাদের সাংবাদিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হলো। ডেনমার্কের বাংলাদেশ এ্যাকশন কমিটি এবং কয়েকজন বাঙালীর প্রচেষ্টায় এই সম্মেলনে ডেনমার্কের রাজধানী কোপেনহেগেনে প্রতিটি দৈনিক, সাপ্তাহিক এবং সংবাদ সংস্থার প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। এখানে বাঙালীর সংখ্যা এত কম ছিল যে, এখানকার এ্যাকশন কমিটিকে ডেনমার্কের অধিবাসীদের সংগঠনই বলা চলে। আমাদের স্বাধীনতা ঘোষণার আদর্শগত শক্তি এই সাংগঠনিক সাফল্যের কারণ।

ডেনমার্কের এ্যাকশন বাংলাদেশ কমিটির তরফ হতে প্রতি মাসে ডেনমার্কের ভাষায় একটি সংবাদ বুলেটিন প্রকাশিত হচ্ছিল। তাঁরা স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে এই পত্রিকা প্রকাশ করেন। বুলেটিনের প্রচ্ছদপটে থাকতো বাংলাদেশের মানচিত্র এবং শিরোনামে থাকতো বাংলাদেশ সংবাদ। বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যম থেকে তথ্য সংগ্রহ করে এটি সংকলন করতেন কির্স্টেন ওয়েস্ট গর্ড, পল সভাইস্ট্রাপ এবং লিজবেত আর্ন। এদের একাগ্রতা ও কর্মচাঞ্চল্য দেখে আমি বিস্মিত হই। শুধু মানবিকতার কারণে বাংলাদেশের প্রতি তাঁদের এই সমর্থন আমাদেরকে কৃতজ্ঞতার বন্ধনে আবদ্ধ করেছে।

আগে উল্লেখিত সাংবাদিক সম্মেলনে আমার প্রারম্ভিক ভাষণ ও প্রশ্নোত্তরে বলি যে, আমরা যা চাই তা নিয়ে বিশ্বে আজ মতবিরোধ নেই বললেই চলে। পৃথিবীর সকল দেশই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে যে, জনগণ দ্বারা নিরপেক্ষ এবং সঠিক নির্বাচনের মাধ্যমে নির্বাচিত প্রতিনিধিবৃন্দ দেশ শাসন করবেন। সংক্ষিপ্ত এবং সহজ ভাষায় একেই বলা হয় গণতন্ত্র। আমাদের দেশটি সতেরশ' সাতান্ন খৃষ্টাব্দের পর থেকে ইংরেজ নানাভাবে এবং নামে বেনামে শাসন করেছে। আঠার 'শ সাতান্নর পর বেনামীতে শাসন করার কৌশলগত কারণ আর তাঁরা দেখতে পান না। তাই বৃটেনের প্রজা হিসেবে ভারতবর্ষ শাসিত হয়েছে। এই শাসন কোনভাবেই গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা ছিল না, একে সামরিক শাসনও বলা চলে না। কেননা, সামরিক বাহিনী শাসন করতো না। কিন্তু বেসামরিক কর্মকর্তাগণ সামরিক শাসনের পদ্ধতি অনুযায়ী এই উপমহাদেশ শাসন করেন। অর্থাৎ এই উপমহাদেশের মানুষ তাদের ভাল-মন্দ নির্ধারণ করতেন না। আমাদের সুখ এবং স্বাচ্ছন্দ্য নির্ধারণ করার শ্রম এবং কষ্টসাধ্য কর্তব্যটি বৃটিশ পার্লামেন্টের নির্দেশ অনুযায়ীই পালিত হতো। এই অবস্থার অবসানের জন্য প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রাম হয় আঠারশ' সাতান্ন খৃষ্টাব্দে। ইংরেজরা তার নাম দেয় সিপাহী বিদ্রোহ। সেটি ব্যর্থ হবার পর বহু সংগ্রাম এবং প্রাণ বিসর্জনের ফলে শেষ পর্যন্ত ইংরেজগণ আমাদের দেশের সার্বিক উন্নতি পরিকল্পনা নিতান্তই দুঃখিত অন্তঃকরণে ত্যাগ করে অশ্রুসজল চোখে সদাগররা ভারতবর্ষ থেকে বিদায় নেন। আনন্দের প্লাবন সেদিন এই উপমহাদেশকে করেছিল উদ্বেল ও

বিহ্বল। ভারতবর্ষের যে অংশ বিভক্ত হয়ে পাকিস্তান নাম গ্রহণ করল সেখানে চলছে সামরিক শাসন অর্থাৎ দেশের ভাল-মন্দ নির্ধারণের মতো দুরূহ ও শ্রমসাধ্য কাজ নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও এবং ব্যথিত অন্তঃকরণে পশ্চিম পাকিস্তানের সামরিক বাহিনী প্রধানদের গ্রহণ করতে হয়। এক কথায় বলতে গেলে অবিভক্ত পাকিস্তানের চব্বিশ বছরের ইতিহাস মাত্র কয়েকটি বছর বাদ দিলে এদের শাসনের ইতিহাস। কখনো এই শাসন চলেছে প্রকাশ্যে, কখনো বা অপ্রকাশ্যে। যখনই নির্বাচন সংগঠিত হতে চলেছে তখনই কোন না কোন অজুহাতে এই শাসন প্রবর্তিত হয়েছে। এই ইতিহাস দীর্ঘায়িত না করে এইটুকু বলা চলে যে, গণতন্ত্রমনা বাংলাদেশের মানুষের দাবীতেই শেষ পর্যন্ত উনিশশ' সত্তর সনে একটি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। সাড়ে সাত কোটি বাঙালী একবাক্যে শেখ মুজিব পরিচালিত আওয়ামী লীগকে ভোট দিয়ে প্রাদেশিক ও কেন্দ্রীয় পরিষদে একক সংখ্যাগরিষ্ঠ দলে পরিণত করে। জনগণ আশা করেছিল এইবারে তারা চিন্তার, কথা বলার স্বাধীনতা লাভ করবে। লাভ করবে তারা বিচার বিভাগের স্বাধীনতা। তাদের এই সংগ্রাম আদর্শগতভাবে বিশ্বের সকল গণতান্ত্রিক শক্তির বিজয় ছিল। আর আজ যে অকথিত নিপীড়ন তারা সহ্য করছেন সেটাও গণতন্ত্রকামী মানুষের প্রতিনিধিরূপেই তাদের উপর নেমে এসেছে। তাই আদর্শগতভাবে এই সংগ্রাম ভৌগোলিক সীমারেখা অতিক্রম করে সকল দেশের, সকল মানুষের সংগ্রামে পরিণত হয়েছে এবং সেই সংগ্রামে ডেনমার্কের অধিবাসীবৃন্দ সক্রিয় সাহায্য দান করবেন, এই আশা নিয়েই ডেনমার্কের জনগণের কাছে এসেছি।

সাংবাদিকগণ মুক্তিযুদ্ধের বর্তমান অবস্থা এবং ভাবী সাফল্য কতটুকু আশা করা যায় জানতে চাইলেন। আমি তাঁদের কাছে বাংলাদেশের যুদ্ধকালীন অবস্থা যা জানতে পেরেছি নিঃসংশয়ে তুলে ধরলাম।

এই সম্মেলনে একজন সাংবাদিক প্রশ্ন করেন, 'আমরা শুনতে পাচ্ছি প্রবাসী বাংলাদেশ সরকার ইসরায়েলের নিকট থেকে সাহায্য নিচ্ছে। কথাটা কি সত্যি ?' আমি এর উত্তরে খুব জোর দিয়ে বললাম, 'সর্বৈব মিথ্যা। এটি পাকিস্তান মিথ্যা প্রচারণা করে বেড়াচ্ছে ; এর উদ্দেশ্য বাংলাদেশ সরকারকে মুসলিম রাষ্ট্রসমূহের কাছে অপ্রিয় করা। কিন্তু তাদের সে চেষ্টা ব্যর্থ হবে। সত্য চিরদিন জয়ী হয়ে এসেছে এবং হবেও।' তারপর বললাম, 'এই প্রচারণাটি নতুন নয়, আমি লন্ডন থেকে বেরুবার আগেই এই প্রচারণার কথা শুনেছি এবং বাংলাদেশ সরকারের প্রতিনিধিরূপে আমি এর প্রতিবাদ অনেক আগেই করেছি। এবং পরে বাংলাদেশ সরকারও এই মিথ্যা প্রচারণার প্রতিবাদ করেছেন।'

সাংবাদিক সম্মেলনের পরে কন্টাক্ট নামে খ্যাত একটি পত্রিকা আমার বিশেষ সাক্ষাৎকার গ্রহণ করে।

এখানেও দেখলাম ঐক্যবদ্ধ শক্তির অভাবিত সাফল্য। লিয়াকত হোসেন, মতিউর রহমান প্রমুখ বাঙালীর প্রচেষ্টাতে ডেনমার্কে এমন একটি সংগঠন গড়ে উঠতে পেরেছে। এ ব্যাপারে কয়েকজন ডেনিশ মহিলা প্রায় সর্বস্ব পণ করে স্বাধীনতা সংগ্রামে লিপ্ত হয়েছিলেন। এই সংগঠনের প্রাণকেন্দ্রে ছিলেন আহবায়িকা কির্স্টেন ওয়েষ্ট গার্ড। সেদিন সন্ধ্যা সাড়ে সাতটার

দিকে লন্ডনের উদ্দেশ্যে কোপেনহেগেন ত্যাগ করলাম। কোপেনহেগেন ত্যাগ করার মুহূর্তে তাঁদের সকলের কথাই মনে পড়ছিল পরম প্রীতি ও শ্রদ্ধায়।

তিপ্পান্ন

ষোলই সেপ্টেম্বর স্ক্যান্ডেনেভিয়ান দেশগুলো থেকে লন্ডনে ফিরে এলাম। এর আগে স্বধীনতা সংগ্রাম শুরু হবার পর একনাগাড়ে আমি এতদিন লন্ডনের বাইরে থাকিনি। পহেলা সেপ্টেম্বর স্ক্যান্ডেনেভিয়ান দেশগুলোর উদ্দেশ্যে লন্ডন ত্যাগ করেছিলাম, আর ফিরে এলাম ষোলই সেপ্টেম্বর। এই সময়টাতে শেখ আবদুল মান্নান আরো বেশী করে গোরিং স্ট্রিটের অফিসে উপস্থিত থেকে কার্য পরিচালনার দায়িত্ব পালন করেছেন। তিনি প্রায় প্রত্যহ আমার সঙ্গে রাতে টেলিফোনে কথা বলেছেন এবং আন্দোলন সম্পর্কে দৈনন্দিন যেসব বিষয় সাধারণভাবে সিদ্ধান্ত নেয়ার প্রয়োজন হয় সে সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। শেখ মান্নান তাঁর দেশপ্রেম, সাহসিকতা এবং আদর্শের প্রতি আন্তরিক নিষ্ঠা নিয়ে কাজ করেছেন বলেই আমার অনুপস্থিতিতে যে সব সমস্যার উদ্ভব হয়েছিল তা সন্তোষজনক পরিসমাপ্তি ঘটিয়েছেন তিনি এবং তাঁর সহকর্মীবৃন্দ। তাঁদের প্রতি দেশপ্রেমিক বাঙালীদের নিশ্চয়ই কৃতজ্ঞতাবোধ করতে হবে।

স্টিয়ারিং কমিটির আহবায়ক আজিজুল হক ভূঁইয়া মুজিবনগর ও মুক্তিবাহিনীর শিবিরগুলো থেকে ফিরে এসে পুনরায় গোরিং স্ট্রিটের কাজ পরম উৎসাহে শুরু করেন। বৃটেনের বিভিন্ন আঞ্চলিক সমিতির সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে যোগাযোগ স্থাপনের উদ্দেশ্যে তিনি নিজেও নানা অঞ্চলে গিয়েছেন। সে কারণেই শেখ মান্নান কার্যতঃ গোরিং স্ট্রিটের অফিস পরিচালনা করতে থাকেন। এতে ধারাবাহিকতাও রক্ষিত হয়। আজিজুল হক ভূঁইয়া এবং শেখ মান্নান পারস্পরিক আলোচনা ও সম্প্রীতি সহকারে কাজ করায় গোরিং স্ট্রিটের কর্মপ্রবাহ সুষ্ঠু ও দক্ষতার সঙ্গে সম্পাদিত হচ্ছে দেখে আমি লন্ডনে ফিরে এসে আনন্দবোধ করি।

চুয়ান্ন

মার্চের শেষ সপ্তাহ থেকে শুরু করে সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি পর্যন্ত সাড়ে পাঁচ মাস ধরে আন্দোলন চলে আসছে। গতির তীব্রতা ক্রমেই বেড়েছে। এপ্রিল মাস থেকেই কাজ সর্বত্র সমরপ্রস্তুতির পর্যায়ে চলছিল। আগষ্ট মাসে সংগ্রামের কাঠামো পুরোপুরি দাঁড়িয়ে যায় বলা চলে। সঙ্গে সঙ্গে বৃটেনসহ গোরিং স্ট্রিটের অফিসের সঙ্গে বহির্বিশ্বের নানা অঞ্চলের সম্পর্ক স্থাপিত হয়। মুজিবনগরেও গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সচিবালয় পূর্ণোদ্যমে কাজ করে যায়। আমাদের সঙ্গে স্থাপিত হয় ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ। মুজিবনগর সরকার আনুষ্ঠানিভাবে শপথ গ্রহণ করেন সতেরই এপ্রিল। আঠারই এপ্রিল কোলকাতার ডেপুটি হাইকমিশনার হোসেন আলী সদলবলে বাংলাদেশের প্রতি আনুগত্য ঘোষণা করেন। এর ফলে বাংলাদেশ একটি তৈরী সচিবালয় পেয়ে যায়। প্রশাসনিক কর্ম নির্বাহের দিক থেকে এর মূল্য সেদিন ছিল সীমাহীন। কিন্তু তার চেয়ে বড় এ ধরনের সংগ্রামে উৎসাহ, উদ্দীপনা এবং প্রেরণা। এই দৃপ্ত পদক্ষেপ সর্বত্র বাঙালীর মনে সীমাহীন প্রাণশক্তির সঞ্চার করে।

হোসেন আলী রাজনৈতিক নেতা ছিলেন না। তিনি ছিলেন একজন সরকারী কর্মচারী, অভিজ্ঞ কূটনীতিবিদ। তাঁর অন্তরের তীব্র অনুভূতি, দেশপ্রেম, চারিত্রিক দৃঢ়তা এবং সাহসিকতা তাঁকে এরূপ একটি পদক্ষেপ গ্রহণ করতে অনুপ্রাণিত করে। তাঁর এই অবদান অবিস্মরণীয়। তাঁর উৎসাহে তাঁর সহকর্মীগণও সানন্দে এবং সাগ্রহে বাংলাদেশ সরকারের প্রতি আনুগত্য ঘোষণা করেন। তাঁদের প্রত্যেকের কাছে দেশবাসী চিরঋণী হয়ে থাকবে। তাঁরা এভাবে ঝাঁপিয়ে পড়াতে আন্দোলনে শুধু কর্মনৈপুণ্যই যুক্ত হয়নি, বন্যার মতো উৎসাহের প্লাবন এসে সকল বাঙালীকে কর্মপ্রবাহে ধাবিত করেছে।

ছাব্বিশে এপ্রিল লন্ডন টাইমস পত্রিকায় হোসেন আলীর দেওয়া একটি বিবৃতি প্রকাশিত হয়। তাতে তিনি বলেন, 'স্বাধীন বাংলাদেশ সরকার গঠিত হওয়ায় তাঁর দূতাবাসের সকল বাঙালী ঐক্যবদ্ধ হয়ে স্বদেশের প্রতি আনুগত্য ঘোষণা করেছেন এবং তাঁরা সকলেই দিবারাত্র পরিশ্রম করেছেন।' এই খবর প্রকাশিত হবার পর থেকে মুজিবনগর সরকারের সঙ্গে বিশ্ববাসীর যোগাযোগ স্থাপনের পথ সুগম হয়। সেই দিক থেকেও এটি নিঃসন্দেহে অতীব গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। হোসেন আলীকে এ ব্যাপারে সর্বাত্মক সাহায্য করেন তাঁর অফিসের আরেকজন তরুণ বাঙালী কূটনীতিবিদ আনোয়ারুল করিম চৌধুরী (জয়)। তিনিও সেদিন থেকেই অফিস সুচারুভাবে পরিচালনার ব্যাপারে অক্লান্ত পরিশ্রম করে এসেছেন।

এ খবর বৃটেনের বাঙালীদেরও খুবই উৎসাহিত করে এবং তাঁরা জানতে পারেন যে,

মুজিবনগরে তাঁদের সরকারের প্রধান কার্যালয় স্থাপিত হয়েছে। অনেকে ব্যক্তিগত সম্বন্ধ স্থাপনের উদ্দেশ্যে একবার মুজিবনগর থেকে ঘুরে আসেন। অসম্ভব ব্যস্ততাহেতু আমার পক্ষে অবশ্য স্বাধীনতা সংগ্রাম চলাকালে মুজিবনগরে একবারও যাওয়া হয়নি।

পৃথিবীর নানা অঞ্চল থেকে আমাদের এগার নম্বর গোরিং স্ট্রিটের অফিসের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করে বাঙালীরা নিজ নিজ কর্মস্থলে বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের পক্ষে জনমত গঠন করার কাজে এগিয়ে যান। বৃটেনেরও নানা অঞ্চল থেকে প্রতিদিন বাঙালীগণ এই অফিসে আসতে থাকেন। আমাদের অফিসকেও সে কারণে সারাক্ষণ কাজ করতে হয়। সকলের পরিশ্রমের ফলে মে মাসের প্রথম থেকেই আমাদেরও একটি সুনিয়ন্ত্রিত এবং সুশৃংখল অফিস স্থাপিত হয়। আমি শেখ আবদুল মান্নান এবং আজিজুল হক ভুঁইয়ার সঙ্গে আলোচনা করে শামসুল আলম চৌধুরীকে অফিস সেক্রেটারীর দায়িত্ব পালন করতে অনুরোধ করি। তিনি সে সময় আইন অধ্যয়ন করছিলেন। তিনি উৎসাহ এবং আনন্দের সাথে এই কষ্টসাধ্য দায়িত্ব গ্রহণ করেন। প্রতিদিন সময়মত তিনি অফিসে আসতেন এবং সারাদিন নিয়মিতভাবে অফিসে থেকে অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন। তাঁর উৎসাহ ও কর্মোদ্যম আমাকে যথেষ্ট আনন্দ দিয়েছে।

শিল্পী এ, কে, এম, আবদুর রউফ আমাদের অফিসে একেবারে প্রথমদিকেই যোগদান করেন। তিনি সারাদিন নীরবে কাজ করে যেতেন। তাঁকে আমি গল্প করে সময় কাটাতে দেখিনি বললেই চলে। আমাদের সকল সভা-সমিতির বিজ্ঞপ্তি লেখা, প্রচ্ছদপট অঙ্কন ও বিষয়বস্তুকে পরিবেশনের পরিকল্পনা তিনি যত্ন সহকারেই করতেন। তাঁকে দেখলেই মনে হতো একটি মহৎ সংগ্রামে শিল্পী হিসেবে তিনিও কিছু যোগ করে দিতে পারছেন, এই অনুভূতি তাকে তৃপ্তি দান করছে। শুধু স্টিয়ারিং কমিটিরই নয়, ছাত্র সমিতির সঙ্গেও তাঁর যোগাযোগ ছিল নিবিড়। ছাত্র সমিতি কর্তৃক প্রকাশিত প্রচার পত্রিকাগুলোকেও প্রকাশনার ব্যাপারে তিনি একইভাবে সাহায্য করেছেন।

স্বাধীনতা অর্জনের পর শিল্পী আবদুর রউফের স্বচ্ছ হস্তলিপি এবং সূক্ষ্ম কাজের স্বীকৃতিস্বরূপ বঙ্গবন্ধু তাঁকেই সংবিধানের লিপিকর হওয়ার দায়িত্ব ও গৌরব দান করেন। তাঁর হাতের লেখা অনুলিপিতেই গণ পরিষদের সদস্যবৃন্দ স্বাক্ষর করেন। এই পবিত্র কাজের দায়িত্ব একজন মুক্তিযোদ্ধাকে দেওয়া খুবই শোভন হয়েছিল। তিনি বর্তমানে বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভের পরিচালক।

আফরোজ চৌধুরী সম্পাদিত বাংলার রণাঙ্গন পত্রিকাটি গোরিং স্ট্রিট থেকেই প্রকাশিত হয়। তিনিও পরিশ্রম এবং সাধনার দ্বারা এই পত্রিকাটিকে জনপ্রিয় করে তোলেন। পত্রিকাটি নিয়মিত প্রকাশিত হয়েছে তথ্যবহুল হয়ে। তিনিও তখন লন্ডনে আইন অধ্যয়ন করছিলেন।

আমি ইতিমধ্যেই ইঞ্জিনিয়ার এ কে এম নূরুল হুদার কথা উল্লেখ করেছি। তিনি যেদিন কার্ডিফে পাকিস্তানী জাহাজ থেকে নেমে আসেন সেদিন থেকেই আমাদের প্রচার পত্রিকাগুলোর ফটোকপি করা ও বিভিন্ন সার্কুলারের সাইক্লোস্টাইল করাসহ অফিসের অন্যান্য কাজ একাগ্রতা ও আন্তরিকতার সঙ্গে করেছেন। এছাড়াও অফিসে শাখাওয়াত এবং আবু

তাহের এই দুইজন টাইপিস্ট ছিলেন। তাঁরাও নিজেদেরকে মুক্তিযোদ্ধা মনে করে সেইভাবে কাজ করেছেন।

ইতিমধ্যেই পাকিস্তান এয়ার লাইন্সের দু'জন কর্মচারী পাকিস্তানের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে লন্ডনে আসেন এবং দু'জনেই আমাদের অফিসের কাজে যোগ দিতে আগ্রহ প্রকাশ করেন। এরা দু'জন হলেন মহিউদ্দিন আহমদ চৌধুরী এবং রিয়াজুল আলম। আমরা মহিউদ্দিন আহমদ চৌধুরীকে স্টিয়ারিং কমিটির প্রেস ও প্রচারণা সচিবের দায়িত্ব প্রদান করি এবং রিয়াজুল আলম গউস খানের নেতৃত্বে গঠিত লন্ডন কমিটির সঙ্গে কাজ করেন। রিয়াজুল আলমের কাজে গউস খান আমার কাছে যথেষ্ট সন্তুষ্টি প্রকাশ করেছেন।

স্বাধীনতা যুদ্ধ চলাকালে মহিউদ্দিন চৌধুরীর প্রতি অর্পিত দায়িত্ব তিনি দক্ষতা, নিষ্ঠা এবং একাগ্রতার সাথে পালন করেছেন।

পঞ্চান্ন

আমাদের এই আন্দোলনের শুরু থেকেই কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তি বিভিন্ন সমিতির কর্মকর্তারূপে অথবা ব্যক্তিগতভাবে সংগ্রামে অশেষ অবদান রেখেছেন। তাঁদের কাছে জাতি কৃতজ্ঞ থাকবে। এঁদের অনেকের কথাই ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি। এখানে আরো ক'জন সম্পর্কে বলব।

কাজী মুজিবুর রহমান বিলেতে পাস করা চাটার্ড এ্যাকাউন্টেন্ট। তিনি একেবারে প্রথম দিকেই আমাদের আন্দোলনে যোগদান করেন। তাঁর পেশাগত দক্ষতার জন্য তাঁকে বাংলাদেশ ফান্ডের হিসাব পরীক্ষকের দায়িত্ব অর্পণ করা হয়। এজন্য তাঁকে প্রতিদিন গোরিং স্ট্রিটের অফিসে আসতে হতো। তিনি নিয়মিত সময়ে আসতেন এবং গল্পগুজবে সময় অতিবাহিত না করে নীরবে কাজ করে যেতেন।

লুৎফুল মতিন (বর্তমানে বাংলাদেশ সরকারের অর্থ মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব) আমাদের আন্দোলনে যোগ দেওয়ার পর থেকে মুজিবুর রহমানকে তাঁর কাজ শেষ না হওয়া পর্যন্ত হিসাব পরীক্ষার কাজে সক্রিয়ভাবে সাহায্য করেছেন।

কাজী মুজিবুর রহমান নিজেকে সর্বদা বিতর্কের উর্ধ্বে রেখেছেন। বাংলাদেশের স্বাধীনতা ছাড়া তাঁর আর কোন আকাঙ্ক্ষা বা উদ্দেশ্য ছিল না। কর্মের প্রতি তাঁর ছিল অবিচল আকর্ষণ। তাই বেজ ওয়াটার অঞ্চলের বাঙালীগণ তাঁকে পরম নির্ভরতার সঙ্গে বেজ ওয়াটার কমিটির নানা গুরুত্বপূর্ণ কাজের দায়িত্ব অর্পণ করতেন।

বাংলাদেশ ফান্ডের হিসাব পরীক্ষককের কাজের জন্য বাংলাদেশ সরকার স্বাধীনতা অর্জনের পর মুজিবুর রহমানকে পেশাগত পারিশ্রমিক দিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তিনি তা গ্রহণ

করেননি। নিবিড় আন্তরিকতার ছাপ ছিল কাজী মুজিবুর রহমানের চোখে-মুখে আচার-ব্যবহারে। তিনি ছিলেন স্বভাবজাত সুরুচি ও সৌজন্যের অধিকারী। সকল আলোচনাতেই তাঁকে খুব ধীরস্থিরভাবে যুক্তির দ্বারা বিষয়ের বিশ্লেষণ করতে দেখেছি। পূর্ব নির্ধারিত সিদ্ধান্তকে আঁকড়ে ধরে থাকা তাঁর অভ্যাস ছিলনা। তিনি ছিলেন মুক্ত মনের মানুষ, যুক্তিনির্ভর মানুষ। তাঁর প্রীতিসুন্দর ব্যবহার তাঁকে ভালবাসতে বাধ্য করেছে। যাঁরা তাঁর সংস্পর্শে এসেছেন তাঁরাই তাঁকে মনে রাখবেন। পরম সৌজন্যের অধিকারী এই মানুষ বন্ধুদের না বলে কিছুদিন আগে হঠাৎ চলে গেলেন। এমনটিতো তাঁর স্বভাবে ছিল না। তাঁর হঠাৎ তিরোধানে বন্ধুদের বুকে তাঁর অভাব শেলের মতো লেগে থাকবে। নানা বিরল গুণের অধিকারী এই মানুষটিকে স্বাধীনতা সংগ্রামে তাঁর অবদানের কথা স্মরণ করে শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতার সঙ্গে সকলেই হৃদয়ে স্থান দেবেন। আমরা যতদিন বেঁচে থাকব, তাঁর প্রীতিপূর্ণ ব্যবহারের হাজারো স্মৃতি নিবিড় ভালবাসার সঙ্গে বহন করব। তাঁর আত্মার শান্তির জন্য চিরদিন প্রার্থনা করব।

তাসাদ্দুক আহমদ একজন সুপরিচিত ও প্রভাবশালী ব্যক্তিত্ব। তিনিও ছাব্বিশে মার্চ থেকেই আমাদের আন্দোলনের জন্য যথেষ্ট পরিশ্রম করেছেন। বহুদিন আগে তিনি লন্ডনে এসেছিলেন আইন অধ্যয়ন করতে। তিনি সপরিবারে লন্ডনে স্থায়ীভাবে বসবাস করছিলেন। শুধু বাঙালী মহলেই তাঁর সামাজিক প্রতিষ্ঠা ছিল ব্যাপক, বেশ কয়েকজন পার্লামেন্ট সদস্য তাঁর ব্যক্তিগত বন্ধু ছিলেন। তিনি এই নয় মাস অনেক প্রভাবশালী বিদেশী ব্যক্তিকে পালাক্রমে তার গ্যানজেস রেস্টুরেন্টে নিমন্ত্রণ করে আমাদের স্বাধীনতা আন্দোলনের আদর্শ তুলে ধরেন। অনুরূপ অনুষ্ঠানে আমাদের বিশিষ্ট কর্মীদেরও তিনি উপস্থিত থাকতে আহ্বান করেছেন। আমীর আলী এবং শামসুল মোর্শেদ তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ সর্বদা রক্ষা করেছেন। তিনি অনেক সময় জরুরী সংবাদ আমাকে তাঁদের দ্বারা পাঠিয়েছেন। "বাংলাদেশ ফ্রিডম মুভমেন্ট ওভারসীজ" নামে কটি সংগঠনও প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তিনি পার্লামেন্টের সদস্য ব্রুস ডগলাসম্যান, জন স্টোনহাউস এবং পিটার শোর, ওয়ার অন ওয়ান্টের চেয়ারম্যান ডোনাল্ড চেজওয়ার্থের সঙ্গে প্রথম থেকেই ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ স্থাপন করে শরণার্থী শিবিরে সাহায্য প্রেরণ ত্বরান্বিত করার চেষ্টা করেন।

তাসাদ্দুক আহমদ একটি প্রচার পত্রিকা প্রকাশ করেন। ফরিদ জাফরী পত্রিকাটির সম্পাদনা করতেন। জাফরী অবাঙালী হলেও আমাদের আন্দোলনকে সমর্থন করে শক্তিশালী সম্পাদকীয় লিখতেন। তিনি তখন বৃটিশ নাগরিক। সপরিবারে লন্ডনে থাকতেন। তাসাদ্দুক আহমদের সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্ব ছিল ঘনিষ্ঠ ও নিবিড়। বাংলাদেশে পাকিস্তানী হানাদার বাহিনী নিধনযজ্ঞ শুরু করার পর মানবিকতাবোধে উদ্বুদ্ধ হয়েই ফরিদ জাফরী আমাদের সমর্থন করেন।

বেজ ওয়াটার অঞ্চলে অনেক বাঙালী বসবাস করতেন। আমাদের স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রথম থেকেই আন্দোলনের সমর্থনে মঞ্জুর মোর্শেদ তালুকদারকে সভাপতি এবং কাজী মুজিবুর রহমানকে সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত করে একটি শক্তিশালী কমিটি গঠন করা হয়। চব্বিশে এপ্রিল 'কভেনট্রিতে স্টিয়ারিং কমিটি গঠিত হওয়ার পর থেকে বেজ ওয়াটার স্টিয়ারিং কমিটির

সঙ্গে সর্বতোভাবে সহযোগিতা করে এসেছেন। তাঁরা কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সভারও আয়োজন করেন।

বেজ ওয়াটার কমিটির সভাপতি মঞ্জুর মোর্শেদ তালুকদার দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে তাঁর পেশাগত কাজের বাইরে এসে আন্দোলনে সাহায্য করেন। পেশাগতভাবে তিনি একজন চিকিৎসক। সুদূর বিদেশে থেকেও তিনি নিজেকে দেশের সঙ্গে সম্পূর্ণ যুক্ত রেখেছিলেন। তিনি ছিলেন জাতির স্বার্থ সম্পর্কে সজাগ ও তৎপর। তিনি গোরিং স্ট্রিটের অফিসে আমার সঙ্গে দেখা করে বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করতেন। ব্যক্তিগতভাবেও তাঁর নিকট থেকে বন্ধুত্বপূর্ণ ব্যবহার পেয়েছি। একদিনের কথা মনে আছে। আমি নিউইয়র্ক থেকে তেসরা অক্টোবর লন্ডনে ফিরছিলাম। হঠাৎ প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে প্লেনটি ম্যানচেষ্টার বিমানবন্দরে অবতরণ করে। শেখ আবদুল মান্নান লন্ডনের হিথ্রো বিমান বন্দরে টেলিফোন করে যথাসময়ে খবর পেয়ে গিয়েছিলেন যে, আমার বিমানটি ম্যানচেষ্টারে যাচ্ছে। একথা শুনে শেখ মান্নান এবং মোর্শেদ তালুকদার তৎক্ষণাৎ ম্যানচেষ্টার বিমান বন্দরে চলে যান এবং আমি মুর্শেদ তালুকদারের গাড়ীতে লন্ডনে ফিরে আসি। ম্যানচেষ্টার থেকে গাড়ীতে লন্ডনে ফিরতে ঘন্টা তিনেক লাগে। তখনকার দিনে সহকর্মীদের মধ্যে এমন একটা মমত্ববোধ ছিল যে, মোর্শেদ তালুকদার এবং শেখ মান্নান এতটা কষ্ট করতে ভ্রূক্ষেপ করেননি।

লুটন কমিটির দবিরউদ্দিন খুবই প্রাণচঞ্চল মানুষ ছিলেন। তাঁর কর্মদক্ষতাও ছিল বিপুল। এই কমিটির আয়োজিত কয়েকটি সভায় আমি যোগদান করেছিলাম। প্রতিটি সভাই খুব সুশৃঙ্খলভাবে পরিচালিত ও জনাকীর্ণ ছিল। তিনি লুটন আওয়ামী লীগেরও একজন বিশিষ্ট নেতা ছিলেন।

আমাদের স্বাধীনতা আন্দোলনে বি, এইচ, তালুকদার একটি স্মরণীয় নাম। তিনি হত্যাযজ্ঞের খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কর্মতৎপর হয়ে ওঠেন। দুইশ' চুরানব্বই নম্বর স্ট্রেথাম হাই রোডে কুলাউড়া নামে তাঁর একটি রেস্টুরেন্ট ছিল। তাঁর সঙ্গে যোগদান করেন নূরুল হক চৌধুরী, নৃপেন্দ্রনাথ ঘোষ, মোহাম্মদ রফিক, এ, ইসলাম প্রমুখ দেশপ্রেমিক বাঙালী। তাঁরা বাংলাদেশ এ্যাকশন কমিটি নামে একটি সংগঠন করেন। বি, এইচ, তালুকদার তাঁর রেস্টুরেন্টের উপরতলা বিনা ভাড়ায় এ্যাকশন কমিটির অফিসের জন্য ছেড়ে দেন। এতে সেই অঞ্চলের বাঙালীগণ খুবই কৃতজ্ঞতাবোধ করেন। আমি নিজেও এপ্রিল মাসের প্রথম সপ্তাহে অর্থাৎ স্টিয়ারিং কমিটি গঠনের বেশ আগে তাঁর রেস্টুরেন্টে বাঙালীদের কয়েকটি সভায় যোগদান করেছি। বি এইচ তালুকদার প্রেসিডেন্ট হন। এর প্রচার সম্পাদক ছিলেন নূরুল হক চৌধুরী। এই কমিটির কর্মীবৃন্দ বার্মিংহাম, ম্যানচেষ্টার ইত্যাদি অঞ্চলে গিয়েও বাঙালীদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করেন। এই কমিটিরও একটি নিজস্ব ফান্ড ছিল এবং সেই ফান্ডের ট্রাস্টিদের মধ্যে ছিলেন রিচার্ড ক্রসম্যান, লর্ড গিফার্ড এবং বিশপ ট্রেভর হাডস্টোনের মত বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। এই ফান্ড থেকে কিছু অর্থ তাঁরা সরাসরি মুক্তিযোদ্ধাদের সাহায্যে মুজিবনগর সরকারের মাধ্যমে পাঠিয়েছিলেন বলে তাঁরা আমাকে জানিয়েছিলেন। আমাদের আন্দোলনের শেষের দিকে এঁরা কনওয়ে হলে একটি বিরাট জনসভার আয়োজন করেন। সেই সভায়

আমি প্রধান অতিথিরূপে যোগদান করেছিলাম। অন্যান্যের মধ্যে বক্তৃতা করেন পিটার শোর, ব্রুস ডগলাসম্যান, লর্ড গিফার্ড ও লর্ড ফেনার ব্রুকওয়ে। এই সভায় মফিজ চৌধুরী এবং রেহমান সোবহানও যোগদান ও বক্তৃতা করেন।

এই কমিটির প্রচার সম্পাদক নূরুল হক চৌধুরী কর্তৃক রচিত 'বাংলাদেশ ফাইটস ফর ফ্রিডম' পুস্তিকাটি এঁদের অর্থে ছাপানো হয়। ৮ই মে আমি এর ভূমিকা লিখে দিয়েছিলাম। বইটি মে'র দ্বিতীয় সপ্তাহেই প্রকাশিত হয়।

নূরুল হক চৌধুরী আমাকে নাইজেল গাওল্যান্ড ও তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন। বাংলাদেশে পাক হানাদার বাহিনী কর্তৃক হত্যাযজ্ঞের খবরে তারা দু'জনেই খুব বিচলিত হয়ে পড়েন। মানবিকতায় উদ্বুদ্ধ এই ইংরেজ দম্পতি সকল কাজকর্ম ফেলে রেখে সারাক্ষণ বাংলাদেশের জন্য একটা প্রচার পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। তাঁরা এর নাম দেন টেলিফোন এ্যাকশন গ্রুপ। নাইজেল গাওল্যান্ড, তাঁর স্ত্রী এবং নূরুল হক পরিকল্পিতভাবে প্রত্যহ দৈনিক পত্রিকাসমূহ, বিবিসি রেডিও, বিবিসি ও আইটিভি ইত্যাদিকে টেলিফোন মারফত বাংলাদেশের নির্যাতন সম্পর্কে সচেতন করে দিচ্ছিলেন। তাঁরা কখনো বাংলাদেশ সম্পর্কে খবর চাইতেন, কখনো খবর দিতেন, কখনো বা উৎকণ্ঠা প্রকাশ করতেন। এতে করে এসব সংবাদ সংস্থা বুঝতে পারতেন যে, বাংলাদেশের খবরের জন্য বহু লোকই উৎকণ্ঠিত। বাস্তবিকপক্ষে জনমনে ঐরূপ অবস্থাই ছিল। কিন্তু অনেকে হয়তো কষ্ট করে টেলিফোন ইত্যাদি করতেন না। তাঁদের এই পরিকল্পনাটি শুধু অভিনব নয় যথেষ্ট ফলপ্রসূও হয়েছিল। তাঁরা লন্ডনে অবস্থিত বিভিন্ন দূতাবাসেও টেলিফোন করে বাংলাদেশ সম্পর্কে খবর দিতেন। এই সফল পরিকল্পনার জন্য আমরা গাওল্যান্ড দম্পতির নিকট কৃতজ্ঞ।

স্টিয়ারিং কমিটি আয়োজিত সভায় মহিউদ্দিন চৌধুরী যোগদান করে প্রেস বিজ্ঞপ্তি বিভিন্ন সংবাদপত্র ও সংস্থায় প্রেরণ করতেন। অনেক সময় বিভিন্ন আঞ্চলিক সমিতির সভায়ও তিনি আমার সঙ্গে গিয়েছেন এবং সভার বিবরণী সংশ্লিষ্ট স্থানে প্রেরণ করেছেন। স্টিয়ারিং কমিটি কর্তৃক প্রকাশিত সংবাদ 'পরিক্রমা' এবং বাংলাদেশ টু-ডে এর জন্য তিনি সভাগুলোর বিবরণী লিখতেন। বাংলাদেশ টু-ডে সম্পাদনা বস্তুতঃপক্ষে তিনিই করতেন।

সাতাশে আগস্ট বাংলাদেশ দূতাবাস স্থাপনের পর আমি সিদ্ধান্ত নিলাম যে, সরকারী কর্মচারী যাঁরা এগার নম্বর গোরিং স্ট্রিটের অফিসে কাজ করতেন, তাঁরা ঐ তারিখ থেকে দূতাবাসে কাজ করবেন। গোরিং স্ট্রিটের কাজে তাতে কোন অসুবিধা হয়নি। কেননা, গোরিং স্ট্রিটে যথেষ্ট বেসরকারী কর্মী ছিলেন। আমার এই সিদ্ধান্তের ফলে মহিউদ্দিন আহমদ, লুৎফুল মতিন, শিল্পী আবদুর রউফ, মহিউদ্দিন আহমদ চৌধুরী, নূরুল হুদা প্রমুখ সরকারী কর্মচারী সাতাশে আগস্ট থেকে পেমব্রিজ গার্ডেনস-এ দূতাবাসে কাজ করতে শুরু করেন।

ডঃ কবির আহমদ ব্রুনেল বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থনীতি বিভাগে শিক্ষকতা করতেন। তিনি আমাদের সঙ্গে বিভিন্ন আঞ্চলিক সমিতিতে যোগদান করা ছাড়াও বাংলাদেশ টু-ডে প্রকাশে যথেষ্ট সাহায্য করেছেন।

আমির আলী একজন উৎসাহী কর্মী। তিনিও আইন অধ্যয়ন করতে এসেছিলেন। পরে

সাংবাদিকতার আকৃষ্ট হয়েছিলেন। বর্তমানে বৃটেনে চাকরি করছেন। তিনি স্টিয়ারিং কমিটির সঙ্গে আন্তরিক সহযোগিতা করেছেন। পরিশ্রম এবং নিষ্ঠার দ্বারা তিনি সকলের প্রশংসা অর্জন করেছেন। বাংলাদেশ ডে-ডে পরিচালনার ব্যাপারে তাঁর ভূমিকা ছিল গুরুত্বপূর্ণ। তাছাড়া তিনি একবার আমার সঙ্গে আন্দোলনের কাজে জেনেভায়ও গিয়েছিলেন। দেশাত্মবোধে উদ্বুদ্ধ এই যুবক এই নয় মাস প্রায় সারাক্ষণ আন্দোলনের সাফল্যের জন্য কাজ করেছেন। লন্ডনে কমিটি কর্তৃক প্রকাশিত একটি প্রচার পুস্তিকার সম্পাদনাও তিনি খুব দক্ষতার সঙ্গে করেন।

মিম্বার আলী স্টিয়ারিং কমিটিকে নানাভাবে সাহায্য করেছেন। তিনি তখন ইস্ট লন্ডনের একজন প্রভাবশালী নেতা। দিলচাঁদ রেস্টুরেন্টের মালিক মতিয়ুর রহমান চৌধুরীরও এই অঞ্চলে খুব প্রতিপত্তি ছিল। তিনিও আন্দোলনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিলেন।

মিম্বার আলী এবং মতিয়ুর রহমান দুইজনেই স্টিয়ারিং কমিটির সঙ্গে আন্তরিক সহযোগিতা করেছেন। ব্যক্তিগতভাবে তাঁদের মধ্যে গভীর মমত্ববোধ লক্ষ্য করেছি। তাঁর প্রায়ই জনসভাগুলোতে আমার সঙ্গে যেতেন।

কভেন্ট্রি শহরে আমাদের শক্তিশালী কমিটি ছিল। এই কমিটির সুপরিচালনার কৃতিত্ব বহুলাংশে আরব আলীর প্রাপ্য। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি সকলেরই খুব প্রিয় ছিলেন। তিনি একটা বিশেষ ব্যাপারে খুব সাহায্য করেছেন। গণতন্ত্রের একনিষ্ঠ সেবক হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর পুত্র রাশেদ সোহরাওয়ার্দীকে তিনি একদিনে আমাদের গোরিং স্ট্রিটের অফিসে নিয়ে আসেন। রাশেদ সোহরাওয়ার্দী খুব জোরালো ভাষায় একটি বিবৃতি প্রদান করে আমাদের স্বাধীনতা আন্দোলনে সর্বাত্মক সমর্থন ঘোষণা করেন। রাশেদ সোহরাওয়ার্দীর বিবৃতি লন্ডনের পত্রিকাগুলোতে প্রকাশিত হয়। পরে কোলকাতার পত্রিকাগুলোতেও সেই বিবৃতি প্রকাশিত হয়। সেই দুর্দিনে তাঁকে কাছে পেয়ে তাঁর সর্বজনশ্রদ্ধেয় পিতার পরম স্নেহের নানা স্মৃতি আমার হৃদয়কে উদ্বেল করে দিল। মনে পড়ল কত নির্ভরতার সঙ্গেই না দেশবাসী নানা সঙ্কটে তাঁর নেতৃত্বের অপেক্ষা করেছেন।

ছাপ্পান্ন

মনোয়ার হোসেন চব্বিশে এপ্রিল কভেন্ট্রিতে অনুষ্ঠিত সভায় পাঁচ সদস্যবিশিষ্ট স্টিয়ারিং কমিটির অন্যতম সদস্য সর্বসম্মতিক্রমে নির্বাচিত হন। আমি একথা আগেই উল্লেখ করেছি। কিন্তু তারপর আমি আর তাঁর সম্বন্ধে গত সাড়ে পাঁচ মাসের কার্যবিবরণীতে কোনরূপ উল্লেখ করিনি। কারণটা খুলে বলা দরকার। তিনি স্টিয়ারিং কমিটির সদস্য নির্বাচিত হওয়ার কয়েকদিনের মধ্যে ব্র্যাডফোর্ড থেকে একটা ডেলিগেশন এসে আমার উপর প্রচন্ড চাপ দেয়

যে, আন্দোলনের বৃহত্তর স্বার্থে আমি যেন মনোয়ার হোসেনকে স্টিয়ারিং কমিটিতে কাজ করতে না দেই। তাঁদের চাপে আমি কিছুটা হতভম্ব হয়ে পড়লাম। আমি নিজেকে গণতন্ত্রমনা লোক বলে বিশ্বাস করি। স্টিয়ারিং কমিটির একজন নির্বাচিত সদস্যকে বাদ দেয়ার ক্ষমতা আইনগতভাবে যে আমার একেবারেই নেই সেটুকু আমি এক মুহূর্তেই বুঝতে পারলাম। কিন্তু ব্র্যাডফোর্ডের প্রতিনিধিবৃন্দের চাপের তীব্রতা দেখে আমি বিষয়টি বিবেচনা করে দেখব বলে সেদিনকার মতো তাঁদেরকে বিদায় দিলাম। আমার মনের কোণে ক্ষীণ আশা লালন করলাম যে, কয়েকদিন পরে তাঁরা বিষয়টি ভুলে যাবেন। কিন্তু আমার ক্ষীণ আশাটি পূরণ হলো না। তাঁরা দ্বিতীয়বারেও আমার সঙ্গে দেখা করে একইভাবে মনোয়ার হোসেনের পদত্যাগ দাবী করেন। তাঁদের অভিযোগ ব্র্যাডফোর্ড শহরের বিপুল সংখ্যক পাকিস্তানীর সঙ্গে মনোয়ার হোসেনের বন্ধুত্ব। যাঁরা মনোয়ার হোসেনের পদত্যাগ দাবী করলেন তাঁরা খুবই আন্তরিকতার সঙ্গে সারাক্ষণ স্বাধীনতার জন্য কাজ করে যাচ্ছেন এবং তাঁদের দাবীর পেছনে কোন ব্যক্তিগত কারণ নেই। আন্দোলনের স্বার্থেই তাঁদের এই দাবী। তাঁরা বললেন, এসব ব্যাপারে কোনরূপ ঝুঁকি নেয়া একেবারেই ঠিক হবে না। তাঁরা আমাকে স্মরণ করিয়ে দিলেন, প্রত্যেক আন্দোলনে গোপনীয়তা ও নিরাপত্তার ব্যাপারের উপর বিশেষ লক্ষ্য রাখতে হবে।

আমি চুপ করে তাঁদের কথা শুনলাম এই আশায় যে, আমার কাছে বলে তাঁরা হয়তো কর্তব্য সম্পাদনের তৃপ্তি লাভ করতে পারেন। আমি তাঁদের অনুরোধ করলাম বিষয়টা আমার উপর ছেড়ে দিতে। ছেড়ে তাঁরা ঠিকই দিলেন, কিন্তু কয়েকদিন পরে আবার আসবেন বলে গেলেন। এইবারে আমি শেখ মান্নানকে বললাম মনোয়ার হোসেন যেন আমার সঙ্গে অবিলম্বে দেখা করেন। মনোয়ার হোসেন এলে তাঁকে বললাম, 'আমি নিজেকে অত্যন্ত বিপদগ্রস্ত এবং অসহায় অবস্থায় দেখতে পাচ্ছি। দাবী উঠেছে আপনার কাছ থেকে পদত্যাগপত্র গ্রহণ করতে। আমি বললে আপনি যে পদত্যাগ করবেন তার কোন নিশ্চয়তা নেই। আর না করলে ব্র্যাডফোর্ডের একটা বড় অংশের কাছে স্টিয়ারিং কমিটি বিরাগভাজন হবে। আর আপনি যদি আমার কথায় পদত্যাগ করেন তাহলে পাকিস্তানের হাইকমিশনার খবরের কাগজে একটি বিবৃতি দিয়ে নিশ্চয়ই বলবেন যে, কভেন্ট্রিতে স্থাপিত ঐক্যে ফাটল ধরেছে। এ অবস্থায় আমি যে কি করব ভেবে পাচ্ছি না। মনোয়ার হোসেন একটু চুপ থেকে বললেন, "স্যার, স্বাধীনতা সংগ্রামের ঐক্য রক্ষার্থে আপনি যা সমীচীন বোধ করেন তাই করুন। আমি আপনার সেই সিদ্ধান্তই মেনে নেব।" আমরা দু'জনেই অনেকক্ষণ চুপ করে থাকলাম। তারপর ধীরে ধীরে বললাম, 'আমি যতদূর বুঝেছি তাতে ব্র্যাডফোর্ডের প্রতিনিধিবৃন্দ তাঁদের অনুরোধ প্রত্যাহার করবেন না। তবে আপনি যদি স্টিয়ারিং কমিটির সভায় না আসেন তাহলে আমি বোধ করি তাঁদেরকে পদত্যাগের জন্য চাপ দেয়া থেকে নিরস্ত করতে পারি।' উত্তরে মনোয়ার হোসেন বললেন, "বেশ তাই হবে স্যার। আমি স্টিয়ারিং কমিটির সভায় যোগদান করব না। আর আমাকে নোটিশও পাঠানোর প্রয়োজন নেই। তবে আমি ব্যক্তিগতভাবে স্বাধীনতা সংগ্রামে সাহায্য করে যাব এবং আমি যদি কোন কাজে লাগি আমাকে জানাতে দ্বিধা করবেন না।" তারপর ধীরে ধীরে বললেন, "স্যার, আমি আপনাদের জনসভায় যোগদান

করতে পারবতো ?' আমি বললাম, নিশ্চয়ই। জনসভা সকলের জন্য উন্মুক্ত। তিনি বিদায় নেবার আগে বললেন, 'আমি বুঝতে পেরেছি এই দাবীর কারণ। আমার খুব ইচ্ছা যে, আমি ব্র্যাডফোর্ডের কাউন্সিল সদস্য নির্বাচিত হই। সেজন্য স্থানীয় পাকিস্তানী ভোটারদের সঙ্গে আমি বহুদিন থেকেই বন্ধুত্ব করে আসছি। কিন্তু তাই বলে দেশের স্বার্থের ক্ষতিকর কোন কাজ আমার দ্বারা হবে না। শেখ আবদুল মান্নান খবর দিলে জনসভায় যোগদান করব এবং যথাসম্ভব লোক নিয়ে আসব।' আমি বললাম,— 'অশেষ ধন্যবাদ। আমরা নিশ্চয়ই জানাব।'

তিনি চলে গেলেন। আমি চুপ করে বসে থাকলাম। আমার তো মনে হয় না, এ ছাড়া আর কোন উপায় ছিল। মনোয়ার হোসেন এরপরে স্টিয়ারিং কমিটির অফিসে আর আসেননি। কিন্তু স্টিয়ারিং কমিটি কর্তৃক আহৃত জনসভায় প্রায়ই আসতেন এবং ব্র্যাডফোর্ড থেকে কোচে করে লোকজন নিয়ে আসতেন। শেখ মান্নান তাঁকে টেলিফোনে জনসভার কথা জানাতেন। তিনি যদি স্বেচ্ছায় এই ব্যবস্থায় রাজী না হতেন তাহলে আন্দোলনে কলহের সৃষ্টি হতো।

পাকিস্তানীরা আমাদের মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্ব আছে একথা বলার সুযোগ পেত। মনোয়ার হোসেন স্টিয়ারিং কমিটির সভায় আসবেন না, এ কথা ব্র্যাডফোর্ডের প্রতিনিধিবৃন্দকে বলায় তারা তার পদত্যাগের জন্য আমাকে আর অনুরোধ করেননি। এভাবে এ সমস্যাটিরও সমাধান হয়ে যায়।

নয় মাসের আন্দোলনের অভিজ্ঞতায় আমি দেখেছি, মনোয়ার হোসেন এবং তাঁর পদত্যাগ যাঁরা চেয়েছেন, এঁদের সবারই দেশপ্রেম ছিল প্রশ্নাতীত। দেশের স্বার্থে সবারই দৃষ্টিভঙ্গী ছিল অভিন্ন।

সাতান্ন

আমি ইতিপূর্বে জগলুল পাশার নেতৃত্বে গঠিত বার্মিংহাম সমিতির কথা উল্লেখ করেছি এবং সেই সমিতির আয়োজিত দু'টি বিরাট জনসভার বিস্তারিত বিবরণও দিয়েছি। তাছাড়া বার্মিংহামেই তোজাম্মেল হকের নেতৃত্বে আরো একটি সমিতি স্বাধীনতা আন্দোলনকে একেবারে শুরু থেকেই সমর্থন দেয়। তাঁরা সংখ্যায় কম হলেও স্বাধীনতা অর্জনের জন্য একইভাবে পরিশ্রম করেছেন, দু'টি ভিন্ন সমিতির লক্ষ্য একই–বাংলাদেশকে পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীর কবল থেকে মুক্ত করা। তাঁরা কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সভা করেন। তাতেও ব্রুস ডগলাসম্যান, স্টোন হাউস প্রমুখ পার্লামেন্ট সদস্য যোগদান করেন। বার্মিংহামে এভাবে দু'টি দল কাজ করায় আন্দোলনের কোন ক্ষতি হয়নি। কেননা, এই দু'টি সমিতি পরস্পরের প্রতি কাদা ছোঁড়াছুঁড়িতে

ছোঁড়াছুঁড়িতে লিপ্ত ছিল না। একই গন্তব্যস্থানে পৌঁছানোর জন্য উভয় সমিতি প্রাণপণ চেষ্টা করেছে। তবে বার্মিংহামে এক সমিতির নেতৃবৃন্দ অন্য সমিতি আহূত জনসভায় যোগদান করেননি। আমি যখন দেখলাম যে, তাঁদের একযোগে কাজ করতে সম্মত করানো সম্ভব হবে না, তখন আমি এ বিষয়টি নিয়ে আলোচনায় জড়িয়ে পড়তে চাইনি। তোজাম্মেল হকের নেতৃত্বে গঠিত দলটিও সুনিয়ন্ত্রিত এবং সুশৃঙ্খল ছিল। বার্মিংহামের বাইরে স্টিয়ারিং কমিটি কর্তৃক আহূত লন্ডনের জনসভাগুলোতে তাঁরাও যোগদান করতেন। তাছাড়া তাঁরাও বাংলাদেশ ফান্ডে টাকা জমা দিয়েছিলেন।

তোজাম্মেল হক একজন শিক্ষক। একনিষ্ঠ দেশপ্রেমিক। বহুদিন ধরে লন্ডনে স্থায়ীভাবে বাস করলেও দেশের প্রতি তাঁর গভীর মমত্ববোধ রয়েছে। তাঁর আহূত জনসভাগুলোতে যাঁরা যোগদান করেছেন, তাঁদের কাছে তোজাম্মেল হকের সুদক্ষ পরিচালনার প্রশংসা শুনেছি। স্বাধীনতা আন্দোলনের নয় মাস একইভাবে একাগ্রতার সঙ্গে তাঁরা কাজ করেছেন। এছাড়া বার্মিংহাম অঞ্চলে তিনি বহুদিন থেকে সমাজসেবা করে আসছেন। অধুনা বৃটিশ সরকার সমাজসেবার স্বীকৃতিস্বরূপ তাঁকে এম, ভি উপাধি প্রদান করেছেন।

লন্ডনস্থ বাংলাদেশ মেডিক্যাল এসোসিয়েশন খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। এই সমিতির সভাপতি আবদুল হাকিম ছিলেন ধীর-স্থির নিষ্ঠাবান ব্যক্তিত্ব। পঁচিশে মার্চের হত্যাযজ্ঞের খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বাংলাদেশ মেডিকেল এসোসিয়েশন তাঁর সভাপতিত্বে একাগ্রতার সঙ্গে কাজ করেছে। মেডিকেল এসোসিয়েশনের সদস্যবৃন্দের নিকট থেকে, বিশেষ করে সভাপতি আবদুল হাকিমের কাছ থেকে আমি এই নয় মাসই ব্যক্তিগতভাবে আন্তরিক সহযোগিতা লাভ করেছি। একদিনের ঘটনা বলি। ষোলই মে লেস্টারে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ জনসভা ছিল। জনসভা ছাড়াও সেখানে একজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিত্বকে কেন্দ্র করে মনোমালিন্য চলছিল। তাই লেস্টার সমিতির সদস্যদের মধ্যে সম্প্রীতি স্থাপনের জন্য আমার সেই সভায় উপস্থিত থাকা খুবই প্রয়োজন ছিল। এদিকে পনেরই মে দিবাগত রাতে আমি অসুস্থ হয়ে পড়ি। আমার অসুস্থতার কথা শুনে আবদুল হাকিম চলে আসেন। তিনি আমাকে রক্তচাপ কমাবার ঔষুধ দেন, কার্ডিওগ্রাফ করেন, ঔষুধ দিয়ে কয়েক ঘন্টা ঘুম পাড়িয়ে রাখেন, তারপর ষোলই মে এগারটার দিকে আমাকে নিয়ে লেস্টারে যান। খবর পেয়ে জাফরুল্লাহ চৌধুরীও আসেন। তাঁর গাড়ীতেই আমি লেস্টারে যাই। আমার শারীরিক অবস্থার প্রতি লক্ষ্য রাখার উদ্দেশ্যে আবদুল হাকিমও লেস্টারে যান। লেস্টারে পৌঁছানোর পর সভায় উপস্থিত হয়ে আমি সুস্থবোধ করি। সভা খুবই সাফল্যজনক হয়। এই সভায় আবদুল হাকিম, জাফরুল্লাহ চৌধুরী, মিসেস জগলুল পাশা এবং স্টিয়ারিং কমিটির সদস্য শামসুর রাহমান ও শেখ আবদুল মান্নান বক্তৃতা করেন। এই সভায় সকল ব্যক্তিগত প্রশ্নের উর্ধ্বে দেশকে রেখে তার স্বাধীনতার জন্য আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার প্রতিশ্রুতি দেন সবাই। আমার বক্তৃতায় আমি তাঁদের এই মনোভাবের ভূয়সী প্রশংসা করি এবং বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে কৃতজ্ঞতা জানাই। সভার শেষে আমরা সমিতির উৎসাহী কর্মী নূরুন্নবী খানের আমন্ত্রণে তাঁর রেস্টুরেন্টে নৈশ্যভোজে যোগদান করি এবং লেস্টারের নেতৃবৃন্দকে পারস্পরিক হৃদ্যতা ও

বন্ধুদের সঙ্গে কর্মের পথে এগিয়ে যেতে অনুরোধ জানাই।

বাংলাদেশ মেডিকেল এসোসিয়েশনের সদস্য জাফরুল্লাহ চৌধুরী প্রথম থেকেই অকাতরে পরিশ্রম করে এসেছেন। তিনি স্বাধীনতা সংগ্রাম শুরু হওয়ার কিছুদিন পরেই মুজিবনগর চলে যান। সেখানে নেতৃবৃন্দের সঙ্গে দেখা করেন এবং মুক্তিযোদ্ধাদের সঙ্গে স্থাপন করেন ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ। তারপর বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন স্থানে চিকিৎসা কেন্দ্র স্থাপন করে মুক্তিযোদ্ধাদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করেন। তিনি অধিকাংশ সময় বিভিন্ন রণাঙ্গনে সেবারত চিকিৎসকরূপে কাজ করলেও দু'একবার খুব অল্প সময়ের জন্য হলেও লন্ডনে যেতেন। এই চিকিৎসা কেন্দ্রগুলোতে তাঁর নিরলস সাধনা ও সেবাপরায়ণতা সর্বজনবিদিত।

গ্লাসগো সমিতির আহুত সভায় শেখ আবদুল মান্নান এবং আমি মে মাসে যোগদান করার পর তাঁদের সঙ্গে যোগাযোগ আরো ঘনিষ্ঠ হয়। তাঁদের কর্মকর্তাগণও লন্ডনে এসেছেন। প্রথম সাক্ষাতে যেমন, পরেও তেমনি একই কর্মের উৎসাহ তাঁদের মধ্যে দেখেছি। এই সমিতির প্রাণকেন্দ্রে ছিলেন সুপ্রতিষ্ঠিত চিকিৎসক রফিউদ্দিন আহমদ। স্বাধীনতা অর্জনের পর চট্টগ্রাম যাওয়ার পথে সড়ক দুর্ঘটনায় তার মর্মান্তিক তিরোধানের কথা ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি। গ্লাসগোর কথা বলতে গেলেই এই প্রীতিসুন্দর নীরব দেশপ্রমিকের কথা মনে পড়ে।

সমিতির সভাপতি মোজাম্মেল হকও এমন একজন মানুষ যাঁর প্রগাঢ় ব্যক্তিত্ব প্রথম সাক্ষাতেই অনুভব করা যায়। তাঁর আন্তরিকতা ও দেশপ্রেম এবং আদর্শের প্রতি নিষ্ঠা এই অনুভূতির সঞ্চার করে। তিনিও একজন সুপ্রতিষ্ঠিত চিকিৎসক। আমার গ্লাসগো যাওয়ার আগে এবং পরে তিনি অনেকবার লন্ডনে এসে ব্যক্তিগতভাবে আমার সঙ্গে দেখা করেন। একজন চিকিৎসকের পক্ষে এরূপ মাঝে মাঝেই স্কটল্যান্ড থেকে ইংল্যান্ডে আসা সহজ নয়। এঁদের পেশাগত দায়িত্ব এবং ব্যস্ততা সুবিদিত। গ্লাসগোর বাইরেও আমি তাঁকে অনেক সময় সংগ্রামের নানা দায়িত্ব দিয়েছি। তিনি সেগুলো সানন্দে সম্পাদন করেছেন। হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের তিনজন বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ একটি সুচিন্তিত প্রবন্ধে বলেন যে, বাংলাদেশ স্বাধীন হলে তার অর্থনৈতিক অবস্থাও স্থিতিশীল হবে। মোজাম্মেল হল গ্লাসগো কমিটির দ্বারা প্রবন্ধ পুস্তিকাকারে মুদ্রণ করে পার্লামেন্টের সদস্য এবং কিছুসংখ্যক বিশিষ্ট ব্যক্তির নিকট প্রেরণ করেন। এর সমস্ত খরচ বহন করে গ্লাসগো সমিতি। সেটাই বড় কথা নয়, এই পুস্তিকার ছাপা ও অলঙ্করণ দেখেই আমি বুঝতে পারি যে, তাঁরা খুব আন্তরিকতা ও নিষ্ঠার সঙ্গে কাজটি করেছেন। তিনি এবং তাঁর সহকর্মীগণ ব্যক্তিগতভাবেও কিছুসংখ্যক পার্লামেন্ট সদস্যের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে বাংলাদেশের স্বাধীনতার পক্ষে সমর্থন কামনা করেন ও পুস্তিকাটি তাঁদের হাতে দেন।

এই পুস্তিকায় যে তিনজন বিশ্ববিখ্যাত অর্থনীতিবিদের প্রবন্ধ ছিল তারা হচ্ছেন ঃ এডওয়ার্ড এস মেইসন, রবার্ট ডর্ফম্যান ও ষ্টিফেন এ মার্গলিন। এডওয়ার্ড মেইসন হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে এমিরিটাস অধ্যাপক এবং গ্রাজুয়েট স্কুল অব পাবলিক এডমিনিস্ট্রেশনের ভূতপূর্ব ডীন। তিনি মার্কিন অর্থনীতি সংস্থার সাবেক সভাপতি এবং বহুদিন থেকে আমেরিকান সরকার ও বিশ্বব্যাংকের উপদেষ্টা। রবার্ট ডর্ফম্যান হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতির অধ্যাপক।

অধ্যাপক। তিনি বিশ্বব্যাংকের উপদেষ্টা ছিলেন। স্টিফেন এ মার্গলিনও হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতির অধ্যাপক।

তাঁরা তাঁদের প্রবন্ধে যা বলেন, তার সংক্ষিপ্ত রূপ হচ্ছে ঃ বাংলাদেশের স্বাধীনতা অবধারিত। পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্তি থেকেই অর্থনৈতিক স্বাধিকারের দাবীতে এই অঞ্চলে যে আন্দোলনের সূচনা হয়, ব্যাপক গণহত্যার ফলে সেই আন্দোলন পূর্ণ স্বাধীনতার সংগ্রামে পরিণত হয়েছে। তাঁরা সাংস্কৃতিক, ভাষাগত ও সামাজিক বিভিন্নতাও তুলে ধরেছেন। তাঁরা বলেছেনঃ একজন গড়পড়তা পূর্ব পাকিস্তানীকে পশ্চিম পাকিস্তানীর আয়ের দুই–তৃতীয়াংশে জীবন নির্বাহ করতে হয় এবং জিনিস–পত্রের দাম নিতে হয় অনেক বেশী। এই আয় বৈষম্যের প্রধান কারণ সব সময়ই পশ্চিম পাকিস্তানের স্বার্থে পূর্ব পাকিস্তানের স্বার্থ জলাঞ্জলি দেয়া হয়েছে এবং তাঁদের সুদীর্ঘ প্রবন্ধে নানা তথ্য বিশ্লেষণের দ্বারা তাঁরা দেখিয়েছেন যে, দু'টি অংশের এই বিরাজমান বৈষম্যের পরে কিছুতেই পাকিস্তান অখন্ড থাকতে পারে না। তাই বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের বিজয় সুনিশ্চিত এবং বাংলাদেশের অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতার পূর্বশর্ত স্বাধীনতা অর্জন। আমরা এই পুস্তিকাটিকে প্রায় সর্বদা সঙ্গে রাখতাম বলা চলে এবং এই প্রবন্ধ পুনঃমুদ্রণের সব কৃতিত্ব গ্লাসগো সমিতির।

গ্লাসগোর আরো একজন কর্মীর দেশের প্রতি নিষ্ঠা এবং ব্যক্তিগতভাবে আমার প্রতি মমত্ববোধের কথা বলতে চাই। তাঁর নাম কাজী এনামুল হক। বাড়ী সন্দ্বীপে। বহুদিন আগে আইন অধ্যয়নে লন্ডনে এসেছিলেন এবং ব্যারিষ্টার হন। কিন্তু তিনি পেশাগতভাবে আইনজীবী ছিলেন না। তিনি স্কটল্যান্ডে ক্রমান্বয়ে কয়েকটি রেস্টুরেন্ট করেন এবং লন্ডনেও তিনি ছিলেন কয়েকটি বাড়ীর মালিক। এপ্রিল মাসের প্রথম দিকেই তিনি আমার সঙ্গে দেখা করেন এবং স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রতি তাঁর পূর্ণ সমর্থন জ্ঞাপন করেন। তিনি কি করে বাঙালীদের সংগঠিত করা যায় এ নিয়েও আমার সঙ্গে আলোচনা করেন। স্টিয়ারিং কমিটি গঠন হওয়ার পর আন্দোলন পুরোপুরি চলতে শুরু করলে তিনি আমার সঙ্গে স্টিয়ারিং কমিটির অফিসে এসে দেখা করেন এবং হঠাৎ করে বলেন, 'স্যার, আমার লন্ডনে কয়েকটি বাড়ী আছে। আমার একটি বাড়ী খালি করে দিচ্ছি, আপনি সেখানে থাকুন। আপনি আমাদের প্রতিনিধি। আপনি অন্ততঃ ন্যূনতম মর্যাদা ও সুবিধা নিয়ে থাকলে আমাদের কাজেরই সুবিধা হবে। আপনাকে কোন ভাড়া দিতে হবে না।' আমি তাঁকে অশেষ ধন্যবাদ দিলাম, কিন্তু বললাম, আমি এত ব্যস্ত যে, বাড়ী পরিবর্তনের কথাও ভাবা যায় না। আবারো কিছুদিন পরে এলেন এনামুল হক। এবারে জেদ ধরলেন, তিনি আমাকে একটি বাড়ী লিখে দিবেন। বুঝতে পারলাম তাঁর ধারণা হয়েছে; আমি তাঁর বাড়ীর ভাড়া দিতে পারবনা বলেই সেখানে উঠিনি। এবারেও তাঁকে অনেক করে বুঝিয়ে বিদায় দিলাম। বললাম, "যতদিন বেঁচে থাকি, আপনার এই ঔদার্য মনে থাকবে। কিন্তু আমাকে আপনি একটি বাড়ী উপহার দিবেন সে হয় না। তা আমি গ্রহণ করতে পারবো না। সে প্রশ্নই ওঠে না।" যাহোক তাঁর মন যাতে কোনরূপ আহত না হয় সে জন্য অনেক বুঝিয়ে বিদায় দিলাম।

এই ঘটনাটি আমি উল্লেখ করলাম এই কারণে যে, স্বাধীনতার সময় সহকর্মীদের

পারস্পরিক সহমর্মিতা কোন্ পর্যায়ে উঠেছিল তারও উপলব্ধির প্রয়োজন আছে।

দেশ স্বাধীন হলো। একদিন বঙ্গভবনে আমার প্রিন্সিপাল সেক্রেটারী কাজী মোশাররফ হোসেন তাঁর সহপাঠী ও বাল্যবন্ধু কাজী এনামুল হককে সঙ্গে করে আমার সঙ্গে দেখা করলেন। আমি সেদিন তাঁকে এক পেয়ালা চা পর্যন্ত দিতে পারিনি। কেননা তখন রমজান মাস। কথা হলো দিন তিনেক পরে তিনি আমার সঙ্গে এসে ইফতার করবেন। তার একদিন কিংবা দু'দিন পরে হঠাৎ প্রিন্সিপাল সেক্রেটারী ফোন করে বললেন, কাজী এনামুল হক গুরুতর হৃদরোগে আক্রান্ত হয়েছেন। আমি তখনই সামরিক সচিব ব্রিগেডিয়ার ফিরোজ সালাউদ্দীনকে আমার পিজি হাসপাতালে যাওয়ার ব্যবস্থা করতে বললাম। ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই আমি এনামুল হকের শয্যা পার্শ্বে উপস্থিত হই। তিনি আমাকে চিনলেন, দু'একটি কথাও বললেন। অধ্যাপক নূরুল ইসলাম এবং তাঁর সহকর্মীগণ যথাসাধ্য চেষ্টা করছেন দেখলাম। তাঁদের ধন্যবাদ দিয়ে চলে এলাম।

এর একদিন কিংবা দু'দিন পরে এনামুল হক সকলের মায়া ত্যাগ করে চলে গেলেন। তাঁর পরিবার ছিলেন চট্টগ্রামে। একটি সরকারী বিমানে করে এই মুক্তিযোদ্ধার শবদেহ চট্টগ্রামে পাঠিয়ে দিলাম। বিমান ত্যাগ করার মুহূর্তে আমি বিমান বন্দরে উপস্থিত ছিলাম। বিমানটি যখন আকাশে উঠল স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকলাম। কেবলি মনে হচ্ছিল সেই ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ দিনগুলোতে কত আন্তরিকতা নিয়েই তিনি আমাদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছিলেন।

আটান্ন

লন্ডন ও জেনেভায় আমাদের দু'টি সভা দু'জন পাকিস্তানী রাষ্ট্রদূত বন্ধ করার চেষ্টা করায় দু'টি সভাই আশাতীতভাবে সফল হয়। এই সভা দু'টোর কথা বলছি। একটি অনুষ্ঠিত হয় লন্ডনস্থ রয়েল কমনওয়েলথ সোসাইটিতে, অন্যটি বাংলাদেশ এ্যাকশন কমিটি কর্তৃক আহূত জেনেভায় সাংবাদিক সম্মেলনে। আটই জুন মঙ্গলবার লন্ডনের রয়েল কমনওয়েলথ সোসাইটি আমাকে বাংলাদেশের পরিস্থিতির ওপর বক্তৃতা করার জন্য নিমন্ত্রণ জানান। রয়েল কমনওয়েলথ সোসাইটি কমনওয়েলথ দেশসমূহ দ্বারা গঠিত। ট্রাফালগার স্কোয়ারের কাছে নর্দামবারল্যান্ড এভেনিউতে এই সমিতি স্থাপিত। লন্ডনস্থ সমস্ত কমনওয়েলথ দেশের রাষ্ট্রদূতগণ পদাধিকার বলে এই সমিতির ভাইস প্রেসিডেন্ট। আমাকে আমন্ত্রণ করার প্রতিবাদ জানিয়ে পাকিস্তানের হাইকমিশনার সালমান আলী বৃটিশ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের নিকট প্রতিবাদ জানান এবং সেই পত্র পাকিস্তান দূতাবাসের বাঙালী ডেপুটি হাইকমিশনার সালমুজ্জমানের

নিজে বহন করে নিয়ে যাওয়ার কথা ১২ই জুনের টাইমস পত্রিকা থেকে জানতে পারি। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বলে, কমনওয়েলথ সোসাইটি একটি স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান। বৃটিশ সরকারের এই সমিতির ওপর কোন কর্তৃত্ব নেই। এরপর খুব তীব্র ভাষায় পাকিস্তান দূতাবাস রয়েল কমনওয়েলথ সোসাইটিকে প্রতিবাদ জানান এবং আমন্ত্রণ প্রত্যাহার করতে বলেন। সোসাইটির সেক্রেটারী জেনারেল কেম্প একটি পত্রে সুস্পষ্টভাবে জানিয়ে দেন যে, কাউকে নিমন্ত্রণ করে সেই নিমন্ত্রণ প্রত্যাহার করার মতো কোন রীতি সোসাইটির নেই। এসব খবর টাইমস পত্রিকায় প্রকাশিত হবার পর আমার গোরিং স্ট্রিটের অফিস থেকে রয়েল কমনওয়েলথ সোসাইটিকে ফোন করলে তাঁরা বলেন, সভা হবে এবং অনেকেই যোগদানের কথা তাঁদের ইতিমধ্যেই জানিয়েছেন। আমি যেন যথাসময়ে সভায় উপস্থিত হই।

পাকিস্তান দূতাবাসের প্রতিবাদের কথা লন্ডনের টাইমসসহ কয়েকটি পত্রিকায় ৮ই জুন সকালে প্রকাশিত হওয়ায় ঐদিন অপরাহ্নে কমনওয়েলথ হলের সভায় আশাতীত জনসমাগম হয়েছিল। এতে উপস্থিত ছিলেন আর্থার বটমলী, পিটার শোর, মাইকেল বার্ণস প্রমুখ পার্লামেন্ট সদস্য, বিশিষ্ট শিক্ষাবিদগণ এবং বৃটিশ কাউন্সিলের প্রতিনিধিবৃন্দ। কমনওয়েলথ সেক্রেটারীয়েটের পক্ষ থেকে উপস্থিত ছিলেন ডিরেক্টর উইলিয়াম পিটার্স, বৃটিশ কাউন্সিলের প্রতিনিধিবৃন্দ এবং ঢাকাস্থ বৃটিশ কাউন্সিলের অন্যতম সদস্য রবার্ট সাইকস। তাছাড়া বাংলাদেশ এ্যাকশন কমিটিগুলোর প্রতিনিধিবৃন্দও যোগদান করেছিলেন।

রয়েল কমনওয়েলথ সোসাইটির চেয়ারম্যানের সভাপতিত্বে সভার কাজ যথাসময়েই শুরু হয়। তিনি আমাকে আমার বক্তব্য পেশ করতে অনুরোধ করেন। আমি সভার শুরুতেই বলি, 'পাকিস্তানের যে অংশকে পূর্ব পাকিস্তান বলা হতো, পঁচিশে মার্চের মাঝরাতে সে প্রদেশের অবলুপ্তি ঘটেছে। সেখানে জন্ম নিয়েছে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ। সেই বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক সংগ্রামে লিপ্ত সাড়ে সাত কোটি মানুষের পক্ষ থেকে বৃটেনের গণতান্ত্রিক জনগণের উদ্দেশ্যে অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা বহন করে আজ আমি এখানে উপস্থিত। গণতান্ত্রিক আদর্শ বৃটেন তাঁর নিজের ভূমিতে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছে। আর বাঙালীর গণতন্ত্র কামনার ফলে শ্যামল বাংলার সবুজ মাঠ হয়েছে রক্তরঞ্জিত।'

আমি বেশ বুঝতে পারলাম, সকল দলের পার্লামেন্ট সদস্যবৃন্দ এবং সমবেত অতিথিবৃন্দ পাকিস্তানের প্রতিবাদ সত্ত্বেও এই সভায় এসেছেন আমাদের সংগ্রামের তথ্য ও মর্মকথা উপলব্ধি করতে। তাই নিজেকে শান্ত রেখে অত্যন্ত সংযত ভাষায় আমাদের আন্দোলনের ইতিবৃত্ত তুলে ধরলাম, তুলে ধরলাম পাকিস্তান হবার পর পূর্ব বাংলার জনগণ কি গভীর প্রত্যাশা ও বিশ্বাস নিয়ে পশ্চিম পাকিস্তানীদের সঙ্গে করে একটি শক্তিশালী ও গণতান্ত্রিক দেশ গঠনের চেষ্টা করেছেন, কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তানের শাসকরা কি করে একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের সম্ভাবনাকে নষ্ট করেছে, পূর্ববাংলার ওপর চাপিয়ে দিয়েছে ঔপনিবেশিক শাসন-শোষণ। তুলে ধরলাম বাঙালীদের শিল্প, সংস্কৃতি ও ভাষার বিরুদ্ধে পশ্চিম পাকিস্তানীদের চক্রান্ত ও আগ্রাসনের কথা, সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের মতামত ও রায় উপেক্ষা করার কথা এবং আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রগুলোতে সীমাহীন বৈষম্য সৃষ্টির কথা। এদেশের জনগণকে দমন-পীড়ন,

গণনেতাদের নির্যাতন ও অসমমান, পর্যায়ক্রমে সবই বর্ণনা করলাম। পরিশেষে তুলে ধরলাম ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনে পূর্ব বাংলার জনগণের রায়ের চরম অসমমান ও ২৫ শে মার্চ সশস্ত্র পাক-সেনাদের নিরস্ত্র জনগণের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ার কথা। বললাম কোন্ প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশ স্বাধীনতা যুদ্ধ শুরু করেছে।

এরপর আমি বলি, এই সভায় একজন ইংরেজ উপস্থিত আছেন যিনি সে রাতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যামপাসে ছিলেন এবং স্বচক্ষে গণকবর খনন দেখেছেন। তাঁর ফ্ল্যাটে ঢুকেও পাক সৈন্যরা তাঁকে গুলী করতে উদ্যত হলে 'আমি বৃটিশ, আমি বৃটিশ' বলে চিৎকার করায় তাঁর জীবন রক্ষা পেয়েছে। তিনি আজ এখানে উপস্থিত। বাঙালী হলেই প্রাণ যেত অর্থাৎ বাঙালীর প্রাণের কোন মূল্য নেই। এই অবস্থায় লাখ লাখ মানুষ ভারতে আশ্রয় নিয়েছে।'

আমি এক ঘণ্টার উপরে শাসনতন্ত্রের ঐতিহাসিক ধারা তুলে ধরে ও হত্যাযজ্ঞের বিস্তারিত বিবরণ দিয়ে আসন গ্রহণ করার সঙ্গে সঙ্গে দেখলাম এক বর্ষীয়সী ইংরেজ মহিলা অভিভূত অবস্থায় ধীরে ধীরে মঞ্চে উঠে আসছেন। তাঁকে সভাপতি পরিচয় করিয়ে দিয়ে বলেন, 'ইনি লেডি জেনকিন্স'। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ভাইস চ্যান্সেলর জেনকিন্সের স্ত্রী।" লেডি জেনকিন্স আমার দিকে তাকিয়ে বলেন, "মিঃ ভাইস চ্যান্সেলর, আমার স্বামীও ছাত্র-ছাত্রীদের খুব ভালবাসতেন।' এরপর তাঁকে খুব আবেগাপ্লুত দেখায়। মাইক কাছেই ছিল। তাঁর কথা ও অনুভূতি সমবেত শ্রোতাদের হৃদয় স্পর্শ করে। এই আকস্মিক ঘটনা সভার শ্রোতাদের উপর খুবই প্রভাব বিস্তার করে। এভাবেই সভার উদ্দেশ্য পূর্ণতা লাভ করে। এরপর সভাপতি আমাকে ধন্যবাদ দিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

সভার পর ঢাকাস্থ বৃটিশ কাউন্সিলের রবার্ট সাইকস তাঁর গাড়ীতে আমাকে বাড়ী পৌঁছে দিতে চান। তাঁর কাছেই গণকবরের বিবরণ পাই। আমি বাঙালী বন্ধুদের বিদায় দিয়ে তাঁর সঙ্গে গাড়ীর উদ্দেশ্যে হাঁটতে শুরু করলে হঠাৎ একজন ইংরেজ যুবক আমার সামনে এসে পকেট থেকে কার্ড বের করে বলেন, "স্যার আমি স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের অফিসার। এই আমার কার্ড। ইনি কে ? আপনি একাকী কোথায় যাচ্ছেন।" আমি বললাম, 'এর নাম রবার্ট সাইকস। ব্রিটিশ কাউন্সিলের অফিসার। সেন্ট জেমস পার্কের কাছে এর গাড়ী রয়েছে। ইনি আমাকে পৌঁছে দেবেন। কথায় কথায় আমরা সেন্ট জেমস পার্কে এসে গেলাম। অফিসারটি আমরা গাড়ীতে উঠলে হাত নেড়ে আমাদের বিদায় দিলেন।

আমাকে রয়াল কমনওয়েলথ সোসাইটি বক্তৃতা দিতে আহবান করায় পাকিস্তানের হাই কমিশনার সালমান আলী প্রতিবাদ জানিয়ে সোসাইটির ভাইস প্রেসিডেন্টের পদ থেকে পদত্যাগ করেন।

এবার পূর্বে উল্লেখিত জেনেভায় অনুষ্ঠিত সভার কথা বলছি। এটি ছিল একটি সাংবাদিক সমেমলন। আমি পাঁচই আগষ্ট যখন জেনেভায় গিয়েছিলাম তখন এটির ব্যবস্থা করে এসেছিলাম। এই ব্যবস্থাপনার ভার নেন সুইজারল্যান্ডের পার্লামেন্ট সদস্য জোঁ জিগলার। সতেরই আগষ্ট এই সাংবাদিক সমেমলনের দিন ধার্য হয়। ফেডারেল পার্লামেন্টের এই অঞ্চলের সদস্যদের ব্যবহারের জন্য জেনেভা শহরে একটি ভবন রয়েছে যদিও পার্লামেন্ট ভবন

সুইজারল্যান্ডের বার্ণ শহরে। জেনেভাস্থ ভবনে জিগলার সম্মেলনের ব্যবস্থা করেন। জিগলার একজন অত্যন্ত উৎসাহী মানুষ। তিনি সুইস পার্লামেন্টের সমাজতান্ত্রিক দলের বিশিষ্ট সদস্য। গণতন্ত্রে তাঁর অটল নিষ্ঠা। এই সম্মেলনের আয়োজনে তাঁকে যথেষ্ট সাহায্য করেন ম্যাডাম ক্যাথলিন লা পয়েন্ট। তিনিও জিগলারের মতোই বিশ্বমানবিকতায় বিশ্বাসী এবং নিপীড়িত মানুষের পাশে এসে দাঁড়ান। সতেরই আগষ্ট সকালে সাড়ে দশটার দিকে আমি জেনেভা বিমান বন্দরে পৌঁছাই। এবার আমার সঙ্গে আর কাউকে নিয়ে যাইনি খরচের কথা ভেবে। বিমান থেকে নেমে বেরিয়ে যাবার পথে আমার পাসপোর্টটি দেখালাম। তাতে যথারীতি সুইস ভিসা ছিল। অন্যান্য যাত্রীর পাসপোর্ট দেখানোর সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের প্রবেশের অনুমতি দিয়ে সিল লাগিয়ে দিচ্ছিল। আমার বেলায় অফিসারটি আমার দিকে তাকালেন। তারপর বললেন, 'আপনি অপেক্ষা করুন।' এই বলে তিনি উঠে গেলেন। আমি দাঁড়িয়ে রইলাম। দেখলাম তিনি ফোন করছেন। আমার একটু উৎকণ্ঠা হলো। কেননা আমি অফিসারটিকে আমার পাকিস্তানী পাসপোর্ট নাড়াচাড়া করতে দেখলাম। একই সময় আমি বাইরের দিকে তাকিয়ে দেখলাম ম্যাডাম লা পয়েন্ট দাঁড়িয়ে আছেন। সুইস অফিসারটি টেলিফোন রেখে ফিরে এসে কোন কথা না বলে পাসপোর্টে এন্ট্রি সিল দিয়ে আমার হাতে ফেরত দিলেন। আমি বেরিয়ে এলে ম্যাডাম লা পয়েন্ট আমার বিলম্বের কারণ জিজ্ঞেস করলেন। কারণটা শুনে বললেন, 'পাকিস্তানী রাষ্ট্রদূত কিছু করে থাকবেন।' তারপর তিনি বললেন, 'পাকিস্তানী দূতাবাস থেকে জেনেভাস্থ জাতিসংঘের প্রেসরুমে বিজ্ঞপ্তি দিয়েছেন যে, আপনার সাংবাদিক সমেমলন বাতিল হয়ে গেছে কেননা আপনি সুইস ভিসা পাননি। এ খবর পেয়ে আমরা তখনই পাল্টা বিজ্ঞপ্তি দিয়েছি যে, সাংবাদিক সমেমলন যথারীতিই হবে, জাষ্টিস চৌধুরী বাংলাদেশ সরকারের বিশেষ প্রতিনিধি। পাকিস্তানের বিরুদ্ধে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে লিপ্ত। পাকিস্তান দূতাবাসের মিথ্যা ও বিভ্রান্তিকর বিবৃতিকে উপেক্ষা করে সাংবাদিকদের সম্মেলনে যোগদানের আহবান জানিয়েছি। আপনার এন্ট্রিসিল পেতে বিলম্ব হওয়ায় মনে হচ্ছে, এখানেও গোলমালের চেষ্টা চলেছে।' এই ধরনের মুহূর্তে আমি সাধারণতঃ শান্ত থাকি। সেভাবেই সব শুনলাম। ম্যাডাম লা পয়েন্ট বললেন, 'গাড়ি প্রস্তুত, ব্যাগ সংগ্রহ করে চলুন যাওয়া যাক।' যাহোক সুটকেসটি সংগ্রহ করে হোটেলে পৌঁছে দেখি, জিগলারের দু'তিনজন বন্ধু অপেক্ষা করছেন। তাঁদের সঙ্গে কিছুক্ষণ আলাপ আলোচনায় কাটল। তাঁরা জানালেন যে, সুইস পার্লামেন্টে একটি বিশেষ ব্যাপারে আটকে পড়ায় জিগলার আসতে পারেননি, কিন্তু সকল ব্যবস্থা ঠিক আছে এবং তাঁরা আমার সঙ্গে থাকবেন। তাঁরা কিছুক্ষণ পরে এসে আমাকে মধ্যাহ্ন ভোজে নিয়ে গেলেন। ভোজের পরে হোটেলে ফিরতেই দু'জন ভদ্রলোক আমার দিকে এগিয়ে এসে বললেন, 'আমরা সুইস ফেডারেল পুলিশ কর্মচারী। আমরা বার্ণ থেকে এসেছি। খবর পেয়েছি যে, পাকিস্তানীরা হয়তোবা কোনরূপ বিঘ্ন সৃষ্টি করতে পারে, তাই আপনার নিরাপত্তার দিকে লক্ষ্য রাখার জন্য এসেছি।' বিকেল সাড়ে তিনটার দিকে জিগলারের বন্ধুদের সঙ্গে নিয়ে আমরা জেনেভাস্থ সুইস ফেডারেল পার্লামেন্ট ভবনে পৌঁছলাম। এই ভবনে জিগলারের নিজস্ব কামরায় গিয়ে বসলাম। ম্যাডাম লা পয়েন্ট

প্রেসরুম থেকে ঘুরে এসে বললেন, 'পাকিস্তানের রাষ্ট্রদূতের বিভ্রান্তিকর বিবৃতির ফলে সাংবাদিকদের কৌতূহল আরো বেড়ে গেছে। সেজন্য তাদের সমাগম হয়েছে আশাতীত।' আমি যথাসময়ে প্রেসরুমে প্রবেশ করে দেখি সেখানে পাকিস্তান দূতাবাসের একজন সেকেন্ড সেক্রেটারী বসে আছেন। আমি কিছু না বলে জিগলারের রুমে ফিরে এলাম। আমার সঙ্গে এলেন ম্যাডাম লা পয়েন্ট এবং আয়োজনকারীদের কয়েকজন। আর এলেন বার্ণের সেই পুলিশ অফিসার দু'জন। আমি তাঁদের বললাম, 'এ সমেমলন সাংবাদিকদের, পাকিস্তানী কূটনীতিবিদ এখানে আসতে পারেন না।' এর উত্তরে তারা বললেন যে, আমরা তাঁকে এ প্রশ্ন করেছিলাম। তাঁর উত্তরে তিনি বলছেন যে, তিনি তাঁর দূতাবাসের জনসংযোগ কর্মকর্তাও। সে কারণে তাঁকেও সাংবাদিকরূপে গণ্য করতে হবে। আমি বললাম, 'তিনি দূতাবাসের কর্মচারী, কিন্তু পেশাগতভাবে সাংবাদিক নন, অথবা কোন সংবাদপত্র বা সংস্থার প্রতিনিধি নন। অতএব, তার প্রবেশাধিকার নেই, একথা তাকে বুঝিয়ে বলুন।' একটু পর তাঁরা ফিরে এসে বললেন যে ভদ্রলোক চলে গেছেন।

এরপর যথারীতি সাংবাদিক সম্মেলন শুরু হলো। অন্যান্য সম্মেলনে যেমন, এখানেও তেমনি আমাদের সংগ্রামের ইতিহাস ও যৌক্তিকতা তুলে ধরলাম। পাকিস্তানীরা প্রতি মুহূর্তে অকাতরে বাঙালীদের হত্যা করে চলেছে তাও জানালাম। বললাম, 'সুইজারল্যান্ড একটি নিরপেক্ষ দেশ। আমি কোন সক্রিয় সাহায্য কামনায় এখানে আসিনি। আপনাদের নিরপেক্ষতা রক্ষা করে যেটুকু সম্ভব আপনারা করবেন, এ বিশ্বাস বাংলাদেশের নিপীড়িত মানুষের রয়েছে।' এরপর আমাদের মুক্তিযোদ্ধারা নানা রণাঙ্গনে কিভাবে আধুনিক অস্ত্রে-শস্ত্রে সজ্জিত পাক হানাদার বাহিনীকে শুধুমাত্র কৌশলের দ্বারা পর্যুদস্ত করছেন সেকথা বললাম। সুইজারল্যান্ড নিরপেক্ষ দেশ, কিন্তু সেবার ক্ষেত্রে তার ভূমিকা চিরদিনই গৌরবোজ্জ্বল। প্রতি মুহূর্তে অসংখ্য শরণার্থী আশ্রয় নিচ্ছে প্রতিবেশী রাষ্ট্রে, অনেকেই ঢলে পড়ছে মৃত্যুর কোলে। এসময় তাঁদের সেবার হস্ত দৃঢ়তর হবে এই কামনা করি বলে জানালাম এবং ইতিমধ্যে তারা মানবিক ক্ষেত্রে যেভাবে এগিয়ে এসেছেন সে জন্য জানালাম কৃতজ্ঞতা। সম্মেলনে বিশেষভাবে সাংবাদিকদের কাছে তুলে ধরলাম বঙ্গবন্ধুর বিচার প্রহসনের কথা।

প্রশ্নোত্তরের পরে সম্মেলন শেষ হলো। বাইরে বেরিয়ে দেখি পাকিস্তানী সেকেন্ড সেক্রেটারী ভদ্রলোক তাঁর গাড়ীর সামনে দাঁড়িয়ে আছেন। সুইস বন্ধুদের সঙ্গে আমি আমার গাড়ীতে হোটেলে ফিরে এলাম। এসব ঘটনার ফলে সাংবাদিক সম্মেলন আশাতীত প্রচার পেল। পরের দিন দেখি লা সুইস, ট্রিবিউন দ্যা জেনিভ, এককথায় বলতে গেলে প্রতিটি সুইস পত্রিকায় পৃষ্ঠাব্যাপী সম্মেলনের খবর ও আন্দোলনের ইতিহাস প্রকাশিত হয়েছে। পত্রিকাগুলো বড় বড় করে পাকিস্তানীদের বিভ্রান্তিকর বিজ্ঞপ্তির উল্লেখ করে। দু'একটি পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তির ছবিও প্রকাশিত হয়।

পরের দিন, আঠারই আগষ্ট আমি লীগ অব রেডক্রস ও ইন্টারন্যাশনাল কমিটি অব রেডক্রসের কর্মকর্তাদের সঙ্গে দেখা করি এবং বঙ্গবন্ধুর জীবনের নিরাপত্তার জন্য তাঁদের প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে অনুরোধ করি। সেদিন অপরাহ্নে আমি লন্ডনে ফিরে আসি।

ঊনষাট

মুজিবনগর সরকার প্রতিষ্ঠার পর মাঝে মাঝে বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ লন্ডনে এসেছেন। সংসদ সদস্য বা কোন দলের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি এলে আমরা তাঁদের লন্ডনে অবস্থানের ব্যবস্থা করতাম। এছাড়া আমরা তাঁদের আগমন উপলক্ষে প্রেস কনফারেন্স ইত্যাদি করেছি। এবং অন্যান্যভাবেও যথাসম্ভব তাদেরকে প্রচারকার্যে লাগিয়েছি। তাঁরা মুজিবনগরের সঙ্গে আমাদের যোগসূত্ররূপে কাজ করতেন। তাঁদের উপস্থিতি আমাদের মনে দিয়েছে দেশের ছোঁয়া।

জুন মাসের দিকে আসেন শ্রমিক লীগের সভাপতি মোহাম্মদ শাহজাহান ও সাধারণ সম্পাদক আবদুল মান্নান। এই দুই শ্রমিক নেতার আগমন উপলক্ষে সাংবাদিক সম্মেলনের ব্যবস্থা করলাম। সম্মেলনে তারা দু'জনই আবেগময় ভাষায় মার্চের শেষের দিনগুলোর বর্ণনা দেন। জুনের ২০ তারিখে কার্ডিফে অনুষ্ঠিত সভায় আবদুল মান্নান আমার সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন। সেখানেও তিনি তাঁর অভিজ্ঞতা বর্ণনা করে যে বক্তৃতা করেন তা সকলের হৃদয় স্পর্শ করে। লন্ডনেও তাঁদের বিভিন্ন বক্তব্যে বাংলাদেশের শ্রমিকদের ওপর নির্যাতনের চিত্র তুলে ধরেন এবং বৃটেনের কয়েকজন শ্রমিক নেতার সঙ্গে দেখা করেন। আমার নেদারল্যান্ড সফরের সময় আবদুল মান্নান আমার সঙ্গে ছিলেন। আমি নেদারল্যান্ডের পার্লামেন্টের সদস্যদের কাছে তাঁকে আমাদের সংসদ সদস্য বলে পরিচয় করিয়ে দেই।

এছাড়া তেসরা জুলাই লন্ডনের কনওয়ে হলে বিভিন্ন অঞ্চলের প্রতিনিধিবৃন্দের একটি সম্মেলন হয়েছিল। সম্মেলনে মোহাম্মদ শাহজাহান ও আবদুল মান্নান মুজিবনগর সরকারের পক্ষ থেকে প্রবাসী বাঙালীদের দেশপ্রেমের ও কর্মদক্ষতার জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। শ্রমিক নেতা আবদুল মান্নানের প্রত্যাবর্তনের সময় তার সঙ্গে মুক্তিযোদ্ধাদের ব্যবহারের জন্য ওয়াকী টকী, কাপড়-চোপড় ইত্যাদি পাঠানো হয়। আখতারুজ্জামান চৌধুরীও মুজিবনগর থেকে এসেছিলেন। তাঁর আগমন উপলক্ষেও আমরা একটি সাংবাদিক সম্মেলনের ব্যবস্থা করেছিলাম। তিনি কয়েক দিন লন্ডনে থেকে কয়েকটি সভায় যোগদান করার পর যুক্তরাষ্ট্রে চলে যান। মুজিবনগর সরকারের পক্ষ থেকে কেউ এলে তাঁদের লন্ডনে অবস্থার্নের ব্যবস্থা স্টিয়ারিং কমিটি করত। হোটেল ইত্যাদির খরচও বহন করত স্টিয়ারিং কমিটি।

এই সময় প্যারিসে আন্তর্জাতিক পার্লামেন্টারী ইউনিয়নের বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হচ্ছিল। সে সম্মেলনে আগত বিভিন্ন দেশের পার্লামেন্ট সদস্যদের কাছে পাকিস্তানীদের বর্বরতার কথা তুলে ধরার জন্য লন্ডনস্থ স্টুডেন্ট এ্যাকশন কমিটি একটি প্রতিনিধি দল প্রেরণ করে। এ ব্যাপারে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন নজরুল ইসলাম, এস,এইচ,এ প্রামানিক, ওয়ালি

আশরাফ, খোন্দকার মোশাররফ হোসেন এবং মোহাম্মদ হোসেন মঞ্জু। প্রতিনিধিদল বেশ বড় ছিল। তাঁরা খুব সাফল্যের সঙ্গে নানা দেশের সদস্যদের নিকট বাংলাদেশের মুক্তি আন্দোলনের ইতিবৃত্ত তুলে ধরেন। অনেক সদস্যের সঙ্গে ব্যক্তিগত সম্পর্ক স্থাপনেও সক্ষম হন।

শুধু তাই নয়, এ সম্মেলনে বাংলাদেশের অবস্থা বর্ণনা করে বক্তব্য রাখার সুযোগও তাঁরা করে নিতে পেরেছিলেন। এ সাফল্য ছিল অভাবিত।

পার্লামেন্টের সদস্যদের কেউ কেউ লন্ডন হয়ে দেশে ফিরবার পথে আমাদের অফিসেও এসেছিলেন এবং আমার নিকট ছাত্র প্রতিনিধিদলের খুবই প্রশংসা করেছিলেন।

প্যারিস থেকে ফিরে এসে ছাত্র প্রতিনিধিদের পক্ষ থেকে নজরুল ইসলাম এবং এ,এইচ প্রামাণিক আমাকে একটি তথ্যপূর্ণ রিপোর্ট দিয়েছিলেন। সম্মেলনটি পহেলা সেপ্টেম্বর থেকে দশই সেপ্টেম্বর পর্যন্ত চলেছিল। ছাত্র প্রতিনিধিবৃন্দ পহেলা সেপ্টেম্বর প্যারিসে পৌঁছে সম্মেলনের সভাপতি আঁদ্রে সেনারনাগারের সঙ্গে দেখা করার ব্যবস্থা করেন। পরদিন সকালে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎকার ঘটে এবং প্রতিনিধিবৃন্দ তাঁকে আমার চিঠি প্রদান করেন। সেই পত্রে আমি আমাদের মুজিবনগর সরকারের পার্লামেন্টকে স্বীকৃতিদানের অনুরোধ জানিয়েছিলাম। তিনি সহানুভূতির সঙ্গে আমার তরুণ সহকর্মীদের বক্তব্য শুনেছিলেন।

ছাত্র প্রতিনিধিবৃন্দ ভারতীয় প্রতিনিধিদলের নেতা ভারতীয় লোকসভার স্পীকার জি, এস ধীলনের নিকট থেকে অত্যন্ত স্নেহপূর্ণ ব্যবহার পান। এই সম্মেলনে অন্ততঃ সাতশ' প্রতিনিধি যোগ দিয়েছিলেন বিভিন্ন দেশ থেকে। প্রত্যেক প্রতিনিধি দলেই নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন সংশ্লিষ্ট দেশের স্পীকার।

ছাত্র প্রতিনিধিবৃন্দ প্রত্যেক প্রতিনিধি দলের নেতার নিকট আমার চিঠি পৌঁছে দেন। এই চিঠির সঙ্গে ছিল বাংলাদেশ সম্পর্কিত কাগজপত্র। যেমন হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতিবিদদের বাংলাদেশের বিষয়ে লেখা প্রবন্ধ ও বিশ্বব্যাংকের রিপোর্ট। বাংলাদেশ সরকার আনুষ্ঠানিকভাবে গঠিত হবার পর প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমদ একটি তথ্য ও যুক্তিপূর্ণ ভাষণ দেন। ঐ ভাষণের পুনর্মুদ্রণ করে প্রত্যেক প্রতিনিধিদলকে দেওয়া হয়। এছাড়াও বিভিন্ন বিদেশী সংবাদপত্রে প্রকাশিত বাংলাদেশ বিষয়ক গুরুত্বপূর্ণ সংবাদের কাটিংও তাঁদের মধ্যে বিতরণ করা হয়।

বিভিন্ন প্রতিনিধিদলের সঙ্গে দেখা করে ছাত্র-কর্মীবৃন্দ স্বাধীন বাংলাদেশকে স্বীকৃতিদান, বঙ্গবন্ধুর মুক্তি এবং পাকিস্তানকে সমরাস্ত্র না দেয়ার জন্য দাবী উত্থাপন করেন। তারা সাধারণভাবে সকল প্রতিনিধিদলের নিকট থেকেই সহানুভূতিপূর্ণ ব্যবহার পেয়েছিলেন। ছাত্র প্রতিনিধিবৃন্দ, বিশেষ করে নরওয়ের এন্ডারসন এবং হ্যান্স হ্যামন রসবেকের প্রশংসা করেন। রসবেকও দেশে ফিরে আমাদের আন্দোলনের সাফল্য কামনা করে এবং ছাত্র প্রতিনিধিবৃন্দের সঙ্গে আলাপ আলোচনায় সন্তুষ্টি প্রকাশ করে আমাকে চিঠি দিয়েছিলেন। অনুরূপভাবে ইতালীর প্রতিনিধিদলের নেতা অধ্যাপক গুইসেপ ভেডো-ভেটো বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনকে তাঁর সরকার সহানুভূতির সঙ্গে দেখবে এ কথা তিনি বলেন। আমাদের পক্ষ থেকে একটি প্রতিনিধিদল ইতালীতে প্রেরণ করা হলে তিনি সর্বাত্মক সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন।

স্বাধীনতা ও গণআন্দোলনের দেশ আয়ারল্যান্ড স্বভাবতঃই বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামকে সমর্থন জানাবে। সে দেশের দলীয় নেতা কর্ম্যাক ব্রেসলিং এবং দলের সদস্য রিচার্ড গোগ্যান ও বিম্যাক শেরি পূর্ণ সমর্থনের আশ্বাস দিলেন আমাদের ছাত্র প্রতিনিধিদের। ছাত্রনেতৃবৃন্দ মিসরের প্রতিনিধিদলের সং েগও সৌহার্দপূর্ণ আলোচনা হয়েছে বলে আমাকে জানান। মিসরীয় প্রতিনিধিদলের নেতা প্রথমে বাংলাদেশের ছাত্র নেতাদের বলেন-যে, মিসর ত্যাগের পূর্বে তিনি পাকিস্তানের দূতাবাসের কাছ থেকে জানতে পেরেছেন বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলন একটি মুসলিম রাষ্ট্রকে দ্বিখন্ডিত করার অপচেষ্টা মাত্র। কিন্তু আলোচনার পরে তিনি বাংলাদেশ স্বাধীন হবেই এ ধরনের মন্তব্য প্রকাশ করেন। এছাড়া বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন পত্র–পত্রিকার সম্পাদকীয় ও অন্যান্য প্রতিবেদন পড়ার পরে আমাদের আন্দোলনের প্রতি তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন ঘটে এবং তাঁরা শেষপর্যন্ত প্রীতিপূর্ণ ও ভ্রাতৃসুলভ ব্যবহার করেন। আমার তরুণ বন্ধুদের এই অভাবিত সাফল্যে আমি গৌরব বোধ করি।

শ্রীলঙ্কার প্রতিনিধিদলের ব্যবহারে আমার ছাত্র বন্ধুদের মনে হয়েছে, তাঁরা যেন শ্রীলঙ্কা থেকে এসেছেনই আমাদের আন্দোলনকে সমর্থন জানাতে। দলের নেতা ছিলেন লেসলি গুনবর্ধন, সদস্য ছিলেন এইচ ভি দিশা নায়েক ও ভি, এন, নবরত্নম। নবরত্নম নিজে অন্যান্য প্রতিনিধির কাছে বাংলাদেশের হয়ে কাজ করেছেন এবং দেশে ফিরে বেসামরিক পোশাকে যাতে সামরিক বাহিনীর লোকেরা বিমানে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে শ্রীলঙ্কার আকাশ হয়ে ঢাকায় না আসতে পারে সে চেষ্টা করার প্রতিশ্রুতি দেন। তাঁর কাছে আমরা সত্যি ঋণী হয়ে আছি।

লাইবেরিয়ার প্রতিনিধিদলের নেতা বাংলাদেশ সরকারকে আফ্রিকায় একটি কূটনৈতিক দল প্রেরণের পরামর্শ দিয়েছিলেন। নেতা সেই দল পাঠানো হলে সাহায্য করার আশ্বাসও দেন।

জর্ডনের প্রতিনিধিদলের নেতা আল হোসাইনী আমাদের প্রতিনিধিদলের নিকট থেকে সকল খবর পাওয়ার পর খুবই অভিভূত হন এবং আহতচিত্তে বলেন যে, তিনি এসব নিপীড়ন ও নির্যাতনের কথা দেশে ফিরে গিয়ে জর্ডনের বাদশাহকে অবহিত করবেন। ছাত্র সমিতির প্রতিনিধিবৃন্দ মার্কিন প্রতিনিধি দলের নেতা এডওয়ার্ড জে, ডারউয়িন্সকির সঙ্গে দেখা করেন। সাক্ষাৎকারের সময় মার্কিন দলের সদস্য মাইকা ম্যানসফিল্ড, জ্যাকভাকো জেভিডসও ছিলেন। ছাত্রনেতারা তাঁদের অনুরোধ করেন পাকিস্তানে সমরাস্ত্র না পাঠাতে। উত্তরে ডারউয়িন্সকি বলেন যে, নতুন কোন অস্ত্র পাকিস্তানকে দেয়া হচ্ছে না। তবে পূর্ব চুক্তি অনুসারে খুচরা যন্ত্রাংশ দেয়া হচ্ছে বলে স্বীকার করেন। জ্যাকভ জেভিডস বাংলাদেশে পাক হানাদার বাহিনী যে অকথিত অত্যাচার চালাচ্ছে তা শুনে বলেন যে, তিনি এসব কথা দেশে ফিরে গিয়ে ব্যক্তিগতভাবে প্রেসিডেন্ট নিক্সনকে জানাবেন। ছাত্ররা ফিরে এসে আরো জানান যে, ল্যাতিন আমেরিকা এবং স্ক্যান্ডেনেভিয়ান দেশসমূহের প্রতিনিধিবৃন্দ সর্বদা সহানুভূতিপূর্ণ ব্যবহার করেছেন। আমি ইতিপূর্বেই উল্লেখ করেছি যে, ফ্রান্সের জাতীয় ছাত্র সমিতির সঙ্গে তাঁদের সাক্ষাৎকার খুবই ফলপ্রসূ হয়েছিল এবং ফরাসী ছাত্রবৃন্দ বাংলাদেশের ছাত্রদের সঙ্গে একাত্মতা প্রকাশের জন্য বিরাট শোভাযাত্রা বের করেছিলেন। বাংলাদেশের পরিস্থিতিতে

সহানুভূতি জানিয়ে আন্তঃ পার্লামেন্টারী ইউনিয়নে একটি প্রস্তাবও গৃহীত হয়।

আগস্টের শেষের দিকে রুমানিয়ায় 'বিজ্ঞান ও বিশ্বশান্তি' শীর্ষক একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনের খবর আমরা যখন পেলাম, তখন সম্মেলন প্রায় শুরু হয়ে গেছে। আমাদের তো প্রধান কাজ হচ্ছে জনসংযোগ, তাই সে অবস্থাতেও এখানে প্রতিনিধি প্রেরণের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করলাম। ছাত্রনেতা মোহাম্মদ হোসেন মঞ্জু আমাদের আন্দোলনের পক্ষে সারাক্ষণ কাজ করছিলেন। তাঁর কর্মোদ্যম আমি আনন্দের সঙ্গে লক্ষ্য করে এসেছি। তাই এই শেষ সময়ে হলেও আমি তাঁকে রুমানিয়ায় যাওয়ার অনুরোধ করলে তিনি রাজী হন। তিনি আমাদের আন্দোলন সম্পর্কিত প্রচার পুস্তিকাসহ তিরিশে আগস্ট বুখারেস্টে পৌঁছলেন। সেখান থেকে দু'শ মাইল দূরে সিনাইয়া শহরে সম্মেলন হচ্ছিল। তিনি সেদিনই সেখানে পৌঁছেন। তিনি ভারতীয় প্রতিনিধিদলের নেতা শরা ভাইয়ের সঙ্গে দেখা করেন। শরা ভাইয়ের সঙ্গে তাঁর কার্য পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা হয়। ভারতীয় দলের অন্য দু'জন সদস্য শিশির গুপ্ত ও হোসেন জাহির তাঁকে অন্য দেশের কয়েকজন প্রতিনিধির সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন। এই সম্মেলনে মোহাম্মদ হোসেন মঞ্জু মার্কিন প্রতিনিধিদলের সদস্য জেরি স্মিথের সঙ্গে দেখা করে পাকিস্তানে সমরাস্ত্র প্রেরণ বন্ধ করতে অনুরোধ করেন। এরপর তিনি দেখা করেন সোভিয়েত প্রতিনিধিদলের সঙ্গে এবং তাঁদের কাছেও সহৃদয় ব্যবহার এবং আন্দোলনে সাহায্যের প্রতিশ্রুতি লাভ করেন। ডঃ থর্নার সঙ্গেও তার দেখা হয়। থর্নার একজন শিক্ষক। ঢাকায় হত্যাযজ্ঞের সময় তিনি সেখানেই ছিলেন। স্বভাবতঃই আমাদের আন্দোলনের প্রতি তাঁর যথেষ্ট সহানুভূতি ছিল।

সম্মেলনে সভাপতিত্ব করছিলেন সুইডেনের বিখ্যাত অধ্যাপক এ্যালভেন। মোহাম্মদ হোসেন মঞ্জু তাঁর সঙ্গে দেখা করে আমার চিঠি ও বেশ কিছু কাগজপত্র দেন। অধ্যাপক এ্যালভেন পরের দিনের অধিবেশনে বাংলাদেশের প্রসঙ্গ উত্থাপনের প্রতিশ্রুতি দেন। সম্মেলনে মোহাম্মদ হোসেনের পক্ষে যোগদান সম্ভব ছিল না বলে তিনি পরদিন বুখারেস্টে ফিরে আসেন এবং সেদিনই রুমানিয়ার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে গিয়ে উচ্চপদস্থ কূটনীতিবিদ পেট্রেস্কুর সঙ্গে দেখা করার চেষ্টা করেন। কিন্তু পেট্রেস্কু তখন দেশের বাইরে থাকায় সম্ভব হয়নি। রুমানিয়ার লন্ডনস্থ দূতাবাস পেট্রেস্কুর সঙ্গে দেখা করতে বলে দিয়েছিলেন।

আমাদের আন্দোলনে বিবিসি-র ভূমিকা সম্পর্কে কিছু বলতে চাই। পাকিস্তানের অসন্তুষ্টির ব্যাপারে কোন ভ্রূক্ষেপ না করে বিবিসি অকাতরে বাংলাদেশের নিপীড়িত মানুষের প্রকৃত অবস্থা তুলে ধরেছেন। তাঁদের নির্ভীক সত্য ভাষণের মাধ্যমে বিশ্ববাসী জেনেছেন, পাকিস্তানের অকথিত অত্যাচারের কাহিনী। সকলের আগে মনে পড়ে বাংলা বিভাগের অনুষ্ঠান সংগঠক সিরাজুর রহমানের কর্তব্যপরায়ণতার কথা। বিবিসি-র কর্মচারীরূপে তিনি অবশ্যই ছিলেন নিরপেক্ষ। কিন্তু ভোলেননি, তিনি বাঙালী। তিনি ভালবাসেন বাংলার মাটি ও মানুষকে। তাই সত্য ও সঠিক সংবাদ সংগ্রহ করে তার প্রচারে তিনি অবিরত পরিশ্রম করেছেন। তিনি বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ পরিবেশন করেই বাংলাদেশের মানুষের সীমাহীন নির্যাতনের কথা বিশ্ববাসীর কাছে পৌঁছে দিয়েছেন। ব্যক্তিগতভাবে আমাদের প্রেস রিলিজগুলো বিতরণের

ব্যাপারে আমরা তাঁর পরামর্শ এবং সাহায্য পেয়েছি। এবং তাঁর কাছ থেকেও আমরা অনেক তথ্য সংগ্রহ করতে পেরেছি। এই বাঙালীর নীরব সেবা চিরদিন মনে থাকবে।

বাংলা বিভাগের শ্যামল লোধের মধ্যে দেখেছিলাম নিপীড়িত মানুষের জন্য আন্তরিক বেদনাবোধ ও অস্থিরতা। আমি যখনই বিবিসির বাংলা বিভাগে গিয়েছি, তাঁর মানবিকতা আমার মনে গভীর দাগ কেটেছে। ব্যক্তিগতভাবে একটি কথা আমার চিরদিন মনে থাকবে। দশই এপ্রিল বিবিসি কর্তৃক প্রচারিত আমার প্রথম সাক্ষাৎকারের রেকর্ডিং তিনিই করেছিলেন। শ্যামল লোধ আজ নেই। কৃতজ্ঞতার সঙ্গে তাঁকে স্মরণ করি।

বাংলা বিভাগের প্রবীণতম সদস্য কমল বোসও আমাদের নানাভাবে সাহায্য করেছেন। আমাদের কর্মীরা তাঁর কাছ থেকে পেয়েছে নানা উপদেশ।

জন ক্যাপহ্যাস ছিলেন বাংলা বিভাগের প্রধান। তিনিও বাংলাদেশ সম্পর্কে সঠিক খবর সংগ্রহে ছিলেন সদা উন্মুখ। বাংলাদেশের অভ্যন্তরে যে সাড়ে সাত কোটি মানুষ রুদ্ধশ্বাস পরিস্থিতির মধ্যে দিনযাপন করেছেন, তাঁরা কান পেতে ছিলেন বিবিসি-র খবরের জন্য। নানা প্রতিকূলতা সত্ত্বেও বাংলাদেশের খবর সংগ্রহ করে বাংলাদেশবাসীকে জানাতে হবে—তাঁর এই দায়িত্বের কথা তিনি উপলব্ধি করেছেন। বিবিসির প্রচারিত খবরের মারফতই পথে—প্রান্তরে সংগ্রামরত মুক্তিযোদ্ধারা জানতে পেরেছেন তাঁদের সমর্থনে রয়েছে বিশ্ব জনমত। মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে শুনতে পেরেছেন বিদ্রোহী কবি নজরুল ইসলামের অমর বাণী।

শক্তিহীনের বক্ষে জাগাব
শক্তির বিস্ময়
জয়, জীবনের জয়।।
ডঙ্কা বাজারে শঙ্কা হরণে
আনিব সমরে অমর মরণে
কণ্টক-ক্ষত নগ্ন চরণে
  দলিব মৃত্যু-ভয়।
মরু অরণ্য গিরি-পর্বতে রচিব
    রক্তপথ
সেই পথ ধরি ভবিষ্যতের আসিবে
    বিজয় রথ।

গত কয়েক মাসের ঘটনা প্রবাহের পর্যালোচনা করলে বৃটেন এবং অন্যান্য দেশের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সহানুভূতি ও নিপীড়িত মানুষের জন্য মমত্ববোধের কথা মনে পড়ে।

ওয়ার্ল্ড ফিচার সার্ভিস একটি সংবাদ সংস্থা। তাঁর ম্যানেজিং ডিরেক্টর ডেরেক চার্লস আন্দোলন শুরুর অব্যবহিত পরেই আমার একটি সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর এই সাক্ষাৎকারটি পৃথিবীর নানা দেশেই প্রকাশিত হয়েছিল। প্রথম সাক্ষাৎকারের ভিতর দিয়েই

একটি ব্যক্তিগত বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে। তিনি তাঁর ফটোগ্রাফারসহ কিছুদিন পরপরই আমাদের অফিসে আসতেন, আমাদের সভা-সমিতিতে যোগদান করতেন এবং সভাগুলোর সংবাদ বিভিন্ন দেশের পত্র-পত্রিকায় প্রকাশের জন্য বিতরণ করতেন। এমনকি পরে সেই পত্রিকাগুলোর ক্লিপিংও পাঠাতেন। এঁরা পেশাগত কর্তব্য পালনের জন্য এসে শেষপর্যন্ত ব্যক্তিগতভাবে বন্ধু হয়ে যেতেন। এই বন্ধুত্ব অবশ্য আদর্শগত। আমাদের সংগ্রাম সকল মানুষের মুক্তির সংগ্রাম, একথা যাঁরা হৃদয় দিয়ে উপলব্ধি করেছেন তাঁরা নিজেদেরও অজ্ঞাতে আমাদের বন্ধু হয়ে গেছেন। ডেরেক চার্লস তাঁর সুরুচি, সৌজন্য এবং সহমর্মিতার দ্বারা আমাদের হৃদয়ে একটি প্রীতিময় ছাপ রেখেছেন।

আন্তর্জাতিক খ্যাতিমান সাংবাদিক জন পিলজার আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করেছেন নিয়মিত। তিনিও পেশাগত দায়িত্ব পালন করতে এসে আন্তরিকভাবেই আমাদের আন্দোলনের সঙ্গে একাত্ম হয়ে পড়েন। তিনি ছিলেন তখন 'ডেইলি মিররের' একজন তরুণ সাংবাদিক। নিজের জীবনের উপরে ঝুঁকি নিয়ে তিনি জুন মাসেই বাংলাদেশে ঢুকে পড়েন। ষোলই জুনের ডেইলি মিররের প্রথম পৃষ্ঠায় বাংলাদেশে তাঁর চোখে দেখা অভিজ্ঞতার কথা প্রকাশিত হয়। প্রতিবেদনটির শিরোনাম ছিল 'একটি জাতির মৃত্যু' (ডেথ অব এ নেশন)। তাতে তিনি লেখেন ঃ 'পশ্চিম পাকিস্তানের সামরিক সরকার বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষের বিরুদ্ধে গণহত্যায় লিপ্ত। সাড়ে সাত কোটি বাঙালীর অর্থ সমগ্র মানবজাতির শতকরা দু'জন।' তিনি আরো বলেন, 'একজন মানুষ তার শার্ট তুলল, দেখতে পেলাম তার পেটে বেয়নেটের সুস্পষ্ট দাগ, অনেকগুলো। দেখতে পেলাম অসহায় একটি নারী স্বামীর কবরের পাশে বসে আর্তনাদ করছে।' তাঁর এই প্রতিবেদনটি ডেইলি মিররে প্রকাশিত হবার পর তাঁকে টেলিফোন করে ধন্যবাদ দিলাম। তিনি এর দু'একদিন পর আমার সঙ্গে দেখা করে বাংলাদেশের অভ্যন্তরের অবস্থার মৌখিক বিবরণ দিলেন। নিপীড়ন এবং অসহনীয় দুর্ভিক্ষের কথা উল্লেখ করার সময় আমি তাঁর চোখে-মুখে তীব্র প্রতিবাদ ফুটে উঠতে দেখলাম। তিনি যেন নিজেই আঘাত পেয়েছেন, এমন মনে হচ্ছিল। তিনি আমাকে আরো বললেন, 'বাংলাদেশ তার নিজস্ব শক্তিতে জয়ী হবে, এ আমার নিশ্চিত ধারণা, কেননা, আমি দেখে এলাম যে, বাংলার বীর রমণীরাও রাস্তায় নেমে এসেছেন, যোগদান করেছেন সংগ্রামে।'

জন পিলজারের সঙ্গে কথা বলার কয়েকদিন পরে রাত্রে টেলিভিশনে সংবাদ শুনছি। বিবিসি'র রিপোর্টার টেলিভিশন ক্যামেরা নিয়ে যশোহরের গ্রামে গিয়েছিলেন। সেখানে তের-চৌদ্দ বছরের একজন ছেলেকে তিনি জিজ্ঞেস করেন, 'তুমি কি মনে কর যে তোমরা পাকিস্তানী সৈন্যদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে জয়ী হতে পারবে ?' ছেলেটি উত্তর দিল, 'নিশ্চয়ই।' রিপোর্টার আবার জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমাদের তো সৈন্য কম, তাদের তো অনেক সৈন্য, অনেক আধুনিক অস্ত্র।' বালকটি আবার বীরত্বব্যঞ্জক সুরে বলল, 'তা থাক। বাংলার মাটিও তাদের বিরুদ্ধে। বাংলার মাটি পাকিস্তানীদের তার উপরে দাঁড়াতে দেবে না।'

অবিভক্ত পাকিস্তানে বৃটেনের শেষ রাষ্ট্রদূত স্যার সিরিল পিকার্ড আমাকে মে মাসের দিকে প্রথম টেলিফোন করেন। আমি তাঁর সঙ্গে দেখা করলে তিনি আন্তরিক সহানুভূতি জ্ঞাপন

করেন। ঢাকার নির্মম ঘটনাবলী তাকে খুবই বিক্ষুব্ধ করেছিল। তিনি আমাকে বললেন যে, তিনি লন্ডনে কয়েকমাস ছুটিতে থাকবেন। তারপরে অন্য কোথাও বৃটেনের রাষ্ট্রদূত হয়ে যাবেন। এই সময়টাতে তিনি যদি কোনভাবে কাজে লাগেন তাহলে খুশী হবেন। আমি তাঁকে আগে থেকেই চিনতাম। আমার পিতার সঙ্গেও তাঁর খুব বন্ধুত্ব হয়েছিল। তিনি যখনই ইসলামাবাদ থেকে আসতেন, ঢাকায় স্পীকার হাউসে থেকে আমার পিতার সঙ্গে দেখা করতেন। ১৯৬৮ সালে আমার পিতৃবিয়োগের পরে ঢাকায় এসে আমার সঙ্গে দেখা করেছিলেন। এভাবেই একাত্তরের আগে তাঁর সঙ্গে আমার বেশ কিছুটা ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল। একাত্তরে লন্ডনে নিজে থেকেই আমার খোঁজ করেন। সে সময় আমি তাঁকে বঙ্গবন্ধুর অবস্থা জেনে আমাদের জ্ঞাত করানোর জন্য অনুরোধ করি। তিনি বলেন যে, ইসলামাবাদ ত্যাগ করার আগে তিনি নিজেই খবর নিয়েছিলেন। তাতে জানতে পারেন যে, বঙ্গবন্ধু বেঁচে আছেন, ভাল আছেন। এই মহানুভব মানুষটি প্রায়ই আমার খোঁজখবর নিতেন। বৃটিশ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধুর অবস্থার কথা তাঁরা যতদূর জানতে পারতেন, স্যার সিরিল পিকার্ড আমাকে তা জানাতেন।

বৃটিশ তরুণ-তরুণীদের দ্বারা গঠিত বাংলাদেশ এ্যাকশন কমিটির অফিস ক্যামডেন টাউনে ম্যারিয়েটের একটি বড় বাড়ীতে অবস্থিত ছিল। ম্যারিয়েট ছিলেন কেম্ব্রিজের একটি কলেজ শিক্ষিকা। এরা বাংলাদেশের দুর্গত নর-নারীর জন্য কাপড়, ওষুধ, খাদ্যসামগ্রী প্রেরণ করতেন। আমাদের আন্দোলনের শেষের দিকে পল কনেটের স্ত্রী এ্যালেন কনেট এসব নিয়ে মুজিবনগর হয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করার সময় পাকিস্তানী সৈন্যদের হাতে গ্রেফতার হন। দেশ স্বাধীন না হওয়া পর্যন্ত তিনি কারাগারে আটক ছিলেন।

এই প্রতিষ্ঠানটির সদস্যবর্গ একটি কোচ ভাড়া করে প্যারিসে গিয়েছিলেন। সে সময় প্যারিসে এইড কনসর্টিয়ামের সভা হচ্ছিল। এরা তখন কনসর্টিয়াম ভবনের সামনে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন। তাছাড়া এঁরা লন্ডন থেকে তিনটি ট্রাক বোঝাই করে কাপড়, খাদ্য, ওষুধপত্র বাংলাদেশে পাঠিয়েছিলেন। এঁদের স্বেচ্ছাসেবকগণ এই ট্রাকগুলো চালান। এই কর্মসূচীর নাম দেয়া হয় 'অপারেশন ওমেগা।' যতদূর মনে পড়ে আগষ্ট মাসের মাঝামাঝি এই ট্রাকগুলো লন্ডন ত্যাগ করে। এরা ট্রাফালগার স্কোয়ার থেকে যাত্রা শুরু করে। সে সময় মহিলা সমিতি ও ছাত্র সমিতির প্রতিনিধিবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। স্টিয়ারিং কমিটির সদস্যবৃন্দ এবং অনেক শাখা সমিতির প্রতিনিধিবৃন্দও এসেছিলেন। তাঁদের যাত্রার সময় অনেক সাংবাদিক উপস্থিত ছিলেন। মহিলা সমিতির পক্ষ থেকে তাঁদের মাল্যদান করা হয়েছিল। এবং বাঙালীগণ জয়বাংলা ধ্বনির দ্বারা তাঁদেরকে অভিনন্দন জানিয়েছিল। ভারত হয়ে বাংলাদেশে প্রবেশের সময় পাকিস্তানী সৈন্যরা তাঁদের বাধা দেয়। ফিরে এসে তাঁরা কলকাতায় কাজ করেন।

এনামুল হক বাংলাদেশ গণসংস্কৃতি সংসদ নামক একটি সাংস্কৃতিক সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি ছিলেন। এঁরা লন্ডন ও অন্যান্য জায়গায় কয়েকটি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এনামুল হক রচিত 'অস্ত্র হাতে তুলে নাও' নৃত্যনাট্যটি পরিবেশন করেন। এটি ছিল বাংলাদেশের মুক্তি

সংগ্রামের বিপ্লবী আলেখ্য। এরা ১৮ এবং ১৯শে সেপ্টেম্বর কনওয়ে হলে একটি অত্যন্ত সফল অনুষ্ঠান করেন। আমি এর উদ্বোধন করি। বাঙালী শিল্পীদের পরিবেশিত গীতি বিচিত্রা সকলেরই হৃদয় স্পর্শ করেছিল। এই সংস্কৃতি সংসদের সম্পাদিকা মুন্নী রহমানও যথেষ্ট পরিশ্রম ও একাগ্রতার সঙ্গে আমাদের আন্দোলনে কাজ করেছেন। ফাহমিদা হাফিজও এই সংসদের সদস্যরূপে আমাদের আন্দোলনের সাফল্যের জন্য পরিশ্রম করেছেন।

এনামুল হক একজন প্রতিভাবান লেখক। গণসংস্কৃতি সংসদ প্রতিষ্ঠার পর ১৫ই নভেম্বর তিনি আমার কাছে একটি চিঠি লিখে এই সংস্থা পরিচালনা ও নিয়মিত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান করতে মাসিক এক হাজার তিনশ' আশি পাউন্ড বরাদ্দের জন্য অনুরোধ করেন। চিঠিটি 'বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ ঃ দলিলপত্র'-এর ৪র্থ খন্ডে প্রকাশিত হয়েছে। বিষয়টি নিয়ে আমি স্টিয়ারিং কমিটির সদস্যদের সঙ্গে পরামর্শ করি। কিন্তু কমিটি আলোচনার পর সিদ্ধান্তে আসে যে, যেহেতু বাংলাদেশ ফান্ডের অর্থ মূলতঃ অস্ত্র ক্রয়ের জন্য, সেহেতু সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডে এই ফান্ড থেকে অর্থ দেয়া হলে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হতে পারে। তাঁরা নিজেরাও যুদ্ধাবস্থায় এই খরচের পক্ষপাতি নন। যদি আন্দোলন দীর্ঘস্থায়ী হয় তখন এরূপ একটি পরিকল্পনা বিবেচনা করা যেতে পারে। বর্তমানে কিছু করা সম্ভবপর নয়।

উপরোক্ত কারণে কেন্দ্রীয় ফান্ড থেকে অর্থ বরাদ্দ করা সম্ভব না হলেও আমাদের কোন কোন আঞ্চলিক সমিতি তাঁদের নিজস্ব ফান্ড থেকে অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছেন। ম্যানচেস্টার কমিটির খরচে এমনি একটি সাফল্যজনক অনুষ্ঠান ১৬ই অক্টোবর ফ্রি ট্রেড হলে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এ ব্যাপারে ম্যানচেস্টার সমিতির সভাপতি ও ল্যাঙ্কাশায়ারের অঞ্চলের অবিসংবাদী নেতা আব্দুল মতিন যথেষ্ট পরিশ্রম করেছিলেন।

শুধু এ ব্যাপারে নয় সকল ব্যাপারেই সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে তাঁর ভূমিকা ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ছাব্বিশে মার্চের পর থেকে ২৪শে এপ্রিল কভেন্ট্রির সম্মেলন পর্যন্ত ঐক্য স্থাপনের জন্য তিনি দিবারাত্রি পরিশ্রম করেছেন। কভেন্ট্রির সাফল্যে তাঁর অবদান অবিস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

ওয়ালি আশরাফ সম্পাদিত সাপ্তাহিক জনমত পত্রিকা আমাদের স্বাধীনতা আন্দোলনে বিশেষ অবদান রেখেছে। বাঙালী মহলে পত্রিকাটি ছিল বহুল প্রচারিত। বৃটেনের বাইরেও প্রবাসী বাঙালীগণের অনেকে জনমতের গ্রাহক ছিলেন। স্বাধীনতা আন্দোলন শুরু হওয়ার পর তারা, নিজেরাই পাকিস্তান দূতাবাস থেকে যেসব বিজ্ঞাপন নিয়মিত পেতেন সেগুলো প্রত্যাখ্যান করেন। পত্রিকায় ওয়ালি আশরাফ ও আনিস আহমেদ জোরালো ভাষায় বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের পক্ষে সম্পাদকীয় লিখেছেন। আন্দোলনের কাজে ওয়ালি আশরাফকে বিভিন্ন স্থানে যেতে হয়েছে। সে সময় আনিস আহমেদ পত্রিকার সকল দায়িত্ব বহন করেন। ওয়ালি আশরাফ বুদাপেস্টে বিশ্বশান্তি সম্মেলন এবং নেদারল্যান্ডে বাংলাদেশ মৈত্রী সমিতি আহুত সম্মেলনে যোগদান করে বাংলাদেশের স্বাধীনতার বাণী পৌঁছে দেন।

মিনহাজউদ্দিন বৃটেনের বাঙালী মহলে অত্যন্ত প্রভাবশালী ব্যক্তিত্ব। ছাব্বিশে মার্চ আমার লন্ডনে পৌঁছার অব্যবহিত পরেই তাঁর সঙ্গে আমার দেখা হয়। আমি সব সময়ই

ব্যক্তিগতভাবে তাঁর কাছ থেকে প্রীতিপূর্ণ ব্যবহার পেয়েছি। কোনদিন তিনি কোনরূপ সমস্যার সৃষ্টি করেননি। সমস্যা সমাধানের জন্য সর্বদা আন্তরিকতার সঙ্গে চেষ্টা করেছেন। তাঁর একটিমাত্র লক্ষ্য ছিল, বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জন। তাঁর প্রতিটি কাজের দ্বারা সেই উদ্দেশ্য যাতে সাফল্যমন্ডিত হয় সেই জন্য তিনি ছিলেন সর্বদা সচেতন। তাঁকে আমি আলাপ-আলোচনায় দেখেছি ধীর-স্হির, তাঁর মতামত ছিল সুবিবেচনাপ্রসূত। আমাদের সকল সভা-সমিতিতেই তিনি উপস্হিত থাকতেন। তাঁর সাহচর্য আমাকে আনন্দ দান করেছে এবং একসঙ্গে আমরা বহু অনুষ্ঠানেই গিয়েছি। এই নয় মাসেই তাঁর একাগ্রতা ও আন্তরিকতা স্বাধীনতা আন্দোলনকে করেছে শক্তিশালী এবং কর্মীদের জুগিয়েছে উৎসাহ।

গত ৪ঠা জুলাই সংবাদে প্রকাশিত একাত্তরের ১৫ই নভেম্বর ডঃ এনামুল হক লিখিত একটি পত্রের উল্লেখ করে বলা হয় যে, তিনি গণ-সংস্কৃতি সংসদের পরিচালনা ইত্যাদি বাবদ এক হাজার তিনশ আশি পাউন্ড বরাদ্দের জন্য অনুরোধ করেছিলেন। বস্তুতঃ তাঁর অনুরোধ ছিল যুদ্ধচেতনা সমুন্নত রাখার স্বার্থে নিয়মিত সাংস্কৃতিক কার্যক্রম পরিচালনার প্রয়োজনে একটি স্বতন্ত্র বাংলাদেশ সাংস্কৃতিক কেন্দ্র আমার নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত করে স্টিয়ারিং কমিটি অথবা বাংলাদেশ দূতাবাসের শাখারূপে পরিচালনা করা এবং উপরোক্ত অঙ্কটি ছয় মাসের প্রস্তাবিত বাজেট ছিল, একমাসের নয়। তাঁর এই দীর্ঘ পত্রটি সংক্ষেপে উল্লেখ করতে যেয়ে এই অনিচ্ছাকৃত ভুল হওয়ায় আমি আন্তরিকভাবে দুঃখিত।

ইন্ডিয়া উইকলির সম্পাদক তারাপদ বসু আমাদের সঙ্গে সবসময়ই যোগাযোগ রেখেছেন। পত্রিকাটি লন্ডন থেকে প্রকাশিত হতো। তারাপদ বসু আমাদের বিভিন্ন সভায় যোগদান করতেন। নিজে উপস্হিত থাকতে না পারলে প্রতিনিধি পাঠাতেন। এই ইংরেজী সাপ্তাহিক পত্রিকাটি বৃটেন প্রবাসী ভারতীয়দের নিকট জনপ্রিয় ছিল।

গ্রেট বৃটেনের বাংলাদেশ স্টুডেন্টস এ্যাকশন কমিটির অফিস ছিল ১২০ নম্বর হো বর্ণের গ্যামজেস ভবনের ৩৫ নম্বর কক্ষে। আমাদের সংগ্রাম শুরু হবার মুহূর্ত থেকেই এই সমিতির বিভিন্ন দৃপ্ত কর্মকান্ডের কথা আগেই উল্লেখ করেছি।

এই সমিতির প্রাণকেন্দ্র ছিলেন নজরুল ইসলাম। তাঁর অধ্যবসায় এবং পরিশ্রম আমাকে মুগ্ধ করেছে। সমিতির আহবায়ক খন্দকার মোশাররফ হোসেনও ছিলেন একজন অতি কর্মচঞ্চল মানুষ। এরাঁ এবং এঁদের সহকর্মীগণ অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন আন্দোলনের কাজে। এরা আন্তঃপার্লামেন্টারী সম্মেলনের সময় প্যারিসে অবস্হানকালে ফরাসী ছাত্রদের কাছে বাংলাদেশের নিপীড়িত নির্যাতিত ছাত্রদের বাণী পৌঁছে দেন।

বাংলাদেশ স্টুডেন্টস এ্যাকশন কমিটি বহু শোভাযাত্রার আয়োজন ও তাতে যোগদান করেছে। এছাড়া অনেকগুলো সভারও আয়োজন করেছে। যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক পাকিস্তানে সমরাস্ত্র প্রেরণের সংবাদ প্রকাশিত হওয়ার পর এঁরা অস্ত্র প্রেরণ বন্ধ এবং শেখ মুজিবের মুক্তির দাবীতে লন্ডনস্হ মার্কিন দূতাবাসের সামনে অনশন করেন। অনশনে যোগদান করেন আবদুল হাই খান ও রাজিয়া চৌধুরী। এই দু'জনের অনশন শুরু হবার পর আমি প্রতিদিনই তাঁদের দেখতে যেতাম। কয়েকদিন পরে তাঁদের অবস্হা দেখে আমি খুব চিন্তিত হয়ে অফিসে

ফিরে এসে ভাবছিলাম কি করা যায়। এমন সময় টেলিফোন বেজে উঠল। ফোন ধরতেই মার্কিন দূতাবাসের রাজনৈতিক সচিব মিঃ কিং এর কন্ঠ শুনতে পেলাম। ইনিই আমার ভিসার ব্যবস্থা করেছিলেন। তিনি খুব বিনীত স্বরে বললেন যে, রাষ্ট্রদূত থেকে শুরু করে সবাই অনশনের ব্যাপারে খুব উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছেন। কারো প্রাণহানি হলে তাদের জন্য নিরতিশয় দুঃখের কারণ হয়ে দাঁড়াবে। তিনি বললেন আমাদের মনোভাব রাষ্ট্রদূত তাঁর সরকারকে যথাযথভাবে জানাবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে অনশন প্রত্যাহারের ব্যবস্থা করতে সনির্বন্ধ অনুরোধ করেছেন।

আমি নিজেই যখন খুব বিষণ্ন হয়ে পড়েছিলাম ঠিক সে সময়ে মার্কিন দূতাবাস থেকে ফোন পেয়ে স্টিয়ারিং কমিটি ও স্টুডেন্ট এ্যাকশন কমিটির নেতৃবৃন্দের সঙ্গে তখনই আলোচনায় বসলাম। আলোচনার পর ঠিক হলো যে, আমি পুনরায় মার্কিন দূতাবাসের সামনে গিয়ে অনশন ভাঙ্গতে অনুরোধ জানাব। তাঁরা যাতে আমার অনুরোধে অনশন ভঙ্গ করেন সেজন্য ক্ষেত্র প্রস্তুত করতে কয়েকজন ছাত্র নেতাকে পাঠানো হলো। ইতিমধ্যে প্রেসকেও খবর দেয়া হলো। তারপর সাংবাদিকদের সম্মুখে আমি অনেক অনুরোধ করে তাঁদেরকে কমলালেবুর রস পান করিয়ে অনশন ভঙ্গ করালাম। তারপর তাঁদেরকে নিয়ে নিকটস্থ এক বাঙালী রেস্টুরেন্টে গেলাম। সেখানে আবদুল হাই এবং রাজিয়া চৌধুরী কতক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে স্ব স্ব স্থানে চলে যান।

এসব ছাড়াও বিভিন্ন সময়ে ছাত্র সমিতি অনেক প্রচার পত্রিকা প্রকাশ করে আন্দোলনে যথেষ্ট সহায়তা করেন। খন্দকার মোশাররফ হোসেন এবং নজরুল ইসলাম 'ফ্রেন্ডস অব বাংলাদেশ' কর্তৃক হল্যান্ডে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে যোগদান করেন। সেই সম্মেলনে আমি উপস্থিত হতে না পারায় আমার প্রতিনিধিরূপে ওয়ালি আশরাফ যোগদান করেন।

আনিস আহমেদ এবং এ, জেড, এম, হোসেন স্কটল্যান্ডে অনুষ্ঠিত কয়েকটি শ্রমিক সম্মেলনেও যোগদান করেন এবং বাংলাদেশে শ্রমিক নির্যাতনের কথা বৃটেনের শ্রমিকদের নিকট তুলে ধরেন।

বাংলাদেশ মহিলা সমিতিও অত্যন্ত কর্মচঞ্চল প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছিল। এরাও পৃথকভাবে বেশ কয়েকটি সম্মেলনের আয়োজন করেন। তাছাড়া স্টিয়ারিং কমিটি ও অন্যান্য সমিতি কর্তৃক আয়োজিত সভায় যোগদান করতেন সমিতির সদস্যবৃন্দ। সমিতির পক্ষ থেকে বক্তৃতা করতেন সভানেত্রী জেবুন্নেসা বখস ও অন্যান্য মহিলা নেতৃবৃন্দ। আমাদের আন্দোলনের কাজে ব্যবহৃত পোস্টারগুলো লেখায়ও তাঁদের অবদান ছিল অপরিসীম। ফেরদৌসি রহমানের বাড়ীতে যখনই গিয়েছি, দেখেছি তাঁর বাড়ী বোঝাই রয়েছে পোস্টারে। আর সবাই মিলে তৈরী করছেন পোস্টার, পতাকা ইত্যাদি।

মহিলা সমিতি একটি শোভাযাত্রা করে 'সেভ দি চিলড্রেন'-এর অফিসে গিয়ে ভারতে অবস্থানরত শরণার্থী শিশুদের মৃত্যু ও দুর্বিষহ জীবনযাপনের বর্ণনা দেয় এবং একটি স্মারকলিপি প্রদান করে।

পল কনেট কর্তৃক প্রেরিত 'অপারেশন ওমেগা' সংক্রান্ত কাজেও মহিলা সমিতি যথেষ্ট

সহায়তা করে।

কমনওয়েলথ ইউনিভার্সিটিজ এ্যাসোসিয়েশনের সেক্রেটারী জেনারেল স্যার হিউ স্প্রিংগার এপ্রিল মাসের প্রথম সপ্তাহেই ইয়াহিয়া খানের নিকট ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অবিলম্বে রক্তপাত বন্ধের জন্য টেলিগ্রাম পাঠিয়েছিলেন। তারপর থেকে তিনি আমাদের প্রতি নানাভাবে সহানুভূতি প্রদর্শন করেছেন। একটি ঘটনা থেকেই তাঁর মনোভাব উপলব্ধি করা যাবে। আমেরিকার কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেসিডেন্ট জুলাই মাসের মাঝামাঝি লন্ডনে এসেছিলেন। তাঁদের সম্মানার্থে স্যার হিউ স্প্রিংগার কমনওয়েলথ এ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট হলে একটি ভোজসভার আয়োজন করেন। এতে বৃটেনের বেশ কিছু বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলরও আমন্ত্রিত হন। এই অনুষ্ঠানে আমাকে ও আমার স্ত্রীকে নিমন্ত্রণ করা হয়। আমি স্যার হিউ স্প্রিংগারের নিমন্ত্রণ পেয়ে তাঁকে টেলিফোন করে বলি, 'আমি এখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলররূপে মুজিবনগর সরকার কর্তৃক স্বীকৃত হলেও বাস্তবপক্ষে আর কেউ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলররূপে কাজ করছেন কিনা আমি জানি না। এ অবস্থায় আপনি আমাকে ভুল করে নিমন্ত্রণ করছেন কিনা আমি বুঝতে পারছি না।' উত্তরে তিনি হেসে বললেন, 'আমি সব জানি। আমার কাছে আপনিই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর। আমি আর কোন নোটিফিকেশন পাইনি। আমি ইচ্ছে করেই আপনাকে নিমন্ত্রণ করেছি যাতে আপনি অন্যান্য ভাইস চ্যান্সেলরের সঙ্গে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কথা বলার সুযোগ পান।' আমি ও আমার স্ত্রী যথাসময়ে সিনেট হলে উপস্থিত হলে এ্যাসোসিয়েশনের কর্মকর্তাবৃন্দ আমার কোটে যে ব্যাজ লাগিয়ে দেন তাতে আমার নামের পরে 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর' লেখা ছিল। এটা এক দিক দিয়ে মুজিবনগর সরকারকে কমনওয়েলথ ইউনিভার্সিটি কর্তৃক স্বীকৃতি দেওয়ার মতো। স্যার হিউ স্প্রিংগার আমাদের সহাস্যে অভ্যর্থনা জানিয়ে অন্যান্য অতিথির সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন। ঢাকার কথা তোলার জন্য আমাকে সুযোগ খুঁজতে হয়নি। তাঁরাই আমার পরিচয় পেয়ে গভীর মমত্ববোধের সঙ্গে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অবস্থা জানতে চান। এভাবে আমি তাদের কাছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মর্মান্তিক কাহিনী তুলে ধরার সুযোগ পাই।

এই দুঃখে ভরা দিনগুলোতে ব্যক্তিগতভাবে অনেক মমতাপূর্ণ ব্যবহার পেয়েছি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণী বিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক এন, আলম খন্দকার ভেনিজুয়েলার একটি সমুদ্র বিজ্ঞান সংক্রান্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ডেপুটেশনে ছিলেন। জুন মাসের মাঝামাঝি তিনি চিঠি লিখে জানতে চান, আমার ব্যক্তিগত খরচের জন্য তিনি কিছু অর্থ প্রেরণ করতে পারেন কিনা। আমি চৌঠা আগস্ট একটি পত্রে তাঁকে অশেষ ধন্যবাদ জানাই এবং বলি যে, তাঁর এই সহানুভূতিপূর্ণ পত্র আমার হৃদয় স্পর্শ করেছে। সাহায্যের প্রয়োজন যদি কখনো হয় আমি তাঁকে নিশ্চয়ই জানাব। তাঁর সঙ্গে এরপর আমার আর কোন যোগাযোগ হয়নি, হবেও না। দেশ স্বাধীন হবার কিছুদিন পর হঠাৎ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বঙ্গভবনে ফোন করে আমাকে জানানো হয় যে, অধ্যাপক এন, আলম খন্দকার আমাদের সকলের মায়া ত্যাগ করে চলে গেছেন। তাঁর শবদেহ ঢাকায় এসেছে। সেদিন জোহরের নামাজের পরে বিশ্ববিদ্যালয়

মসজিদে জানাজা হবে। জানাজায় যোগদান করে তাঁর বন্ধুত্বের জন্য নীরবে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেছিলাম, প্রার্থনা করেছিলাম তাঁর আত্মার মাগফেরাত।

অধ্যাপক খন্দকারের চিঠির উত্তরে আমি চৌঠা আগস্ট তাঁকে ধন্যবাদ দিয়ে যে চিঠি লিখেছিলাম সেটি বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ-দলিলপত্র, চতুর্থ খন্ড-এর ৯৩ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত হয়েছে।

দুর্ভাগ্যবশতঃ অধ্যাপক খন্দকারের চিঠিটি মুদ্রিত হয়নি। বোধকরি সম্পাদকমন্ডলী সে চিঠিটি পাননি। সেই চিঠিটি মুদ্রিত হলে প্রকাশ পেত, সুদূর ভেনিজুয়েলায় বসেও একজন শিক্ষক স্বাধীনতা আন্দোলনের পক্ষে কিছু করার জন্য কতটা আগ্রহান্বিত হয়েছিলেন।

জুলাই মাসে মুজিবনগর সরকারের প্রধান সেনাপতি জেনারেল ওসমানী খবর পাঠান, আমি যেন পাকিস্তান বিমান বাহিনীর বাঙালী গ্রুপ ক্যাপ্টেন তাওয়াবকে জানাই যে, তাঁর পক্ষে পাকিস্তানে ফিরে যাওয়া নিরাপদ নয়। এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতার জন্য যে লড়াই চলছে সেখানে তাঁর প্রয়োজন রয়েছে। তদনুসারে আমি গ্রুপ ক্যাপ্টেন তাওয়াবকে যে চিঠি লিখি তা পূর্বে উল্লেখিত গ্রন্থের ৯০ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত হয়েছে। সেই চিঠি পেয়ে তিনি পশ্চিম জার্মানী থেকে লন্ডনে এলে আমি তাঁকে মুজিবনগরে যেতে অনুরোধ করি। তিনি যেতে সম্মত হলে তাঁর যাতায়াতের ব্যবস্থা বাংলাদেশ দূতাবাস থেকে করা হয়। তিনি মুজিবনগরে গিয়ে প্রধান সেনাপতি ওসমানীর সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করে সেখান থেকেই পশ্চিম জার্মানীতে ফেরত চলে যান বলে আলোচনার বিষয়বস্তু জানতে পারিনি।

আমাদের আন্দোলন কিছুটা এগিয়ে চলার পর বোধকরি জুলাই মাসে, আমি আমার গোরিং স্ট্রিটের অফিসে বসে কাজ করছিলাম। এমন সময় এক ভদ্রলোক এসে আমাকে একটি চিঠি দিলেন। চিঠিটি খুলে দেখি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূ-তত্ব বিভাগীয় প্রধান অধ্যাপক আব্দুল লতিফের লেখা। তিনি আমাদের সংগ্রামের সঙ্গে একাত্মতা জানিয়েছেন এবং বিদেশে অবস্থানরত তাঁর কিছু আপনজনকে আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন ও আন্দোলনের সমর্থনে এগিয়ে আসতে খবর পাঠিয়েছেন। তাছাড়া অধ্যাপক লতিফ আরো লিখেছেন যে, আমি অর্থের প্রয়োজনবোধে তাঁকে খবর দিলে তিনি পাঁচ হাজার টাকার সমপরিমাণ পাউন্ড পাঠিয়ে দিতে প্রস্তুত। যে ভদ্রলোক চিঠি নিয়ে এসেছেন, তিনি বললেন যে, তাঁকে মৌখিকভাবে উত্তর দিলেই হবে। আমি উত্তরে অধ্যাপক লতিফকে জানালাম যে, তাঁর চিঠি পেয়ে আমি অভিভূত। আমি তাঁকে অশেষ ধন্যবাদ জানাই। তবে টাকা পাঠাবার প্রয়োজন নেই। তাঁর এই মমত্ববোধ আমাদের সংগ্রামের প্রতি তাঁর একনিষ্ঠ সমর্থনেরই পরিচায়ক একথা কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ থাকবে।

পত্রবাহক ভদ্রলোককে সাবধান করে দিলাম যে, এসব খবর ঢাকায় পাঠাতে যেন খুবই সতর্কতা অবলম্বন করা হয়।

দেশ স্বাধীন হবার পর অধ্যাপক আব্দুল লতিফের কাছ থেকে শুনতে পেলাম যে, ভদ্রলোক তাঁকে ডাকে চিঠি লিখে আমার বার্তাটি পাঠিয়ে ছিলেন। এই বিশেষ চিঠিটি ভাগ্যক্রমে পাকিস্তানীরা খোলেনি, খুললে যে কি হতো সেটা সহজেই বোঝা যায়। শুধু তাই নয়, আমি

পরে শুনেছি যে, আব্দুল লতিফ তাঁর ল্যাবরেটরী তাঁর কয়েকজন মুক্তিযোদ্ধা ছাত্রকে ব্যবহার করতে দিয়েছিলেন। মুক্তিযোদ্ধারা সেখানে বসে বিস্ফোরক দ্রব্য প্রস্তুত করেছে। দেশের ভেতরে বসে প্রাণের ওপরে সম্পূর্ণ ঝুঁকি নিয়ে আব্দুল লতিফের এই দেশসেবা আমাদের জন্য অবিস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

আমাদের গোরিং স্ট্রিটের অফিসে কাজ শুরু হবার পর থেকে আমরা বিভিন্ন দূতাবাসের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করেছি। এই সাড়ে পাঁচ মাস এক্ষেত্রে আমাদের কাজের কিছুটা আভাস দিচ্ছি।

পঁচিশে মার্চের হত্যাযজ্ঞের খবর বৃটেনে পৌঁছার পর প্রবাসী বাঙালীগণ যদিও ত্বরিত বেগে নানাভাবে প্রতিবাদ করেছেন তথাপি একথা বলতেই হবে যে, তাঁরা স্বভাবতঃ অনিশ্চয়তা এবং হতাশার মধ্যে ছিলেন। ঠিক সে সময় সোভিয়েত ইউনিয়নের মতো একটি বৃহৎশক্তি নীরব থাকেনি, এটা শুধু আমাদের জন্যই আশার কথা নয়, সকল দেশের নিপীড়িত মানুষের জন্যই আশার বাণী বহন করেছিল।

তেসরা এপ্রিল সোভিয়েত প্রেসিডেন্ট নিকোলাই পদগর্নি ইয়াহিয়া খানকে নিপীড়ন বন্ধ করার জন্য উদাত্ত আহ্বান জানান। তিনি এক বাণীতে বলেন যে, শেখ মুজিবুর রহমান এবং অন্য রাজনৈতিক নেতাদের গ্রেফতার তাঁর মনে গভীর শঙ্কার সৃষ্টি করেছে। তিনি শেখ মুজিবের সত্তরের সাধারণ নির্বাচনে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতার কথা উল্লেখ করে বলেন যে, এ ধরনের গ্রেফতার এবং নিপীড়নের দ্বারা শুধুমাত্র সমস্যারই সৃষ্টি হয়। তিনি কিছুটা কঠোরভাবেই হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করেন যে, এর দ্বারা দক্ষিণ এশিয়ার শান্তি ও স্থিতিশীলতা বিঘ্নিত হতে পারে। তিনি অবিলম্বে রক্তপাত ও নিপীড়ন বন্ধ করার আহ্বান জানান।

এছাড়াও শেখ মুজিবের গ্রেফতারের খবর পাকিস্তানী কর্তৃপক্ষ প্রচারের পরপরই পদগর্নি বঙ্গবন্ধুর জীবনের নিরাপত্তা বিধানের দাবী জানান। এই খবরটি চৌঠা এপ্রিল রোববারের কাগজগুলোতে প্রকাশিত হয়।

তখন পর্যন্ত বাঙালীদের সর্বজনস্বীকৃত কোন কেন্দ্রীয় কমিটি গঠিত না হওয়ায় আমি ব্যক্তিগতভাবে কাজ করে যাচ্ছিলাম, একথা পূর্বেই উল্লেখ করেছি। আমি অনুভব করলাম যে, বাঙালীদের পক্ষ থেকে সোভিয়েত দূতাবাসে গিয়ে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন প্রয়োজন। এই খবর প্রকাশিত হওয়ার দু'এক দিনের মধ্যেই আমি এনামুল হকসহ লন্ডনস্থ সোভিয়েত দূতাবাসে গেলাম এবং সেখানে একজন উর্ধ্বতন কূটনীতিবিদের সঙ্গে দেখা করে আমাদের কৃতজ্ঞতা জানালাম।

স্টিয়ারিং কমিটি গঠিত হবার পর আমি লিখিত পত্রে বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রদূতকে বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে সমর্থন কামনা করে পত্র পাঠাই এবং আমাদের প্রচার পুস্তিকাগুলো তাদের কাছে প্রেরণ করি। তাছাড়া বেশ কিছু রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে দেখাও করি। এককথায় বলতে গেলে, কমনওয়েলথ দেশসমূহের অধিকাংশ রাষ্ট্রদূতের সঙ্গেই সাক্ষাৎ হয়। পূর্ব ইউরোপের অধিকাংশ রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে আমি সাক্ষাৎ করেছিলাম।

সাইপ্রাসের রাষ্ট্রদূত কোস্টাস এসিওটিস আমাদের সংগ্রামকে সকল মানুষের মুক্তিসংগ্রাম

রূপে গ্রহণ করেন এবং তাঁর নিকট থেকে অভাবিত সৌহার্দ্য লাভ করি। তিনি আমাকে বলেন যে, কোন প্রয়োজনে তাঁকে অনুরোধ করতে আমি যেন দ্বিধা না করি। তাছাড়া তিনি আমাকে দূতাবাসের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে বাংলাদেশের প্রতিনিধি হিসাবে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন এবং আমাদের আমন্ত্রণেও বিনাদ্বিধায় এসেছেন। রাষ্ট্রদূত এসিওটিসের সহৃদয়তার কথা চিরদিন কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করতে হবে।

আয়ারল্যান্ড এবং যুগোশ্লাভিয়ার রাষ্ট্রদূতও আমাদের সংগ্রামের যৌক্তিকতা নিবিড়ভাবে উপলব্ধি করেন। তারা দু'জনেই নিজ নিজ দেশে আমার সফরের ব্যবস্থা করেন। আয়ারল্যান্ডের রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে সাক্ষাতের সময় সুলতান শরীফ ও তাঁর স্ত্রী উপস্থিত ছিলেন। মিসেস সুলতান শরীফ একজন আইরিশ মহিলা যদিও বিয়ের পর থেকে বাঙালী, তিনিও আমাদের আন্দোলনে সর্বাত্মকভাবে সাহায্য করেছেন। কিন্তু আমাকে নিউইয়র্কে যেতে হলো বলে যুগোশ্লাভিয়া এবং আয়ারল্যান্ডের সফর স্থগিত রাখতে হয়েছিল। ঠিক হয়েছিল, জাতিসংঘের অধিবেশন শেষে এই দুই দেশে যাব।

ভারত সম্পর্কে পাকিস্তানের মিথ্যা প্রচারণার ফলে আমি ভারতীয় দূতাবাস সম্পর্কে যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করেছি। বিনা প্রয়োজনে আমি তাঁদের সঙ্গে যোগাযোগ করিনি। তবুও ভারতীয় রাষ্ট্রদূত আপাপন্থ-এর সঙ্গে বারকয়েক দেখা হয়েছে। জয়প্রকাশ নারায়ণ আপাপন্থের আতিথ্য গ্রহণ করেছিলেন। সে সময় আপাপন্থের সঙ্গে আমার দেখা হয়। অনুরূপভাবে দেখা হয়েছিল ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী শরণ সিং লন্ডনে আসার পর। সে সময় প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আমাকে শরণ সিংয়ের সঙ্গে দেখা করার জন্য খবর পাঠান। তাঁর সঙ্গে দেখা করার সময় আপাপন্থ উপস্থিত ছিলেন। শরণ সিংয়ের সঙ্গে দেখা হলে তিনি আমাকে বলেন, আমি যেসব দেশে সফরে যাই যদি কোনরূপ বিপদের সম্মুখীন হই বন্ধুরাষ্ট্র ভারতীয় দূতাবাসের সঙ্গে যোগাযোগ করতে যেন দ্বিধাবোধ না করি। ভারতীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রীর বন্ধুত্বপূর্ণ এবং সুরুচিসম্পন্ন ব্যবহার আমার খুবই ভাল লেগেছিল। আমি তাঁকে বলি যে, অস্ত্র প্রেরণের ব্যাপারে প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন ভারত সরকারের অনুমতি চেয়েছেন অথচ সে অনুমতি না পাওয়ায় অস্ত্র প্রেরণ সম্ভব হচ্ছে না বলে প্রবাসী বাঙালীদের মধ্যে হতাশার সৃষ্টি হয়েছে। পররাষ্ট্রমন্ত্রী উত্তরে বলেন যে এখান থেকে অস্ত্র না পাঠালেও মুক্তিযোদ্ধারা প্রয়োজনীয় অস্ত্র পাচ্ছেন। তবে লন্ডন থেকে অস্ত্র পাঠানোর অনুমতি দিলে কতগুলো নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হয়। সে জন্য বিলম্ব হচ্ছে।

রাষ্ট্রদূত আপাপন্থের অন্তরের গভীরতা ও আদর্শভিত্তিক চিন্তাধারাতে তাঁকে একজন দার্শনিক বলেই মনে হয়েছে।

ভারতীয় দূতাবাসের একজন তরুণ বাঙালী কূটনীতিবিদের সঙ্গে শেখ আবদুল মান্নান এবং আজিজুল হক ভূঁইয়ার কয়েকবার দেখা হয়। তাঁরা দু'জনেই তাঁর বাঙালীসুলভ হৃদ্যতার কথা আমার কাছে বলেছেন। কূটনীতিকের নাম শশাঙ্ক শেখর ব্যানার্জী। মুজিবনগর সরকারের কোন কোন সময় জরুরী খবর ভারতীয় দূতাবাসের মারফত এলে ব্যানার্জী সেগুলো শেখ মান্নান বা আজিজুল হক ভূঁইয়াকে পৌঁছে দিতেন। তাঁর সৌজন্যের প্রশংসা আমি এঁদের

দু'জনের কাছেই শুনেছি। ব্যানার্জী আমাদের জনসভাগুলোতেও যোগ দিতেন এবং সভার শেষে কোন কোন সময় আমার সঙ্গেও দেখা করেছেন। এভাবেই আমার তাঁর সঙ্গে পরিচয় হয়।

ষাট

সেপ্টেম্বর মাসের মাঝামাঝি বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম একটি পরিপূর্ণ রূপ নিয়ে ফেলে। তখন সর্বত্রই দেখা গেল অভূতপূর্ব উৎসাহ ও উদ্দীপনা। পঁচিশে মার্চে পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীর নিষ্ঠুরতম হত্যা ও নানাবিধ নির্মমতা বাঙালী জাতিকে স্তব্ধ তো করতে পারেনি, এক অভাবিত প্রাণশক্তিতে বলীয়ান হয়ে বাঙালী আজ শত্রুর মুখোমুখি দাঁড়িয়েছে। সবদিক থেকেই সুসংহত হবার খবর আসছিল আমাদের কাছে। রণক্ষেত্র থেকে আসছিল বীরত্বের অসংখ্য উদ্দীপনাময় ঘটনার বিবরণী, আর বেসামরিক ক্ষেত্রেও সুনিয়ন্ত্রিত সুশৃঙ্খল এবং ঐক্যবদ্ধ কর্মপ্রবাহের কথা। বৃটেনে শতাধিক আঞ্চলিক সমিতি নিজ নিজ এলাকায় প্রতিনিয়ত আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছিল। কেন্দ্রীয় কমিটি কর্তৃক আয়োজিত শোভাযাত্রা, সম্মেলন বা জনসভা ছাড়াও আঞ্চলিক সমিতিগুলো স্থানীয় সভা আয়োজন করছিল। ঠিক তেমন মুজিবনগরের কেন্দ্রীয় সচিবালয়েও যুদ্ধকালীন কর্মতৎপরতা দক্ষতা ও নিষ্ঠার সঙ্গে পরিচালিত হচ্ছিল। বৃটেনসহ অনেক বাঙালী কেন্দ্রীয় সচিবালয়ে চিঠি পাঠিয়েছেন এবং অনেকেই আমাকে তাঁদের প্রাপ্ত উত্তরও দেখিয়েছেন। তাতে আমি দেখেছি, যথাযথভাবে উত্তর দেয়া হয়েছে এবং মুক্তিযুদ্ধের সহকর্মীস্বরূপ মনোভাব নিয়ে উত্তরগুলো প্রেরিত হয়েছে। এসব চিঠিতে দেখতে পেয়েছি বাঙালীর অন্তর্নিহিত শক্তি এবং আন্তরিক ইচ্ছার প্রতিফলন। বাঙালী নিজের দেশকে মুক্ত করার জন্য আজ দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। বিদেশী সংবাদপত্রগুলো আমাদের ন্যায়যুদ্ধকে সহানুভূতির সঙ্গে দেখছে ও উৎসাহিত করছে। তাছাড়া বৃটেন এবং অন্যান্য দেশে সামান্য কয়েকজন বাঙালী মিলেও সাপ্তাহিক পত্রিকা বা প্রচার পুস্তিকা প্রকাশ করেছেন।

স্টিয়ারিং কমিটির সাপ্তাহিক পত্রিকা বাংলাদেশ টু-ডে, সংবাদ পরিক্রমা, ইত্যাদি ছাড়াও সাপ্তাহিক জনমত-এর বিশিষ্ট অবদান ছিল। শুধু তাই নয়, 'বাংলাদেশ' নামে আরো একটি সাপ্তাহিকী প্রকাশিত হতে থাকে। পত্রিকাটির সংবাদ পরিবেশনা ছিল বস্তুনিষ্ঠ। দলীয় মনোভাবের উর্ধ্বে যে সহজ ও স্বাভাবিক ঔদার্য ও দেশপ্রেম বাঙালীকে করেছে মহিমান্বিত, সেই চিন্তা ও ভাবধারার প্রকাশ দেখতে পেয়েছিলাম সাপ্তাহিক বাংলাদেশ পত্রিকায়। পত্রিকাটি প্রকাশিত হয় এজওয়ার অঞ্চল থেকে বি, করিমের সম্পাদনায়।

রণক্ষেত্রেও আমাদের মুক্তিযোদ্ধাদের নানা রণনৈপুণ্যের কাহিনীর কথা আমরা প্রতিদিন জানতে পারছিলাম। তেমনি প্রতিদিন নানা দেশে বাঙালীগণ যে যেখানে ছিলেন আন্দোলনকে স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে সাফল্যের পথে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছিলেন।

স্কান্ডেনেভিয়ান দেশসমূহ থেকে ফিরে এসে আমি সর্বত্র এরূপ একটি কল্যাণময় এবং উৎসাহোদ্দীপক পরিবেশ দেখতে পেলাম। আবার নতুন করে বৃটেনে জনসংযোগ কর্মসূচী গ্রহণ করার কথা ভাবছিলাম, এমন সময় মুজিব সরকারের কাছ থেকে টেলিগ্রাম এলো যে, জাতিসংঘের আসন্ন সাধারণ অধিবেশনে ষোল সদস্যের একটি প্রতিনিধিদল পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছেন সরকার। এই প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব দেয়ার জন্য সরকার আমাকে দায়িত্ব দিয়েছেন। অবিলম্বে নিউইয়র্কে গিয়ে কাজ শুরু করার জন্য আমাকে টেলিগ্রামে বলা হলো।

স্টিয়ারিং কমিটির সদস্যদের সঙ্গে টেলিগ্রাম পাওয়ার পরই আলাপে বসলাম, যাতে আমার অনুপস্থিতিতেও কোন সমস্যার উদ্ভব না হয় এবং ঐক্য বজায় রেখে আন্দোলনের কাজ এগিয়ে যায়।

কভেনট্রির সম্মেলনে যে দিন স্টিয়ারিং কমিটি গঠিত হয়, তাঁর পাঁচজন সদস্যের সঙ্গেই কমিটি গঠনের কয়েক দিন আগে থেকে শুধু মাত্র পরিচয় হয়েছিল। চব্বিশে এপ্রিলের পর থেকে প্রতিনিয়ত একসঙ্গে কাজ করার ফলে হয়েছে জানাজানি, পরস্পরের প্রতি বিশ্বাস, সহমর্মিতা এবং সহকর্মীসুলভ হৃদ্যতা। ইতিপূর্বে আমার অনুপস্থিতিতে দেখেছি শেখ মান্নানের অধ্যবসায় এবং স্থিতিশীল চিন্তাধারা। তিনি অফিস থেকে মাঝে মাঝেই কয়েক দিন করে ছুটি নিয়ে সারাক্ষণ কাজ করছিলেন।

তিনি যে কোন অবস্থার মোকাবেলা করেছেন আত্মপ্রত্যয়ের সঙ্গে। তাঁর বাড়ীতে ঘরোয়া বৈঠক লেগেই থাকত। তাঁর স্ত্রী সাজেদা মান্নান দু'টি শিশু সন্তানসহ গৃহকর্মের ব্যস্ততার পরেও এসব ঘরোয়া বৈঠকে উপস্থিত কর্মীবৃন্দের যথাযোগ্য আতিথেয়তার ব্যবস্থা করতেন। এজন্য তাঁকে যথেষ্ট পরিশ্রম করতে হয়েছে। খরচ হয়েছে অনেক। আন্দোলনের কাজে অনেক টেলিফোন করতে হয়েছে, কিন্তু আমি বলা সত্বেও টেলিফোনের বিলটা গোরিং স্ট্রিটের অফিস থেকে দিতে দেননি। চাকরি তেমন বড় নয়, অবশ্য মনটা বড়।

আজিজুল হক ভূঁইয়াকেও খুব কর্মচঞ্চল দেখেছি। শেখ মান্নান এবং আজিজুল হক ভূঁইয়াকে বললাম যে, তাঁদের দু'জনকেই সার্বক্ষণিক দায়িত্ব পালন করতে হবে। তাঁরা দু'জনেই সানন্দে ও দৃঢ়তার সঙ্গে বললেন যে, পূর্বের ন্যায় তাঁরা কাজ করে যাবেন। স্টিয়ারিং কমিটির সদস্য কবির চৌধুরী থাকতেন ম্যানচেষ্টারে যোগাযোগ রাখতেন টেলিফোনে প্রতিদিন। ম্যানচেষ্টার ও ল্যাঙ্কাশায়ার অঞ্চলে আন্দোলন জোরদারের প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিলেন তিনি। ম্যানচেষ্টারসহ সেই অঞ্চলে আয়োজিত প্রতিটি সম্মেলনের সঙ্গে তিনি ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিলেন। স্টিয়ারিং কমিটির গুরুত্বপূর্ণ সভাগুলোতে যোগদানের জন্য অবশ্য ম্যানচেষ্টার থেকে প্রায়ই আসতেন। তাঁর আন্তরিকতা আমাকে মুগ্ধ করেছে।

শামসুর রহমানও স্টিয়ারিং কমিটির সদস্যরূপে তাঁর কর্তব্য নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করেছেন এবং বাঙালীদের মধ্যে ঐক্য স্থাপনও অটুট রাখার ব্যাপারে তাঁর অবদান অপরিসীম। তিনি

ছিলেন এমন একজন মানুষ যাঁর ওপর সকল অবস্থাতেই অনায়াসে নির্ভর করা চলত। যে কোন সংগ্রামে এমন মানুষের প্রয়োজন অত্যন্ত বেশী। কবির চৌধুরী ও শামসুর রহমান দু'জনেই ছিলেন নিরহংকারী মানুষ। তাঁদের দু'জনেরই সৌজন্য এবং বন্ধুত্ব আমাকে আনন্দ দান করেছে।

মনোয়ার হোসেনের স্টিয়ারিং কমিটির সদস্যরূপে কাজ না করার সিদ্ধান্তের কথা আমি এর আগে লিখেছি।

একষট্টি

গত সাড়ে পাঁচ মাসের কর্মপ্রবাহের মূল্যায়ন করতে গেলে স্বভাবতঃই মনে পড়বে আমাদের যাত্রাপথের প্রথমাবস্থা। এ সম্পর্কে আমি শুরুতেই কিছুটা বিস্তারিত আকারে বলেছি। সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝিতে আমরা কতদূর এগুতে পেরেছি তা উপলব্ধি করতে হলে আন্দোলনের সূচনাতে ফিরে যেতে হয়। ২৭শে মার্চের লন্ডনস্থ টাইমস পত্রিকায় বাঙালীদের আন্দোলনের বিবরণী দিতে যেয়ে তাঁদের সংহতি সম্বন্ধে বলা হয়েছিল ঃ

> Who will come forward to represent the 1,43,000 Bengalis living in Britain now that East Pakistan has become the sovereign independent people's republic of Bangladesh ? There is no single contender so far and although the vast majourty support Shaikh Mujibur and six points they tend to be devided by local rivalries.

অর্থাৎ বলা হয়েছে যে, শেখ মুজিবকে সমর্থন করলেও তাঁরা স্থানীয় প্রতিদ্বন্দ্বিতা দ্বারা বিভক্ত। ঐ প্রতিবেদনটিতে রাজনৈতিক দলগুলি সম্বন্ধে বলা হয় ঃ

> Hirtherto, the principal political body had been the U.K. Awami Leauge which was formed after Shaikh Mujibur's visit to Britain in autumm of 1969. With local jealousies, this group splintered last year and a rival London Awami League was set up.

লন্ডনের ছাত্র সমিতি অবশ্যি এই দলগুলির সমবায়ে একটি সংগ্রাম পরিষদের মাধ্যমে কার্য পরিচালনার উদ্যোগ নিয়েছিল। কিন্তু তা ফলপ্রসূ হয়নি। ২৬শে মার্চ সন্ধ্যায় লন্ডনে পৌঁছেই আমি এই অবস্থা দেখতে পাই। শুরু হয় ঐক্য প্রচেষ্টা। একেবারে প্রথমদিকেই লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণারত ছাত্র ফজলে রাব্বি মাহমুদ হাসানের আর্লসকোর্টস্থ বাসস্থানে প্রায় সারারাতব্যাপী ঐক্য স্থাপনের উদ্দেশ্যে বৈঠক হয়েছিল। আমি ঐ বৈঠকেও উপস্থিত ছিলাম।

তারপর ক্রমাগত তিন সপ্তাহ আলাপ-আলোচনার পর ২৪শে এপ্রিল কভেনট্রির ঐতিহাসিক সম্মেলনে পাঁচ সদস্য বিশিষ্ট স্টিয়ারিং কমিটি আন্দোলন পরিচালনার জন্য গঠিত হয়। এই কমিটি আমার পরামর্শ অনুসারে কাজ চালাবে এই সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। এই কয়েক মাসে এই স্টিয়ারিং কমিটি সমগ্র আন্দোলনের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব দিয়ে এসেছে। স্টিয়ারিং কমিটির সমগ্র আন্দোলনের পরিকল্পনা আঞ্চলিক সমিতিগুলির সঙ্গে পরামর্শ করে প্রণয়ন করেছে এবং তাঁদের সহযোগিতায় বাস্তবায়িত করেছে। তাই ২৭শে মার্চের টাইমসে উল্লেখিত রাজনৈতিক দলগুলির বিভক্তির সম্পূর্ণ অবসান ঘটেছে সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি। বাঙালীদের জন্য এই সাফল্য নিশ্চয়ই পরম গৌরবের। শুধু তাই নয়, অন্যান্য দেশ থেকেও বাঙালীগণ স্টিয়ারিং কমিটির সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করে কর্মপদ্ধতি গ্রহণ করেছেন। স্টিয়ারিং কমিটি এখন একটি স্থিতিশীল নেতৃত্ব স্থাপন করতে পেরেছে, এটাই সবচেয়ে আনন্দের কথা। স্থানীয় সমিতিগুলি নিজ নিজ অঞ্চলে আন্দোলন চালাচ্ছেন। কেন্দ্রীয় কর্মসূচী গৃহীত হয় স্টিয়ারিং কমিটির দ্বারা। একটি আন্দোলনের সাফল্যের জন্য এর চেয়ে বড় কাম্য আর কিছু হতে পারে না। এমনকি এই ধারা বহন করে আওয়ামী লীগেরও বিভেদের অবসান ঘটেছে একথা পূর্বেই উল্লেখ করেছি।

মুজিবনগর থেকে ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম স্বয়ং খুবই আনন্দ প্রকাশ করে ১৬ই আগস্ট আমাকে পত্র দেন। তাঁর হৃদ্যতাপূর্ণ সেই চিঠিতে তাঁর মনের ঔদার্য দেখতে পাই। আমার ক্ষুদ্র প্রচেষ্টার সাফল্যের কথা তিনি ঔদার্যের সঙ্গে উল্লেখ করেছেন দেখে অভিভূত বোধ করেছি। কোন সাফল্যই একজনের চেষ্টায় হয় না। আমি পত্রটিকে এইভাবে গ্রহণ করেছি যে, সরকার প্রধানের সন্তুষ্টি, প্রবাসী বাঙালীদের সংগ্রাম আগস্ট মাসেই যে একটি শক্তিশালী, সুশৃঙ্খল সুসংহত ও সুনিয়ন্ত্রিত আন্দোলনে পরিণত হয়েছিল তারই স্বীকৃতি।

মাত্র তিন সপ্তাহ আগে বাংলাদেশ দূতাবাস স্থাপিত হলেও সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝিই দেখতে পেলাম যে, দূতাবাসের কাজ সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হচ্ছে। মহিউদ্দিন আহমদ ও লুৎফুল মতিন অফিসটিকে সুশৃঙ্খলভাবে গুছিয়ে তোলেন। তাঁদের সাহায্য করেন মহিউদ্দিন আহমদ চৌধুরী, আবদুল রউফ, নূরুল হুদা, ফজলুল হক চৌধুরী, আবদুস সালাম এবং দূতাবাসের অন্যান্য সদস্য।

এই সময়ে দূতাবাসে এবং গোরিং স্ট্রিটের অফিসে বিশ্বের নানা স্থান থেকে অসংখ্য চিঠিপত্র আসতে থাকে। তাছাড়াও অনেকেই এ দু'টি অফিসেই আন্দোলন সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে আসতেন। আমাদের আদর্শ ও লক্ষ্যের যৌক্তিকতার ফলেই এই স্থিতিশীলতা অর্জন সম্ভব হয়েছিল। দূতাবাস সম্পর্কে আরো একটি বিষয়ের উল্লেখ করতে চাই। বিষয়টি আজকের দিনে নগণ্য মনে হলেও সেদিন আমাদের জন্য খুবই উৎসাহোদ্দীপক ছিল। দূতাবাস স্থাপন হওয়ার অব্যবহিত পরে স্টোনহাউস টেলিকমিউনিকেশনসের ম্যানেজিং ডিরেক্টর ফেননিসিকে চিঠি লেখেন যাতে বাংলাদেশ দূতাবাসের নামে তিনটি টেলিফোন দেয়া হয়। ম্যানেজিং ডিরেক্টর স্টোনহাউসকে চিঠি লিখে জানান যে, পনরই সেপ্টেম্বর থেকে আমার দরখাস্ত অনুযায়ী বাংলাদেশ দূতাবাসের নামে ২৪ নম্বর পেমব্রিজ গার্ডেনসে টেলিফোন

স্থাপিত হবে। শুধু তাই নয়, "বাংলাদেশ-লন্ডন" এই নামে টেলিফোন পাঠালে দূতাবাসে টেলিগ্রাম ডেলিভারি দেয়া হবে। অর্থাৎ বৃটিশ সরকারের পোষ্ট অফিস এবং টেলিফোন বিভাগ বাংলাদেশের নামে টেলিফোন দিতে আপত্তি করল না এবং টেলিগ্রামের জন্যও একইভাবে রেজেস্ট্রী লাভ করা গেল। স্টোনহাউস এক সময়ে এই বিভাগের মন্ত্রী ছিলেন বলেই তাঁর অনুরোধে এত সহজে এটি সম্ভব হয়েছিল।

অনুরূপ আরেকটি ঘটনার কথা উল্লেখ করছি। লন্ডনে রয়াল ওভারসীজ লীগ নামে একটি প্রতিষ্ঠান আছে। বিদেশী সম্মানিত ব্যক্তিদের সঙ্গে দেখা সাক্ষাতে ও আপ্যায়নের জন্য খুবই ভাল ব্যবস্থা। শুধুমাত্র কমনওয়েলথের নাগরিক এর সদস্য হতে পারেন। আমি এর সেক্রেটারী জেনারেলের সঙ্গে দেখা করি এবং বলি যে, দেশের নাম আমি বাংলাদেশ লিখব। তাতে তিনি রাজী হন। ইংল্যান্ডের রাণী এর পৃষ্ঠপোষক এবং সে সময় এর সভাপতি ছিলেন লর্ড মাউন্টব্যাটেন। আমি বাংলাদেশের নাগরিক হিসাবেই এর সদস্য হই এবং বিভিন্ন অনুষ্ঠানে যোগ দিলে যে ব্যাজ পরতে হয় তাতে আমার নামের পরে বাংলাদেশ লেখা হতো।

আমি ১৬ই সেপ্টেম্বর রাতে ডেনমার্ক থেকে লন্ডনে ফিরে এসে পুনরায় যথারীতি লন্ডনের কাজ শুরু করি। সকালে উঠেই গোরিং স্ট্রিটের অফিসে গেলাম। তাঁরা আমাকে আমার অনুপস্থিতকালের সকল বিষয় সম্পর্কে অবহিত করলেন এবং সাংগঠনিক সকল বিষয়ে পর্যালোচনা করা হলো। শেখ মান্নান আমাকে আরো জানান যে, ১০ই সেপ্টেম্বর স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের অফিসার পিটার ল্যাংলি পুনরায় গোরিং স্ট্রিটের অফিসে এসে তাঁদের সঙ্গে নিরাপত্তা সম্পর্কে আলোচনা করেন। তিনি অফিসের সামনের রাস্তায় পুলিশের ঘন ঘন টহলের ব্যবস্থা করেছেন। কেননা, ইতিমধ্যেই অফিসের নীচের তলার প্রবেশ দ্বারে একটি বোমা বিস্ফোরণ ঘটেছিল। তাতে দরজা ইত্যাদির ক্ষতি হলেও বিস্ফোরণটি গভীর রাতে হওয়ায় কোন মানুষ আহত হয়নি। সকলেরই ধারণা এ কাজ পাকিস্তানীদের দ্বারাই ঘটেছে।

আমার লন্ডনে ফিরে আসার সংবাদে বৃটেনের নানাস্থলে অবস্থিত আমাদের সমিতিগুলির প্রতিনিধিবৃন্দ প্রত্যহ নানা বিষয়ে আলোচনার জন্য লন্ডনে আসতে থাকেন। তা নিয়ে আমাকে দুপুর রাত পর্যন্ত ব্যস্ত থাকতে হয়। আমি দিনে একবার করে পেনব্রিজ গার্ডেন্সে বাংলাদেশ দূতাবাসেও যেতাম। সেখানে বিভিন্ন দেশের দূতাবাসগুলির সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করার ব্যাপারে বিভিন্ন কর্মসূচী গ্রহণ করা এবং পত্রাদির উত্তর দিতে হয়। এইভাবে দিন চারেক অতিবাহিত হবার পর ২১শে সেপ্টেম্বর মুজিবনগর সরকার থেকে আমাকে টেলিগ্রামে অবিলম্বে নিউইয়র্ক যেয়ে ষোল সদস্য বিশিষ্ট প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব দিতে বলা হয়।

সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি জাতিসংঘের সাধারণ অধিবেশন শুরু হয়। বাংলাদেশকে স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্ররূপে ঘোষণা করলেও তখন পর্যন্ত জাতিসংঘ বা কোন দেশের স্বীকৃতি লাভ করেনি। এ অবস্থায় জাতিসংঘের সদস্যপদ লাভ না করায় সাধারণ পরিষদে এই প্রতিনিধিদলের সরকারীভাবে যোগদানের কোন সম্ভাবনা ছিল না। তথাপি ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম এবং প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ মন্ত্রীসভার অনুমোদনক্রমে এই প্রতিনিধিদল গঠন ও প্রেরণ করেন। তাঁদের এই সিদ্ধান্ত রাজনৈতিক দূরদৃষ্টিরই পরিচয় দেয়।

তাঁরা ঠিক করেন যে, এই প্রতিনিধিদল নিউইয়র্কে গিয়ে বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধিদলের নিকট বাংলাদেশের নিপীড়িত মানুষের বাণী পৌঁছে দেবে।

টেলিগ্রাম পাওয়ার পর গোরিং স্ট্রিটের অফিস ও পেনব্রিজ গার্ডেন্সের দূতাবাসে আমার অনুপস্থিতিতে কার্য পরিচালনার প্রয়োজনীয় সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করে ২৩শে সেপ্টেম্বর নিউইয়র্ক অভিমুখে যাত্রা করি।

এক অল্প সময়ের নোটিশে যাত্রার জন্য প্রস্তুত হতে হল বলে দু'তিনদিন প্রায় সারাক্ষণই কাজ করতে হয়েছিল। প্লেনে ওঠার পরে শারীরিক তো বটেই, মানসিক বিশ্রামের সময় পাওয়া গেলো বেশ অনেক দিন পরে। বিমানের আসনে চুপ করে বসে ভাবতে লাগলাম দেশের কথা, দেশের মানুষের কথা। চোখের সামনে ভেসে উঠল সাড়ে সাত কোটি মানুষের একটি দেশ থর থর করে কাঁপছে। এক মুহূর্তের নিশ্চয়তা নেই, স্থিরতা নেই। যে কোন সময়ে পাক হানাদার বাহিনীর নির্মম গুলীতে যে কোন লোককে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়তে হতে পারে। এসব কথা চিন্তা করলে স্বভাবতঃই শিউরে ওঠতে হয়। মনের কোণে একের পর এক কত কথা যে সেদিন ভিড় করেছিল তার ইয়ত্তা নেই। পাক বাহিনী আমার গ্রামের বাড়ী পূড়িয়ে দিয়ে আমার ম্যানেজারকে হত্যা করার পর গ্রামের স্কুলের একজন কিশোর ছাত্র আব্বাস আলী ও তার সহপাঠি কয়েক দিনের পথ হেঁটে সীমান্ত অতিক্রম করে একটি ভারতীয় ডাকঘরে চিঠিটি পোষ্ট করে আমাকে সকল খবর দিয়েছিল। পাক হানাদার বাহিনী বাড়ী ত্যাগ করার সঙ্গে সঙ্গে যে সহস্রাধিক মানুষ পুকুরে লাফিয়ে পড়ে পানি তুলে বাড়ীটাকে রক্ষা করার চেষ্টা করেছিল সেই গ্রামবাসীদের মাঝে ফিরে যাব সে কথা মনে করে কেমন একটা বিষণ্ণতা অনুভব করলাম। ভাবলাম কবে তাঁদের সঙ্গে দেখা হবে, কবে আমার অভিভূত অন্তরের কৃতজ্ঞতা জানাব। তাঁরা কে কোথায় কেমন আছেন জানিনা, আমিও যেমন তাঁদের কথা ভাবছি তাঁরাও হয়তো বা আমার কথা মনে করছেন। যদি বেঁচে না থাকি আমার এই অন্তরের অনুভূতি কি তাঁদের হৃদয়ে পৌঁছবে না ?

দেশ যে স্বাধীন হবে সে বিষয়ে আমার মনে কোন সন্দেহ নেই। সন্দেহ থাকতে পারে না। সন্দেহ যদি হয় জীবনে যা কিছু সত্য বলে জেনেছি সব মিথ্যা হয়ে যাবে। তাতো হতে পারে না। সেই যে শৈশব থেকে যৌবন পর্যন্ত শুনে এসেছি অহংকারের পতন হবে, অন্যায়ের অবসান হবে, অত্যাচারীর শাস্তি হবে, এসব তো কখনো মিথ্যে হতে পারে না। স্বীকৃত পরীক্ষিত সত্য যদি মিথ্যে হয়ে যায় তাহলে পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাবে। তাই নিপীড়িত নির্যাতিত বাঙালীকে স্বাধীন হতেই হবে। সত্যের জয় অবধারিত। কি পরম নির্ভরতার সঙ্গেই না রবীন্দ্রনাথ বলেছেন ঃ

"অপরাজিত মানুষ নিজের জয়যাত্রার অভিযানে সকল বাধা অতিক্রম করে অগ্রসর হবে তার মহৎ মর্যাদা ফিরে পাবার পথে।" তিনি আমাদের বার বার মনে করিয়ে দিয়েছেন, হতাশা যেন কোন দুর্বল মুহূর্তেও সত্যের চরম বিজয় সম্পর্কে দ্বিধা না আনে। উদাত্ত কণ্ঠে তিনি বলেছেন, "মনুষ্যত্বের অন্তহীন প্রতিকারহীন পরাভবকে চরম বলে বিশ্বাস করাকে আমি অপরাধ মনে করি।" ন্যায়যুদ্ধে মানুষের বিজয় নিশ্চিত এ কথা তিনি জানতেন বলেই পরম

বিশ্বাসে বলতে পেরেছেন, "প্রবল প্রতাপশালীরও ক্ষমতা, মদমত্ততা, আত্মম্ভরিতা যে নিরাপদ নয় তারই প্রমাণ হবার দিন আজ সমমুখে উপস্থিত হয়েছে।" বিমানের জানালা দিয়ে উদার উন্মুক্ত নীলাকাশের দিকে তাকিয়ে যেন শুনতে পেলাম ঃ

সুরলোকে বেজে ওঠে শঙ্খ
নরলোকে বাজে জয় ডঙ্ক,
এল মহাজন্মের লগ্ন।
আজি অমারাত্রির দুর্গ তোরণ যত
ধূলি তলে হয়ে গেল ভগ্ন।

নিশ্চিত জয়ের পথে আহবান এসেছে ঃ

উদয় শিখরে জাগে মাভৈঃ
মাভৈঃ রব
নব জীবনের আশ্বাসে।
জয় জয় জয়রে নব-অভ্যুদয়
মন্দ্রি উঠিল মহাকাশে।

অনেকদিন পরে নিজেকে এমন একলা পেয়েছি। বিমানের অপরিচিত যাত্রীদের থেকে আমি বিচ্ছিন্ন, নিজের চিন্তার সাগরে নিমগ্ন। মনে হল আজ আমি দেশহীন, গৃহহীন, ঠিকানাহীন মানুষ। পরিচিত আবেষ্টনী থেকে ছিন্ন হয়ে, কক্ষচ্যুত হয়ে যেন আলাদা জগতে বিচরণ করছি। এখানে কত অচেনা, কত অজানা মানুষের মধ্যে দেখলাম আমার দেশের নিপীড়িত মানুষের জন্য কি সীমাহীন প্রেম-প্রীতি, স্নেহ-মায়া-মমতা। তাঁরা যেন ভালবাসা দিয়ে হিংসার অবসান করতে চান। দেশের দিকে তাকিয়ে দেখলাম নিদারুণ, নিষ্ঠুর, নির্মম হত্যাযজ্ঞ। আর বৃহত্তর মানব-গোষ্ঠীর মধ্যে দেখতে পেলাম অভাবিত, আশাতীত হৃদয়বেদনা, সহমর্মিতা। জানি না সুবেহ সাদেকের পুণ্যপ্রভাত দেখতে পাব বলেই কালরাত্রির মধ্য দিয়ে আসতে হচ্ছে কিনা। নিদারুণ সংঘাতের মধ্য দিয়ে দেখতে পেলাম বৃহৎ মানব গোষ্ঠীর শাশ্বত ঐক্যবন্ধন।

আমার মন বলে চলেছে ঃ

কত অজানারে জানাইলে তুমি,
কত ঘরে দিলে ঠাঁই,
দূরকে করিলে নিকট, বন্ধু,
পরকে করিলে ভাই।

হঠাৎ মনে পড়ে গেল কিছু দিন আগের একটি ঘটনা। ফেব্রুয়ারী মাসে জেনেভা শহরে মানবাধিকার কমিশনের অধিবেশন চলছে। ইরানের শাহের ভগ্নী প্রিন্সেস আশরাফ কমিশনের

সদস্য। তিনি আমাদের কয়েকজন সদস্যকে একদিন মধ্যাহ্নভোজে আমন্ত্রণ জানালেন। লেকের ওপরে শৈলশিখরে ছোট্ট একটি সুইস রেস্তোঁরা। সকলেই বেশ নিরুদ্বিগ্ন ও প্রফুল্লচিত্ত। আমার পাশে বসেছিলেন কমিশনের ভারতীয় সদস্য মিসেস দামোদারা মেনন। তিনি তখন ভারতীয় পার্লামেন্টের বিশিষ্ট সদস্য। টেবিলের ওপরে আমার ডান হাতটি পড়েছিল আলতোভাবে। এক সময় দেখলাম এই বিদুষী মহিলা আমার হাতের তালুর দিকে তাকিয়ে আছেন। আমি লক্ষ্য করতেই বললেন, আপনার হাতটা কি একটু দেখতে পারি? বললাম, 'নিশ্চয়ই।' তিনি আমার হাতটিকে মিনিট খানেক দেখলেন। একটু চিন্তিতভাবে বললেন, 'আপনার জীবনে আমূল পরিবর্তন আসছে।' জিগ্যেস করলাম, 'কি রকম ?' তিনি বললেন, 'আপনার হাতের রেখা বলে, খুব শিগগির আপনার জীবনে এমন একটি পরিবর্তন আসছে, যার সঙ্গে অতীতের কোন সমবন্ধ নেই।' আমি চিন্তিত হয়ে বললাম, এ কি আমার জন্য ভাল হবে ? উত্তরে মিসেস মেনন আবার একটু দেখে বল্লেন, 'তা তো বলতে পারছিনে, কিন্তু পরিবর্তনটা আপনার ইচ্ছাতেই আসবে It will be your own Seekin।' এ কথাটা শুনে আমি কিছুটা আশ্বস্ত হয়েছিলাম, কেননা পরিবর্তনটা যদি আমার সিদ্ধান্তেই হয় তবে চিন্তার বোধ করি কারণ নেই।

তারপর ঘটনাপ্রবাহে এ কথাটি আমি সম্পূর্ণ ভুলে গিয়েছিলাম। আমি হাত দেখায় বিশ্বাস করিনে, তাই গুরুত্ব দেইনি। আজ যখন হঠাৎ মনে পড়ল, তখন আশ্চর্য হয়ে গেলাম এই ভেবে যে, সত্যিইতো আমার জীবনের ধারা একেবারেই দ্বিখণ্ডিত হয়ে গেছে। আমার অতীত জীবনের সঙ্গে বর্তমানের কোন সমবন্ধ নেই। হাইকোর্টের বিচারপতির নিভৃত নীরব আসন একেবারে গেছে ঘুচে। আজ আমি স্বেচ্ছায় বেরিয়ে এসেছি ঝঞ্ঝা ক্ষুব্ধ জীবনের আহবানে। প্রাণের উৎসাহ আমাকে ডেকেছে হাতছানি দিয়ে। বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পরে মিসেস দামোদারা মেনন একজন সাংবাদিকের সঙ্গে এই ঘটনাটির উল্লেখ করেন এবং সাক্ষাৎকারটি একটি ভারতীয় সাপ্তাহিক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল।

নিউইয়র্কে যাচ্ছি, পৃথিবীর নানাপ্রান্ত থেকে আগত প্রতিনিধিদের কাছে আমাদের স্বাধীনতার সিদ্ধান্তকে সমর্থন ও কারণ বিশ্লেষণ করতে। তখনই মনে হল, এমন দুর্বিষহ অবস্থার সৃষ্টি করা হয়েছিল যে, আমাদের পক্ষে এছাড়া আর কোন পথ খোলা ছিল না। একটি আত্মসম্মান-জ্ঞানসম্পন্ন জাতি এ ছাড়া আর কিছু করতে পারত না। তাই জাতির আকাঙ্ক্ষা রূপ গ্রহণ করে বঙ্গবন্ধুর ঘোষণায়। যখন হানাদার বাহিনী বেরিয়ে পড়ল মানব নিধনের মহোল্লাসে, তিনি ডাক দিলেন তাঁর অতি প্রিয় বাঙালী জাতিকে। তারপর থেকে দেশের ওপরে কি অবর্ণনীয় অত্যাচারই না হচ্ছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের হলগুলো তরুণের তাজা রক্তে রঞ্জিত হয়ে গেছে, গণকবর ভর্তি করা হয়েছে বাংলার তরুণের শবদেহে। খবর এসেছে পাক বাহিনীর দ্বারা স্বামীর সম্মুখে স্ত্রীর, পিতার সম্মুখে কন্যা ধর্ষণের। নিষ্ঠুরতম কাহিনী। এরপরে দেশ স্বাধীন না হলে বাঙালীর বেঁচে থাকা বয়ে আনবে অন্তহীন অবমাননা ও সীমাহীন লজ্জা।

মনে পড়ল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেই নির্মল দিনগুলোর কথা। ছাত্র-শিক্ষক মিলনায়তনে আমি তাদের সম্বোধন করেছি, 'আমার হীরের টুকরো ছেলেরা, লক্ষ্মী মেয়েরা।' আমার এই সম্বোধন কোন কৌশলগত অভিব্যক্তি ছিল না। জীবনে আমি যা বিশ্বাস করেছি, শুধু তাই

বলেছি। একথা আমি নিঃসংশয়ে দ্বিধাহীনচিত্তে বলতে পারি। তরুণের অন্তর্নিহিত শুভ-বুদ্ধি, সহজাত দেশপ্রেম এবং আদর্শের প্রতি অকুণ্ঠ নিষ্ঠা আমাকে বারবার সম্ভাবনাময় ভবিষ্যতের ইঙ্গিত দিয়েছে। তাদের মধ্যে যে প্রাণশক্তির প্রাচুর্য দেখেছি, তা আমাকে সত্যিই আশান্বিত, অনুপ্রাণিত করেছে।

স্নেহ ও প্রীতি যদি আন্তরিক হয় তাহলে তাদের হৃদয়ে সাড়া জাগবেই। তার প্রমাণ মাত্র কয়েক মাস আগের দু'দুটো সুশৃঙ্খল শান্তিপূর্ণ সমাবর্তন অনুষ্ঠান, ডাকসুর সুশৃঙ্খল শান্তিপূর্ণ নির্বাচন। আন্তরিকতা কখনো ব্যর্থ হয় না এটাই সেদিন যেন নতুন করে উপলব্ধি করেছিলাম।

অফিস থেকে কতদিন ভাইস চ্যান্সেলর হাউসে ফিরে দেখতে পেয়েছি, ছেলে ও মেয়েরা বাগানে স্বচ্ছন্দে বেড়াচ্ছে। আমাকে ঢুকতে দেখে তাদের মধ্যে কোন পরিবর্তন লক্ষ্য করিনি। তারা আমাকে এতটা আপন করে নিয়েছে ভেবে স্বভাবতঃই আনন্দবোধ করেছি। আমার সেই ছেলেমেয়েদের অনেককে আসুরিক শক্তি হত্যা করেছে। বিশ্ববাসীর কাছে আমি তাদের হয়ে বিচার চাব। অবিভক্ত পাকিস্তান তো ২৫শে মার্চের রাতেই শেষ হয়ে গেছে। এখন আছে মাত্র পশ্চিম পাকিস্তান।

একজন বিচারপতি থাকাকালে আন্দোলনে আমার সর্বাত্মক অংশগ্রহণ কিভাবে সম্ভব হলো, স্বাধীনতার পরেও একথা অনেকেই আমাকে জিজ্ঞেস করেছেন। সে কারণেই প্রথম দিকের ঘটনাবলী বিস্তৃত আকারে তুলে ধরেছি।

একাত্তরের দশ বছর আগে আমি ঢাকা হাইকোর্টের বিচারপতি নিযুক্ত হই। প্রথাগতভাবে বিচারপতিগণ সমাজ থেকে দূরে বসবাস করেন এবং সমাজকে দেখেন দূর থেকে। বিচারপতি হবার আগে আমি কখনো কোনো রাজনৈতিক দলে যোগ দিইনি, পরেও না। প্রায় আট বছর বিচারপতি থাকার পর উনিশ শ' উনসত্তর সালে আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের দায়িত্বভার গ্রহণ করি। সারাক্ষণ বিশ্ববিদ্যালয়েই কাটতো। এভাবে ছাত্রদের সঙ্গে আমার অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ গড়ে ওঠে। তাদের তারুণ্য আমাকে স্পর্শ করে। নিজেকে যদি দূর থেকে দেখা সম্ভব হয়, তাহলে আমার মনে হয় এই তারুণ্য, এই অন্তরের অনুভূতি আমাকে কর্মের পথ দেখিয়েছে। আমার মানসিক প্রস্তুতি এভাবেই ঘটেছিল।

আমার চিন্তার স্রোতে বাধা পড়ল। নিউইয়র্কের বিমান বন্দরে বিমানটি অবতরণ করছে। বিমানবালারা সীটে বেল্ট বাঁধার কথা মনে করিয়ে দিলেন।

বাষট্টি

তেইশে সেপ্টেম্বর অপরাহ্নে নিউইয়র্ক বিমান বন্দরে পৌঁছে দেখি এ, এইচ মাহমুদ আলী পূর্বের ন্যায় অনেককে নিয়ে এবারেও উপস্থিত। বিমান বন্দর থেকে হোটেল বোজার্টে পৌঁছলাম। এখানে দু'তিন দিন থেকে হোটেল বেলমান্ট প্লাজায় যেতে হবে। সেখানে ২৬শে সেপ্টেম্বর থেকে প্রতিনিধিদলের অধিকাংশ সদস্যের থাকার ব্যবস্থা হয়েছে।

নিউইয়র্কে পৌঁছবার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের কর্মপদ্ধতি ও কর্মসূচী নিয়ে আলোচনা শুরু হল। ওয়াশিংটন থেকে এলেন আমেরিকায় আমাদের নবনিযুক্ত রাষ্ট্রদূত মুস্তাফিজুর রহমান সিদ্দিকী (এম, আর সিদ্দিকী) এবং ওয়াশিংটন দূতাবাসের কয়েকজন সদস্য। তাছাড়া বেসরকারী পর্যায়ে অর্থাৎ ব্যক্তিগতভাবে ২৬শে মার্চ থেকেই যাঁরা আন্দোলনে কাজ শুরু করেছিলেন তাঁরাও নানা বিষয়ে আলোচনার জন্য এলেন। আমেরিকাস্থ ইষ্ট পাকিস্তান লীগের সভাপতি কাজী শামসুদ্দিন আহমদ তাঁর অন্যান্য সহকর্মী সহযোগে এলেন। এই সমিতির নাম তখনো ইষ্ট পাকিস্তান লীগ রাখতে হয়েছিল এই কারণে যে, একটি রেজিষ্ট্রীকৃত সংস্থার নাম পরিবর্তন করতে হলে যথেষ্ট সময়ের প্রয়োজন। আমি যখন মে মাসে নিউইয়র্কে আসি তখন থেকেই এই সমিতির কর্মকর্তাগণ নাম পরিবর্তনের চেষ্টা করে আসছিলেন। যা হোক, কাজী শামসুদ্দিনের কাছ থেকে অত্যন্ত উৎসাহোদ্দীপক কর্মবিবরণী পেলাম। ঠিক হল, আমরা কূটনৈতিক প্রচারকার্য চালাব আর ইষ্ট পাকিস্তান লীগ জনমনে উত্তরোত্তর সমর্থন বৃদ্ধি করার জন্য শোভাযাত্রা ও সভা ইত্যাদির আয়োজন করতে থাকবে। ওয়াশিংটনে এ, এম, এ মুহিত ও হারুন-অর-রশিদ এপ্রিল মাস থেকেই ব্যক্তিগত পর্যায়ে কাজ শুরু করেছিলেন। ৪ঠা আগষ্ট ওয়াশিংটনস্থ পাকিস্তানী দূতাবাসের সকল বাঙালী সদস্য সম্পর্ক ছিন্ন করলে আমাদের ওয়াশিংটনস্থ সংগঠন পূর্ণতা লাভ করে। আমার মে মাসের সফরের সময় নিউইয়র্কে পৌঁছার সঙ্গে সঙ্গে আমাকে নানাভাবে সাহায্য করতে এগিয়ে আসেন মাহবুব হোসেন ও ফররুখুল ইসলাম। তাঁরা প্রায় সারাক্ষণ আমার সঙ্গে থাকতেন। এবারেও বিমান বন্দরে পৌঁছেই তাঁদের দেখতে পেয়ে খুবই আনন্দিত হলাম এবং তাঁরা সেই মুহূর্ত থেকে নানাভাবে কাজে সহায়তা করেছিলেন। কাজী রেজাউল হাসান দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ অত্যন্ত উৎসাহী যুবক। তিনিও গতবারেই আমার নিউইয়র্কের সভায় যোগদান করেন এবং স্বাধীনতা আন্দোলনে সকল প্রকার সাহায্য করতে এগিয়ে আসেন। আমি তাঁকে মুক্তিযোদ্ধাদের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র পাঠাবার জন্য চেষ্টা করতে বলেছিলাম। এবারে এসে তাঁর কাছ থেকে যা শুনলাম তাতে অত্যন্ত উৎসাহিত বোধ করলাম। মাহবুব হোসেন তখন যান্ত্রিক প্রকৌশল বিভাগের ছাত্র ছিলেন। ফররুখুল ইসলাম তখন ট্রাভেল এজেন্সীতে কাজ করতেন। তাঁরা সকল কাজ ফেলে দিয়ে আমার সঙ্গে

নানা জায়গায় যেতেন। নিউইয়র্কে পাকিস্তানের কনসাল জেনারেলের অফিস দখল করার ব্যাপারে তাঁদের অগ্রণী ভূমিকা ছিল। রেজাউল হাসান বোস্টনে থাকলেও আমাকে জানান যে, তিনি এবং বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ কে, মহিউদ্দীন আলমগীর নিউইয়র্কে এসে বাঙালীদের সঙ্গে সহযোগিতায় কাজ করতে থাকেন। এপ্রিল মাস থেকে আন্দোলনে অত্যন্ত সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন আবু নাসের চৌধুরী। আমেরিকার জীবনের নানা ক্ষেত্রে কর্মরত বাঙালীগণ ছাব্বিশে মার্চের পরেই তড়িৎ বেগে আন্দোলনে যোগদান করেন। এভাবেই যোগ দিয়েছিলেন প্রকৌশলী আনোয়ারুল হক তালুকদার, যেমন দিয়েছিলেন অর্থনীতিবিদ মোহাম্মদ ইউনূস। বর্তমানে তিনি গ্রামীণ ব্যাংকের ম্যানেজিং ডিরেক্টর। কে, এম আলমগীরের স্ত্রী রোকেয়া আলমগীরের কর্মনৈপুণ্যের প্রশংসা আমি অনেকের কাছেই শুনেছি। শামসুল বারী এবং ফায়জুর রহমানের অবদানও অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য। তাছাড়া 'বাংলাদেশ লীগ অব আমেরিকা'র জেনারেল সেক্রেটারীরূপে চক্ষু চিকিৎসক এম, আহমেদের পরিশ্রম ও সাধনার কথা সকলেই জানেন। কাজী রেজাউল হাসান এবং তাঁর ভাই কাজী শহীদুল হাসান সারাক্ষণ কাজ করে যাচ্ছিলেন। ছাত্রনেতা এ, কে, এন হোসেন, আবদুল মান্নান এবং শিকাগোর মোজাম্মেল হক, শহীদুল আলমও অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন। খোরশেদ আলম, মাহবুবুল আলম মে মাসেও আমার সঙ্গে দেখা করে আন্দোলনের পক্ষে কাজ শুরু করার কথা জানান। এবারে এসে দেখলাম, তাঁরা সংঘবদ্ধ হয়েছেন এবং সুসংহতভাবে আন্দোলনের কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন। খোরশেদ আলম বৃহত্তর বোস্টনের বাংলাদেশ সংগ্রাম পরিষদের চেয়ারম্যান নির্বাচিত হয়েছেন। তিনি আন্দোলনের পূর্বে সি, এস, পি অফিসার ছিলেন। এই আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেছিলেন রেজাউল করিম ভূঁইয়া। তিনি পরবর্তীকালে ওয়াপদার চেয়ারম্যান হয়েছিলেন। আমিনুল ইসলামও একজন প্রকৌশলী। তিনি সংগ্রাম পরিষদে বিশিষ্ট ভূমিকা রেখেছেন। ছাত্রনেতা মবিন উদ্দীনের প্রশংসাও আমি অনেকের কাছে শুনতে পাই। বাংলাদেশ লীগ অব আমেরিকা 'শিখা' নামে একটি সাপ্তাহিক নিউজ বুলেটিন বের করে।

হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং এম, আই, টিতে অর্থাৎ ম্যাসাচ্যুসেটস ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজিতে অনেক বাঙালী ছিলেন। ২৬শে মার্চে তারা ঢাকায় পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীর বর্বরতার কথা জানতে পারার সঙ্গে সঙ্গে প্রয়োজনীয় কর্মপন্থা গ্রহণের জন্য চঞ্চল হয়ে ওঠেন। তাঁরা প্রত্যহ হার্ভার্ড পপুলেশন সেন্টারে মিলিত হতে থাকেন। মাহবুবুল আলম, তৈয়বুদ্দীন মাহতাব এবং খোরশেদ আলম অত্যন্ত উৎসাহের সঙ্গে নানা দায়িত্ব পালনে এগিয়ে আসেন। এঁরা সবাই নিউইয়র্কে অনুষ্ঠিত আমার মে মাসের মিটিংয়ে উপস্থিত ছিলেন এবং তাঁরা আমার সঙ্গে তাঁদের পরিকল্পনা এবং কর্মসূচী সম্বন্ধে আলোচনা করেছিলেন। এবারে এসে শুনলাম তাঁরা নিজ নিজ ক্ষেত্রে অধ্যবসায় এবং একাগ্রতার দ্বারা আমাদের সংগ্রামের জন্য সমর্থন অর্জন করেছেন। আমি মে মাসে তড়িৎ প্রকৌশলী রেজাউল হাসানকে মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য যোগাযোগের যন্ত্র প্রেরণের জন্য সক্রিয় প্রচেষ্টা চালাতে অনুরোধ করেছিলাম। ২৪শে মে অনুষ্ঠিত এই ঘরোয়া বৈঠকের কথা আমি আগেই বিশ অধ্যায়ে উল্লেখ করেছি। এবারে এসে যোগাযোগ যন্ত্র প্রেরণের ব্যাপারে অভাবিত সাফল্যের কথা শুনে নিবিড় আনন্দ পেলাম। ২৪শে মে'র আগেই হারুন-অর-রশিদ মুজিবনগরে যেয়ে নেতৃবৃন্দের সঙ্গে

দেখা করে এসেছিলেন। রেজাউল হাসান তাঁর নিকট থেকে যোগাযোগ যন্ত্রের প্রয়োজন সম্পর্কে বেশ কিছুটা ধারণা লাভ করেছিলেন।

এ বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্রের দু'টি আইন আছে। সেগুলিকে এড়িয়ে রেজাউল হাসানকে যন্ত্রাদি পাঠাবার ব্যবস্থা করতে হয়েছিল। এই আইন দু'টির ফলে কোন বিদেশী লোকের পক্ষে কোথাও সংগ্রামে লিপ্ত অবস্থায় ত্রাণ দ্রব্যাদিও প্রেরণ করা চলে না। এ অবস্থা আমি রেজাউল হাসানের কাছ থেকে শুনে বাস্তবিকই অভিভূত হয়েছিলাম যে নিউ হ্যাম্পশায়ার স্টেটের কনকর্ডে ফ্রাঙ্কলিন পিয়ার্স ল'সেন্টারের অধ্যক্ষ (ডীন) ডঃ রবার্ট রাইস এ বিষয়ে সকল প্রকার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তিনি একাডেমী অব এ্যাপ্লাইড সাইন্সেরও প্রেসিডেন্ট। এই প্রতিষ্ঠানটিও নিউ হ্যাম্পশায়ার স্টেটের রাজধানী কনকর্ডে অবস্থিত। তিনি এই প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে ত্রাণকার্যে সহায়তার জন্য এইসব যন্ত্রপাতি প্রেরণের ব্যবস্থা করেছিলেন। প্রেরিত যন্ত্রের মধ্যে ছিল ১০টি এইচ এম কমিউনিকেশনস সেট, ৫০টি ৫ ওয়াট পোর্টেবল ওয়াকিটকি টাইপ রেডিও টেলিফোন সেট, ৪৫টি ১.৫ ওয়াট পোর্টেবল রেডিও টেলিফোন সেট, ৩৫০৪টি ব্যাটারী সেলস, ১৫টি ব্যাটারী চার্জারস, ৮টি ইলেকট্রনিক্স টেষ্ট ইকুইপম্যান্ট এন্ড মিটারস। এসব জিনিসের তৎকালীন মূল্য ছিল ৮২,৯৫০ ডলার (বিরাশি হাজার নয়শত পঞ্চাশ ডলার)। এ সম্পর্কে মুজিবনগর সরকারের প্রধান সেনাপতি জেনারেল ওসমানী রেজাউল হাসানকে যে চিঠি লেখেন তা দেখে আমি আনন্দ ও স্বস্তিবোধ করলাম। সেই চিঠিতে এসব জিনিসপত্রের জন্য তিনিও আনন্দ প্রকাশ করেছেন এবং লিখেছেন যে, আমাদের মুক্তিযোদ্ধারা নানা রকম অসুবিধার মধ্যে থেকেও নানাভাবে সাফল্য অর্জন করছেন। তিনি আরো লেখেন যে, আমাদের যদি একটি প্রাণহানি হয় শত্রুর হয় চল্লিশটি। এই চিঠি তিনি সেপ্টেম্বর মাসে মুজিবনগর থেকে লিখেছিলেন এবং তিনি আরো কিছু যন্ত্রপাতির একটি তালিকা প্রেরণ করেছিলেন। রেজাউল হাসান সেগুলিও প্রেরণের ব্যবস্থা করছিলেন, এমন সময় ২৩শে সেপ্টেম্বর আমি নিউইয়র্ক পৌঁছালাম। রেজাউল হাসান এগুলি প্রেরণের ব্যাপারে এতটা সাফল্য অর্জন করেছেন জেনে খুবই আনন্দিত হই। এ ব্যাপারটি খুব গোপনে করতে হয় বলে তিনি আমাকে এ বিষয়ে কাজের অগ্রগতির কথা জানাতে পারেননি। সেপ্টেম্বরে আমেরিকায় ফিরে আসার পর থেকে এই কর্মী মানুষটি আমার সঙ্গে প্রত্যহ যোগাযোগ রেখে কাজ করেছেন। তাঁর নিজের কাজ সে সময় ছেড়েই দিয়েছিলেন বলা চলে।

কাজী রেজাউল হাসানের কাছ থেকে আমি জানতে পারি যে, যন্ত্রাদির জন্য মোট খরচ ৮২,৯৫০ (বিরাশি হাজার নয়শত পঞ্চাশ) ডলার-এর মধ্যে ১৮,৩১৪ (আঠার হাজার তিনশত চৌদ্দ) ডলার কয়েকজন বাঙালী মিলে দিয়েছেন। ব্যক্তিগতভাবে দান করেছেন ডঃ রেজাউর রহমান (এম,আর,সি,পি) এবং কাজী রেজাউল হাসান স্বয়ং। আর এছাড়া দিয়েছেন বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অব নিউ ইংল্যান্ড, বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অব ম্যানিটোবা, কানাডা। নিউ ইংল্যান্ডের চাঁদা পাওয়া গিয়েছিল ডঃ মাহবুবুল আলমের নিজস্ব প্রচেষ্টায়। এ ছাড়াও শিকাগো প্রবাসীদের পক্ষ থেকে অর্থ সাহায্য করেন এফ, আর খান। ম্যানিটোবা এসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে দেন ডঃ ফরিদ শরীফ। বাকী ৬৪,৬৩৬ ডলার আসে প্রেসিডেন্ট একাডেমী অব এ্যাপলাইড সাইন্সের পক্ষ থেকে এবং ব্যক্তিগতভাবে রবার্ট রাইন্সের নিজস্ব তহবিল এবং অন্য

আমেরিকান বন্ধুদের নিকট থেকে। যন্ত্রগুলো পাওয়া গিয়েছিল সুবিধাজনক মূল্যে অর্থাৎ কনসেশন রেটে। অর্থনীতিবিদ ও পেশাদার ব্যাংকার জন কুনও এই যন্ত্রগুলোর জন্য ব্যক্তিগতভাবে অর্থ সাহায্য করেন। আমাদের আন্দোলনের সাফল্যের জন্য অনেক আগে থেকেই তিনি চেষ্টা করেছিলেন।

ডঃ রেজাউর রহমান সে সময় ম্যাসাচুসেটসের একটি হাসপাতালে চিকিৎসকরূপে কাজ করছিলেন। তিনি এবং তাঁর স্ত্রী আন্দোলনে সাহায্যের জন্য ছিলেন সদাপ্রস্তুত। ডঃ ফরিদ শরীফ কানাডায় যথেষ্ট কাজ করেছেন।

ডঃ ফজলে বারী মালিক ইন্ডিয়ানা বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগে গবেষণা করছিলেন। তিনি যদিও ব্যক্তিগতভাবে খুবই ব্যস্ত ছিলেন, তথাপি সর্বদা আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া তাঁর কাজের অঙ্গ হয়ে পড়েছিল। ডঃ লেনার্ড ক্যাটজ একজন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন প্রকৌশলী। তিনিও এই আন্দোলনে খুব সাহায্য করেন। খোরশেদ আলম ছিলেন বোষ্টনস্থিত বাংলাদেশ এসোসিয়েশনের প্রথম প্রেসিডেন্ট। এতদ্ব্যতীত তিনিও এই অঞ্চলের সকল বাঙালীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রেখেছিলেন। অর্থনীতিবিদ মহিউদ্দিন আলমগীর এবং তাঁর স্ত্রী সুজান আলমগীর সর্বদা এই আন্দোলনকে সামগ্রিকভাবে সাহায্য করেছেন এবং বোষ্টনে তাঁদের কর্মতৎপরতা বাঙালীদের সংগঠনকে শক্তিশালী করে।

কাজী রেজাউল হাসানের পরিচালনায় এবং অন্য সহকর্মীদের সমবেত চেষ্টার ফলে যন্ত্রাদি প্রেরণের কথা উল্লেখ করেছি। এবারে এগুলোর কার্যকারিতা সম্বন্ধে বলছি। এইচ এফ কমিউনিকেশন সেট পাঠানো হয় দশটি। এগুলোতে দশ হাজার মাইল দূরেও কথা বলা যায় এবং মরস কাডে সংবাদ দেয়া আনা করা চলে। ৫ ওয়াট ভি, এইচ, এফ ওয়াকী টকী সেটে পাঁচ মাইলের মধ্যে খবর দেয়া নেয়া চলে। এগুলো পাঠানো হয় পঞ্চাশটি। তাছাড়া পঁয়তাল্লিশটি দেড় ওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন ওয়াকীটকী পাঠানো হয়েছে। এগুলো দুই মাইলের মধ্যে অনুরূপ কাজে লাগে। দেশ স্বাধীন হবার পর স্বাধীন বাংলাদেশেও যোগাযোগের কাজ এগুলো দিয়েই শুরু হয়। যুদ্ধের সময়ে আমাদের মুক্তিবাহিনীর সদস্যবৃন্দ এগুলো গ্রামে গঞ্জে পাহাড়ে জঙ্গলে ব্যবহার করেছেন।

পাঠানোর পূর্বে এগুলোকে পরীক্ষা করে দেখার প্রয়োজনীয়তা স্বভাবতঃই অনুভূত হয়। রেজাউল হাসানের এক বন্ধুর ফ্যাক্টরীতে এগুলোকে পরীক্ষা করা হয়। তারপর ঠিক হয় যে, একজন বাঙালীকে এই সব যন্ত্রাদি ব্যবহার করা শিখিয়ে তাঁকে মুজিবনগরে পাঠাতে হবে। তিনি সেখানে আর কাউকে এই যন্ত্রগুলো পরিচালনার কৌশল ইত্যাদি দেখিয়ে আসবেন। তৈয়বউদ্দীন মাহতাব তখন ফ্লেচার স্কুল অব ইন্টারন্যাশনাল এ্যাফেয়ার্সে এম,এ পড়ছিলেন। তিনি স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে মুজিবনগরে যেতে সম্মতি জানান। তৈয়বউদ্দিনকে এ ব্যাপারে আমেরিকান বিমান বাহিনীর একজন অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারী যন্ত্র পরিচালনার ব্যাপারে সবকিছু বুঝিয়ে দেন। এই অফিসারের নাম লেফটেন্যান্ট কমান্ডার কার্ল মাইলস। তৈয়বউদ্দীন মাহতাবের যাতায়াতের খরচ বহন করেন মাহবুবুল আলম।

মাহবুবুল আলমের কথা বলতে যেয়ে মনটা বেদনায় ভরে ওঠে। তাঁর বাড়ী বোষ্টনে অঞ্চলে বাঙালীদের দূতাবাসের মত ছিল। প্রায়ই সেখানে বাঙালীরা মিলিত হতেন এবং নানা

কর্মসূচী নিয়ে আলোচনা করতেন। তিনি এবং তাঁর স্ত্রী সালমা আলম দু'জনাই স্বাধীনতা সংগ্রামে নিজেদেরকে উৎসর্গ করেছিলেন। তাঁদের অতিথিপরায়ণতা ও সামাজিকতার কথা সবাই জানতেন। আমি শুনেছি আন্দোলনের কাজে যখনই টাকা-পয়সার অভাব হত মাহবুবুল আলম সানন্দে এগিয়ে আসতেন। প্রকৌশলী হিসেবে তাঁর যথেষ্ট খ্যাতি ছিল এবং বিখ্যাত প্রকৌশলী ফার্ম আর্থার ডি লিটলের উপদেষ্টা ছিলেন। একাত্তরে আমেরিকার এই উৎসাহী দেশপ্রেমিক মানুষটির সঙ্গে দেখা হয়েছিল, অনুভব করেছিলাম বাংলাদেশের প্রতি তাঁর তীব্র ভালবাসা। কিন্তু ১৯৮৪ সনের এপ্রিল মাসে হঠাৎ তিনি আমাদের ছেড়ে যান। সালমা আলম কয়েক দিনের জন্য ঢাকায় বেড়াতে এসেছিলেন। তিনি যেদিন তিনজন নাবালক সন্তান নিয়ে বোস্টনে ফিরছিলেন সেদিনই এই ঘটনা ঘটে। তাঁরা তখন প্লেনে ছিলেন। বিমান থেকে অবতরণ করেই এই হৃদয়বিদারক খবর পান। মাহবুবুল আলমের সংস্পর্শে আমরা যাঁরা এসেছিলাম তাঁকে প্রীতি ও শ্রদ্ধার সঙ্গে চিরদিন স্মরণ করব।

তেষট্টি

মুজিবনগর সরকার আমাকে যে ষোল সদস্য বিশিষ্ট প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব দেয়ার জন্য নিউইয়র্কে আসতে অনুরোধ জানান তার অন্যান্য সদস্য ছিলেন ঃ

জাতীয় সংসদ সদস্যবৃন্দ ঃ

১) আবদুস সামাদ আজাদ
২) মুস্তাফিজুর রহমান সিদ্দিকী (এম,আর, সিদ্দিকী)
৩) সৈয়দ আবদুস সুলতান
৪) ডঃ মফিজ চৌধুরী
৫) সেরাজুল হক

প্রাদেশিক পরিষদ সদস্যবৃন্দ ঃ

৬) ডঃ আসহাবুল হক
৭) ফনীভূষণ মজুমদার
৮) ফকির শাহাবুদ্দীন

৯) ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির নেতা অধ্যাপক মোজাফফর আহমদ
১০) চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডঃ আজিজুর রহমান মল্লিক
১১) বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক রেহমান সোবহান

রাষ্ট্রদূতগণ ঃ

১২) এ, এফ, এম, আবুল ফতেহ

১৩) খুররম খান পন্নী

কূটনীতিবিদগণ ঃ

১৪) সৈয়দ আনোয়ারুল করিম

১৫) এ, এম, এ, মুহিত

১৬) এ, এইচ, মাহমুদ আলী

মুজিবনগর সরকার এই প্রতিনিধিবর্গের মারফত বিশ্বের সকল সরকারের কাছে স্বাধীনতা আন্দোলনের তাৎপর্য তুলে ধরেন। সাধারণ পরিষদে যোগদানের জন্য প্রায় সকল সদস্য রাষ্ট্রই প্রতিনিধি প্রেরণ করে। এই প্রতিনিধিদলে সাধারণতঃ সংসদ সদস্য, কূটনীতিবিদ, শিক্ষাবিদ, সরকারী ও বেসরকারী ব্যক্তিবর্গ থাকেন। তাই তাঁদের কাছে বাংলাদেশের বাণী পৌঁছে দেয়াই ছিল উদ্দেশ্য।

মুজিবনগর সরকার ইতিমধ্যে ওয়াশিংটনে একটি দূতাবাস স্থাপন করেন। ৪ঠা আগষ্ট ওয়শিংটনস্থ পাকিস্তান দূতাবাসের সকল বাঙালী সদস্য একযোগে পদত্যাগ করে বাংলাদেশের প্রতি আনুগত্য ঘোষণা করেন। তাঁদের নিয়ে একটি দূতাবাস যুক্তরাষ্ট্রে স্থাপিত হয় আর বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত হয়ে আসেন মুস্তাফিজুর রহমান সিদ্দিকী (জাতীয় সংসদ সদস্য এম, আর সিদ্দিকী)। অনুরূপভাবে মুজিবনগর সরকার নিউইয়র্কে আমাকে জাতিসংঘে বাংলাদেশ সরকারের স্থায়ী প্রতিনিধি এবং নিউইয়র্ক দূতাবাসের প্রধান হিসেবে ঘোষণা করেন। এ এইচ, মাহমুদ আলী ২৬শে এপ্রিল পদত্যাগ করে তার বাড়ী থেকেই কাজ চালাচ্ছিলেন। পরে দূতাবাস স্থাপিত হয় ১০ ইষ্ট ৩৯ স্ট্রীটের দশতলার উপরে একটি কক্ষে।

বেলমান্ট প্লাজা হোটেলে আমাদের প্রতিনিধিদলের থাকার ব্যবস্থা করা হয়। নিউইয়র্কে সব হোটেলই প্রতিনিধিদলের সদস্যদের কূটনৈতিক হারে ভাড়া দিয়ে থাকে। বেলমান্ট সরকারী প্লাজা আমাদেরকেও সরকারী কূটনীতিবিদ হিসাবে গণ্য করে এবং সেভাবেই ভাড়া নেয়। এমনিতেও এই হোটেলটির ভাড়া যুক্তিসঙ্গত ছিল। এখানে প্রায় সকলের জন্য একটি করে কক্ষ নেয়া হয়। বেলমান্ট প্লাজায় কয়েকজনের জন্য কক্ষ পাওয়া যায়নি। তাঁদের জন্য নিকটস্থ পিকউইক আর্মস হোটেলে থাকার ব্যবস্থা করা হয়। বেলমান্ট প্লাজা যে ভাড়ার ব্যাপারে আমাদেরকে কূটনীতিবিদ হিসাবে গণ্য করলেন তাতেও আনন্দবোধ করেছিলাম।

আমি ২৩শে সেপ্টেম্বর বোজার্ট হোটেলে উঠেছিলাম। দু'দিন তিন দিন পরে আমি বেলমান্ট প্লাজায় চলে এলাম। এখানে এসে দেখি এম, আর সিদ্দিকী আমার জন্য একটি সূইটের ব্যবস্থা করেছেন। অর্থাৎ একটি শোবার ও বসবার ঘর। আমি বল্লাম, "স্বাধীনতা সংগ্রামে সকলেই সৈনিক। কাজের সুবিধার জন্য একজনকে নেতা বলা যেতে পারে। তাছাড়া আর কোন পার্থক্য নেই। আমাকেও একটি সূইট না দিয়ে আর সকলের মত একটি কক্ষ দিতে হবে।" আমার পীড়াপীড়িতে তাই হলো। বসার ঘরটিতে অফিস করা হলো। আর সংযুক্ত

শোবার ঘরটিতে শেষ পর্যন্ত এম,আর, সিদ্দিকীর থাকার ব্যবস্থা করা হলো। অফিসে গোটা দুই টাইপ রাইটার মেশিন রাখা হল এবং সেগুলো অনবরত চলতে থাকল। অর্থাৎ টাইপ রাইটারের শ্রুতিমধুর শব্দ আমার বদলে শুনতে হল এম, আর, সিদ্দিকীকে।

প্রথম দিনের পূর্ণাঙ্গ প্রতিনিধিদলের সভায় ফকির শাহাবুদ্দিনকে দলের সদস্য সচিবের দায়িত্ব দেয়ার প্রস্তাব করলে সকলেই সানন্দে সমর্থন করলেন। এ, এইচ, মাহমুদ আলীকে প্রতিনিধিদলে অন্তর্ভুক্ত করে নেয়া হয়। তিনি ২৬শে এপ্রিল পদত্যাগ করায় সকলের নিকটই তিনি অত্যন্ত প্রিয় ছিলেন এবং তাঁর কর্মতৎপরতা আমাদের প্রয়োজন ছিল। অক্লান্ত কর্মী শাহাবুদ্দিন আমার অনুরোধে অফিস পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। আমি তাঁর বুদ্ধি বিবেচনা ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের কথা জানতাম। অফিসের দায়িত্বে থাকায় তাঁকে সর্বদা নানা জায়গা থেকে যেসব জরুরী সংবাদ বা টেলিফোন আসতো সে সবের তাৎক্ষণিক উত্তর দান এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হতো। তাঁর দক্ষতা সমবন্ধে জানি বলেই এ দায়িত্ব তাঁকে আমরা নিঃসংশয়ে দিলাম। কিন্তু শাহাবুদ্দিনের জন্য এর অর্থ এই দাঁড়ায় যে, তাঁকে সারাক্ষণ সেই কক্ষটিতে থাকতে হয়েছিল আর কাজ করতে হয়েছিল ঘরে বসে। প্রতিদিন এভাবে কাটানো ছিল কষ্টসাধ্য। দেশের প্রয়োজনে তাঁকে এ ব্যবস্থা মেনে নিতে হয়েছিল। তাছাড়া কাজ শেষ হয়ে গেলে তিনি একটি তথ্যপূর্ণ এবং সুবিবেচনা প্রসূত প্রতিবেদন তৈরী করেছিলেন। তিনি বিভিন্ন গ্রুপের সদস্যদের সঙ্গে নানা দূতাবাসের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা করতেন এবং সংশ্লিষ্ট গ্রুপকে যথাসময়ে সেখানে পাঠাতেন। তাছাড়া কোন সাংবাদিক রেডিও বা টেলিভিশনের পক্ষ থেকে আমার সঙ্গে দেখা করতে চাইলে তাঁদের সাক্ষাতের ব্যবস্থা করে দিতেন। জরুরী সংবাদ সংশ্লিষ্ট গ্রুপকে পৌঁছাতেন। সত্যি কথা বলতে কি, কাজটি একঘেয়ে হলেও অত্যন্ত দায়িত্বপূর্ণ ছিল। শাহাবুদ্দিনের দেশাত্মবোধ ও নিষ্ঠা তাঁকে এই দুরূহ কর্তব্য পালনে উৎসাহিত করেছিল। তিনি প্রফুল্লচিত্তে ও আনন্দের সঙ্গেই খুব পরিশ্রম করেছেন।

প্রতিদিন সকালে কয়েক মিনিটের জন্য বেলমাণ্ট প্লাজার সভাকক্ষে আমাদের প্রতিনিধিদলের বৈঠক বসত। সমগ্র প্রতিনিধিদলকে কয়েকটি গ্রুপে ভাগ করে দেয়া হয়, যাতে করে অল্প সময়ে বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধিদলের সঙ্গে যোগাযোগ সমাপ্ত করা যায় এবং সেখানে প্রতিনিধিদলের কোন্ গ্রুপ কোন্ দেশের প্রতিনিধিদের সঙ্গে দেখা করলেন, কি কথা হলো এসব পর্যলোচনা করে আমাদের কর্মপদ্ধতি নির্ধারণ করা হতো। তাঁরা দূতাবাসগুলোতে যেয়ে সাধারণতঃ রাষ্ট্রদূতদের সঙ্গে দেখা করতেন। প্রতিদিনের আলোচনার যথাযথ সংক্ষিপ্ত বিবরণী দেখতে পেরেছিলাম শাহাব উদ্দিনের শতাধিক পৃষ্ঠাব্যাপী রিপোর্টে। এই রিপোর্টটি লন্ডনের দূতাবাসে অথবা গোরিং স্ট্রীটের অফিসে তিনি জমা দিয়েছিলেন। আবার আমাদের বৈঠকে আরো সিদ্ধান্ত নেয়া হয় যে, ভারতের সাহায্য নিয়ে জাতিসংঘের দপ্তরে যাওয়া ঠিক হবে না। কেননা পাকিস্তানীরা নানারূপ প্রচারণা করছিল। এর জবাব বারবার দিলেও সাবধানতা গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা ছিল।

আমাকে অবশ্য প্রত্যহ একবার জাতিসংঘে যেতে হত। আমার গ্রুপে ছিলেন জাতীয় সংসদ সদস্য সৈয়দ আবদুস সুলতান এবং তরুণ কূটনীতিবিদ এ, এইচ মাহমুদ আলী। জীবনের নানা

কর্মক্ষেত্রে অর্জিত সৈয়দ সুলতানের দীর্ঘ অভিজ্ঞতা ও বিচক্ষণতা এবং মাহ্মুদ আলীর অদম্য উৎসাহ ও তারুণ্য আমাকে নিরন্তর সাহায্য করেছে।

আমরা সাধারণতঃ সাংবাদিক জে, কে, ব্যানার্জীর অতিথিরূপে প্রতিদিন জাতিসংঘ ভবনে যেতাম। এঁর পরিচিতি আমি আমার নিউইয়র্কের প্রথম সফরের বিবরণীতে দিয়েছি। স্বাধীনতা সংগ্রাম চলাকালে একদিনের জন্যও আমার বা আমার সহকর্মী সৈয়দ সুলতান এবং মাহমুদ আলীর জাতিসংঘে যাতায়াতের কোন অসুবিধা হয়নি। ডঃ ব্যানার্জীর নিকট এ জন্য আমরা কৃতজ্ঞ। এই সহৃদয় উদারমনা বিদগ্ধ মানুষটি আমাদের সাহায্য করতে পারলে খুবই আনন্দ পেতেন। প্রথম বারের সাক্ষাতেই বুঝেছিলাম তাঁর অন্তরে রয়েছে সকল মানুষের মুক্তির জন্য এক উদ্দীপ্ত কামনা। তাঁর স্ত্রী মনিকা ব্যানার্জীও অত্যন্ত সুরুচিসম্পন্ন বিদুষী মহিলা। তাঁর আন্তরিকতা আমাদের হৃদয় স্পর্শ করেছে। তিনিও অত্যন্ত মমত্ববোধের সঙ্গে বাংলার নিপীড়িত মানুষের মুক্তি কামনা করতেন। এই বছর ডঃ ব্যানার্জী জাতিসংঘে অবস্থিত জাতিসংঘ সংবাদদাতা সমিতির সভাপতি ছিলেন। সে কারণে তাঁর নিজের কক্ষ ছাড়াও সমিতির অফিসে তাঁর জন্য নির্দিষ্ট কক্ষ ছিল। আমরা সে কক্ষও মাঝে মাঝে ব্যবহার করেছি। তাঁর সঙ্গে এই ব্যবস্থা হলো যে, আমরা প্রত্যহ জাতিসংঘের গেটে গিয়ে তাঁকে ফোন করব এবং তিনি টেলিফোনে গেটে কর্মরত অফিসারদের আমাদের জন্য প্রবেশ পত্র দিতে বলে দেবেন। একবার প্রবেশপত্র নিয়ে ভেতরে গেলে সারা দিনই জাতিসংঘের দফতরে ঘুরে বেড়ানো যায়। প্রবেশপত্রে শুধু তারিখ থাকে সময়ের উল্লেখ থাকে না অথবা কোন জায়গা সীমিত করে দেয়া হয় না। আমাদের প্রতিনিধিদলের অন্যান্য গ্রুপও ডঃ ব্যানার্জীর নিকট থেকে অনেক সময় প্রবেশপত্র নিয়েছেন, তবে তাঁরা সাধারণতঃ দূতাবাসগুলোতেই যেতেন। আমরা তিনজনেই সাধারণতঃ সকালে প্রবেশপত্র নিয়ে ভেতরে যেতাম। ডেলিগেশন লাউঞ্জ এবং অন্যান্য জায়গায়, প্রতিনিধিদের সঙ্গে দেখা করতে কোন অসুবিধা হতো না। অবসর পেলে ডঃ ব্যানার্জীর কক্ষে যেয়ে নতুন কোন খবর আছে কিনা জেনে নিতাম। ব্যানার্জী আমাদের আরেকটি সুবিধা করে দিয়েছিলেন যেটা শুধু স্বীকৃত কূটনীতিবিদরাই ভোগ করেন। জাতিসংঘের প্রেস উইং-এ অবস্থিত টেলিগ্রাম অফিসেও ডঃ ব্যানার্জী আমার দস্তখতে টেলিগ্রাম পাঠানোর ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। কাউন্টারে গিয়ে আমি টেলিগ্রাম দিলে তাঁরা নিয়ে নিতেন এবং পরে ডঃ ব্যানার্জীর কক্ষে আমার নামে বিল পাঠিয়ে দিতেন। আমরা বিল পাওয়া মাত্র টাকা পরিশোধ করে দিতাম। আমাকে ঘন ঘন প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমদ এবং অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলামের কাছে টেলিগ্রাম করে কাজের অগ্রগতির কিছুটা আভাস দিতে হতো। এ ব্যবস্থার ফলে তারবার্তা পাঠানোর অনেক সুবিধা হয়েছিল। সৈয়দ সুলতান, মাহমুদ আলী এবং আমি সর্বদা এক সঙ্গে বিভিন্ন নেতার সঙ্গে দেখা করতাম। সকাল থেকে শুরু করে মাঝ রাত পর্যন্ত আমরা তিনজনে একত্র চলাফেরা করেছি। মাহমুদ আলীর বাড়ী ফিরতে প্রত্যহ রাত হতো। সৈয়দ সুলতান অবশ্য হোটেলে আমার পাশের কক্ষেই থাকতেন। অল্পদিনের মধ্যেই আমাদের প্রতিনিধিদলের বিভিন্ন গ্রুপ বহু দূতাবাসে সাক্ষাৎকারের কাজটি সেরে ফেলেন। আমিও অনেকের সঙ্গেই দেখা করি। আমাদের প্রতিনিধিদল সর্বত্রই

সৌজন্য ও সুরুচিসম্পন্ন ব্যবহার পান। বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রদূতগণ সহৃদয়তার সঙ্গে বাংলাদেশের অবস্থা শোনেন এবং আমাদের কথা তাঁদের সরকারকে জানাবেন বলেন। এ ছাড়া একজন রাষ্ট্রদূত এরূপ ব্যাপারে আর কিই-বা বলতে পারেন, স্বীকৃতির প্রশ্নে প্রায় সবাই বলেন যে, বাংলাদেশ সরকার দেশের অভ্যন্তরে থেকে নিরাপদে কাজ করতে পারছেন সে সমবন্ধে তাঁদের নিশ্চিত হতে হবে। প্রায় সবাই এও বলেছেন যে, ভারত স্বীকৃতি না দেওয়া পর্যন্ত সে সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া সম্ভব নয়। কেউ কেউ খোলাখুলি বলেন যে, ভারতের স্বীকৃতির পরই শুধু এ ব্যাপারে বিবেচনা করা যেতে পারে।

মুসলিম দূতাবাসগুলোতে অবশ্য আলোচনার ধারা ছিল ভিন্ন। আমরা ব্যবহারের দিক থেকে সর্বত্রই ভ্রাতৃসুলভ ব্যবহার পেয়েছি। তবে সব মুসলিম দূতাবাসেই একটি জিনিস লক্ষ্য করেছি যে, তাঁদের মনের কোণে সংশয় রয়েছে। কেউ খুলে বলেছেন, কেউ বলেন নি। আমি নিজে যে সব মুসলিম রাষ্ট্রদূতদের সঙ্গে দেখা করেছি তাঁদের এমন একটি অবস্থায় নিয়ে গিয়েছি যে, তাঁরা কেউ কেউ মনের দ্বিধা ব্যক্ত করে ফেলেছেন। আমার অন্যান্য সহকর্মীও যখনই বুঝতে পেরেছেন যে তাঁদের সঙ্গে মনের কথা লুকিয়ে আনুষ্ঠানিক কথাবার্তা চলছে, তাঁরাও এমনভাবে কথাবার্তাকে নিয়ে গিয়েছেন যে শেষ পর্যন্ত মনের কথাটি রাষ্ট্রদূত ব্যক্ত করেছেন। সংশয়টি ছিল ভারতের সঙ্গে আমাদের সমবন্ধ নিয়ে। সে কথাটি খুলে বলার পর আমার সহকর্মীগণ ও আমি যথাযথভাবে বুঝিয়েছি যে বাংলাদেশ স্বাধীন হলে ভারতের অধীনস্থ রাজ্য হবার কোন সম্ভাবনা একেবারেই নেই এবং এই সংগ্রাম ভারতের প্ররোচনায় শুরু হয়নি। এই ব্যাপারটিতে সাময়িকভাবে পাকিস্তানের সাফল্যের কথা আমাকে স্বীকার করতেই হবে। আমাদের এই সংগ্রাম ভারতের উস্কানিতে শুরু হয়েছে এই সন্দেহ পাকিস্তান প্রত্যেক মুসলিম রাষ্ট্রে সৃষ্টি করতে পেরেছিল। তবে আমাদের সঙ্গে যাঁরা কথাটি স্পষ্ট করে তুলেছেন তাঁদেরকে আমরা নানা ঘটনা প্রবাহের উল্লেখ করে অনেকটা বোঝাতে সক্ষম হয়েছি যে, বর্তমান অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে জন্মলগ্ন থেকে, পাকিস্তানের বৈষম্যমূলক নীতির ফলে এবং পঁচিশে মার্চ রাত্রের হত্যাযজ্ঞের দ্বারা। ঐদিন রাতেই ঐক্যবদ্ধ বাঙালী জাতি বঙ্গবন্ধুর আহবানে পূর্ণ স্বাধীনতার জন্য দাঁড়িয়ে যায়। ছয় দফার দাবী এক দফার অর্থাৎ স্বাধীনতার দাবীতে রূপান্তরিত হয়। পাকিস্তানের দ্বারাই এমন অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে যে স্বাধীনতা অর্জন ছাড়া আর কোন পথই নেই— We have reached a point of no return. এ অবস্থা ভারতের উস্কানিতে সৃষ্ট হয়নি—হয়েছে পাকিস্তানের অবিচার এবং অত্যাচারের ফলে। কোন কোন মুসলিম দেশের প্রতিনিধিদের এই সন্দেহ পরে অবশ্য অনেকাংশে দূরীভূত হয়েছিল। কিন্তু আমার মনে হয় এই সন্দেহের সম্পূর্ণরূপে অবসান হয় স্বাধীনতা অর্জনের পর। আমাদের স্বাধীনতা অর্জনের পর প্রায় সকল মুসলিম রাষ্ট্রই আমাদের সিদ্ধান্তের যৌক্তিকতা উপলব্ধি করে আমাদের ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ করেছেন এবং পাকিস্তানের মিথ্যা প্রচারণা সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ হয়েছে। আমরা ক্রমান্বয়ে সকল মুসলিম রাষ্ট্রের স্বীকৃতি পেয়েছি।

পাকিস্তানী প্রতিনিধিদলের বাঙালী সদস্যদের জাতিসংঘের দফতরে দেখা হলেই তাঁরা বিনয়ের সঙ্গে সালাম করে সরে যেতেন। মাঝে মাঝে কুশলাদি জিজ্ঞেস করতেন। আমিও

তাঁদের সঙ্গে সৌজন্য বজায় রেখেই কথাবার্তা বলেছি। আমাদের দলের এ, এইচ মাহমুদ আলীর বয়স আমার চেয়ে অনেক কম। পাকিস্তানীদলের বাঙালী সদস্যদের সঙ্গে দু'এক মিনিট আলাপ করলেই দেখতাম মাহমুদ আলী বিশেষ পছন্দ করছেন না। পরে বলতেনও, "স্যার, এদের সঙ্গে সময় নষ্ট না করাই ভাল।"

একদিনের ঘটনা বলি ঃ মাহমুদ আলী এবং আমি ক্যাফেটেরিয়ায় বসে চা পান করছিলাম। পাকিস্তানী প্রতিনিধিদলের একজন বাঙালী সদস্য চায়ের ট্রে নিয়ে আমাদের সামনে দিয়ে যাবার সময় আমাকে দেখে সেই টেবিলে বসতে যাচ্ছিলেন। আমি হঠাৎ বলে ফেলি, আমরা একটি জরুরী বিষয়ে কথা বলছি। ভদ্রলোক প্রায় চমকে উঠে অন্য টেবিলে চলে গেলেন এবং তাড়াতাড়ি চা পান শেষ করে ক্যাফেটেরিয়া ছেড়ে চলে যান। আমার সৌজন্য বোধে আঘাত লাগল। কেবলই মনে হতে লাগল আমার মধ্যে ভদ্রতার অভাব ঘটা ঠিক হয়নি। শেষ পর্যন্ত মাহমুদ আলীকে দিয়ে সেই ভদ্রলোককে খুঁজে বের করে বললাম তিনি যেন কিছু মনে না করেন।

এখানে বলা দরকার পাকিস্তানী প্রতিনিধি দলের সদস্য মাহমুদ আলী কিংবা শাহ আজিজুর রহমানের সঙ্গে আমার কখনো সামনা সামনি দেখা হয়নি। দেশ স্বাধীন হবার পর ঢাকায় এসে শুনি ডেলিগেশন লাউঞ্জে পাকিস্তানী দলের একজন বাঙালী মহিলা সদস্য আমার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করেছেন। কথাটি মিথ্যে, এরূপ কোন ঘটনা ঘটেনি। পরে শুনেছি পাকিস্তানী দলের একজন বাঙালী সংবাদদাতাই নিউইয়র্ক থেকে এই সংবাদটি পাঠিয়েছিলেন। যাহোক এখানে আমাদের কর্ম প্রবাহের একটি সাধারণ বিবরণী মাত্র দিয়েছি।

চৌষট্টি

এবার আমাদের প্রতিনিধিদল সমবন্ধে সংক্ষেপে বলছি। আমাদের প্রতিনিধি দলের সদস্য আব্দুস সামাদ আজাদ বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ। দেশ প্রেমে উদ্বুদ্ধ এই মানুষটি বহুবার কারাবরণ করেছেন। তাঁর রাজনৈতিক অবস্থার বিশ্লেষণে দক্ষতা এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের ব্যাপারে বিচক্ষণতা সর্বজনবিদিত। আওয়ামী লীগের সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী সর্বোচ্চ ব্যক্তিদের তিনি একজন। মুজিবনগর সরকারের পক্ষ থেকে ব্যক্তিগত যোগাযোগ স্থাপনের উদ্দেশ্যে লন্ডনে তাঁর আগমনের প্রত্যাশা আমরা কিছুদিন থেকে করছিলাম। কিন্তু বুদাপেষ্টে অনুষ্ঠিত শান্তি সম্মেলন এবং অন্যান্য ব্যাপারে ব্যস্ত থাকায় ইতিপূর্বে আসতে পারেননি। এবারে তাঁকে কাছে পেয়ে আমরা খুবই আনন্দিত হই। আমি তাঁর গুণাবলীর কথা আগে শুনলেও এবারেই তাঁর সঙ্গে

ব্যক্তিগত পরিচয় হলো। তাঁর সহজাত আন্তরিকতা আমাকে মুগ্ধ করে এবং এই পরিচয় দু'একদিনের মধ্যেই দৃঢ় ভ্রাতৃত্ব ও বন্ধুত্বে পরিণত হয়। বিদেশী রাষ্ট্রদূতগণ সংসদ সদস্যদের সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য আগ্রহান্বিত ছিলেন। তাই তাঁকে এবং অন্যান্য সংসদ সদস্যদের কাছে পেয়ে খুবই ভাল হয়েছিল।

মুস্তাফিজুর রহমান সিদ্দিকী বাংলাদেশের একজন বিখ্যাত শিল্পপতি। বঙ্গবন্ধুর আহবানে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে তিনি আন্তরিকতার সঙ্গে যোগ দেন। অল্পদিন আগে এলেও ওয়াশিংটনের দূতাবাসটিকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে তিনি এবং তাঁর সহকর্মীগণ যথেষ্ট সাফল্য অর্জন করেছেন। আমেরিকার সরকার কর্তৃক স্বীকৃত না হলেও তাঁর এবং তাঁর সহকর্মীদের কর্ম নৈপুণ্যের ফলে ওয়াশিংটনের কূটনীতিবিদদের নিকট সম্মানের স্থান করে নিতে পেরেছেন। আমাদের প্রতিনিধিদলের সকল প্রশাসনিক দায়িত্ব ওয়াশিংটনের বাংলাদেশ দূতাবাসের ছিল। অর্থাৎ মুজিবনগর সরকার খরচের ব্যবস্থা করেছেন। খরচ করা এবং হিসেব রাখার কাজ দূতাবাসকে করতে হয়েছে। ব্যক্তিগত জীবনে এম, আর, সিদ্দিকী একজন সদালাপী, মিষ্টভাষী ও সুরুচিসম্পন্ন মানুষ।

সৈয়দ আব্দুস সুলতান একজন সুপ্রতিষ্ঠিত আইনবিদ এবং সাহিত্যিক। তিনি ইতিপূর্বে পাকিস্তানের জাতীয় সংসদে বিরোধী দলের ডেপুটি লীডাররূপে তথ্য ও যুক্তিপূর্ণ ভাষণের খ্যাতি অর্জন করেন। তিনি সত্তরের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ প্রার্থীরূপে জাতীয় সংসদের সদস্য নির্বাচিত হন এবং পঁচিশে মার্চের অব্যবহিত পরে মুজিবনগরে এসে স্বাধীনতা সংগ্রামে নিজেকে নিয়োজিত করেন। যদিও স্ত্রী-পুত্র-কন্যা অর্থাৎ সমগ্র পরিবারই দেশের অভ্যন্তরে ফেলে এসেছেন তথাপি নিউইয়র্কে এবং অন্যত্র দ্বিধাহীন চিত্তে পাকিস্তানের জ্ঞাতসারে সারাক্ষণ কাজ করে যাচ্ছেন। কারো কারো জীবনে এমন সময় আসে যখন দেশ ছাড়া নিজের কথাও মনে পড়ে না। তিনি মুজিবনগর সরকার গঠিত শাসনতন্ত্র প্রণয়ন কমিটির সদস্য ছিলেন।

ডঃ মফিজ চৌধুরী কলকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে বিজ্ঞান অধ্যয়ন করেন। অবিভক্ত বাংলায় বিভিন্ন সরকারী প্রতিষ্ঠানে বিজ্ঞানীরূপে গুরুত্বপূর্ণ পদে ছিলেন। ছাত্রজীবন থেকেই সাহিত্যের প্রতি অনুরাগ ছিল এবং তাঁর কয়েকটি কবিতার বইও প্রকাশিত হয়েছে। সরকারী চাকরী ত্যাগ করে রাজনীতিতে যোগ দেন এবং সত্তরের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ প্রার্থীরূপে উত্তর বঙ্গ থেকে নির্বাচিত হন। আমি ছাত্র জীবনেই তাঁর ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসি এবং তাঁর সৌজন্য বিনয় নম্র ও সহজ-সরল ব্যবহারের জন্য অনেকের মত আমিও আকৃষ্ট হই। তিনিও প্রথম থেকেই মুজিবনগরে স্বাধীনতার জন্য কাজ করে যাচ্ছিলেন।

জাতীয় সংসদ সদস্য সেরাজুল হক সুপ্রতিষ্ঠিত আইনবিদ। ঢাকা হাইকোর্টে বহু দিন আমি তাঁকে সহজভাবে কঠিন আইনের ব্যাখ্যা করতে শুনেছি। আওয়ামী লীগ প্রার্থীরূপে তিনি জাতীয় সংসদে নির্বাচিত হয়েছেন। তাছাড়া তিনি বঙ্গবন্ধুর বিশ্বস্ত ও ঘনিষ্ঠ সহকর্মী। আওয়ামী লীগে তাঁর সক্রিয় ভূমিকা তাঁর দলের সিদ্ধান্ত বিশ্লেষণে সহায়তা করেছে এবং তিনি ঘটনা প্রবাহের উল্লেখ করে সিদ্ধান্তগুলোর যৌক্তিকতা তুলে ধরতেন।

প্রাদেশিক পরিষদ সদস্য ডাঃ আসহাবুল হক চুয়াডাঙ্গায় সুচিকিৎসকরূপে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। কিন্তু এটা তাঁর পরিচয় নয়। আমি যখন সে মাসে নিউইয়র্কে গিয়েছিলাম তখন অনেকেই তাঁকে দেখতে চেয়েছিলেন। তিনি তখুনি একটি রোমান্টিক ব্যক্তিত্বে পরিণত হয়েছেন। ছাব্বিশে মার্চের পরে তিনিই প্রথম রাজনৈতিক নেতা যার সাক্ষাৎকার মার্কিন টেলিভিশনে প্রচারিত হয়। ফলে সমগ্র যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডায় তিনি অচিরেই পরিচিতি লাভ করেন। নিরস্ত্র জনতার ওপর পাকিস্তান যেদিন বোমাবর্ষণ করে, তিনি তাঁর কোমরে দু'টি রিভলবার লাগিয়ে জীপের ওপরে বসে ছিলেন। ঠিক সে সময় একজন বিদেশী সাংবাদিক টেলিভিশনে সমগ্র পরিবেশটি ধরে রাখেন। তাঁর সম্বন্ধে আরো বিস্তারিত পরে বলব।

ফনিভূষণ মজুমদার এমন একজন মানুষ ছিলেন যাঁর সংস্পর্শে এলেই ভালবাসতে হতো। অন্তরকে উজ্জ্বল, নির্মল ও বিকশিত করার প্রার্থনা তাঁর জীবনে সফল হয়েছিল। সকল পার্থিব প্রলোভনের উর্ধ্বে একটি নির্লিপ্ত জীবনের অধিকারী ছিলেন তিনি। দেশকে ভালবেসে বহুবার কারাবরণ করেছেন। আওয়ামী লীগ প্রার্থীরূপে সত্তরের নির্বাচনে প্রাদেশিক পরিষদে নির্বাচিত হয়েছেন।

ফকির শাহাব উদ্দিন সমবন্ধে পূর্বেও বলেছি। তিনিও ঢাকা হাইকোর্টের লব্ধপ্রতিষ্ঠ আইনবিদ এবং বঙ্গবন্ধুর অতি আপন জন। দেশপ্রেমই তাঁকে বঙ্গবন্ধুর এত কাছে নিয়ে গিয়েছিল।

মুজিবনগর সরকার ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির অবিসমবাদী নেতা ও সর্বজন শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক মোজাফ্‌ফর আহমদকে প্রতিনিধিদলে যোগ দিতে সম্মত করতে পেরে দূরদৃষ্টির পরিচয় দিয়েছেন। স্বাধীনতা আন্দোলনটি যে কোন একটি বিশেষ রাজনৈতিক দলের একার নয় তাঁর অন্তর্ভুক্তি তারই বাস্তব প্রমাণ। এরও প্রয়োজন ছিল। তিনি তাঁর দল থেকে একা এসেছেন এটা উপলব্ধি করে আমি নিজে যতদূর সম্ভব তাঁর দিকে লক্ষ্য রেখেছি। তাঁর প্রশান্ত চিত্ত আমাদের স্বাভাবিক শ্রদ্ধা আকর্ষণ করত।

ডঃ আজিজুর রহমান মল্লিক কোন রাজনৈতিক দলের সদস্য নন। ইতিহাসবেত্তা হিসেবে এই শিক্ষাবিদ সম্মানের আসনে অধিষ্ঠিত। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর অবদান সর্বজনবিদিত। তিনি বহু কষ্টে এপ্রিল মাসে আগরতলায় পৌঁছান এবং মে মাসের প্রথম দিকে মুজিবনগরে যান। চট্টগ্রাম ত্যাগ করার পূর্বেও তিনি প্রতিরোধ প্রচেষ্টায় সক্রিয় অংশ নেন। স্বাধীনতা আন্দোলন শুরু হওয়ার পর নিউইয়র্কেই তাঁর সঙ্গে আমার প্রথম যোগাযোগ হয়। আন্দোলনের পূর্বে অবশ্যি ভাইস চ্যান্সেলারদের বিভিন্ন সম্মেলনে দেখা হয়েছে। তাছাড়াও তাঁর সঙ্গে আমার পরিচয় ছিল।

ডঃ রেহমান সোবহান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক। তিনি ২৫শে মার্চের অব্যবহিত পরেই ঢাকা ছেড়ে মুজিবনগরে চলে যান। এপ্রিলে লন্ডনে পৌঁছান। তখন থেকে মুজিবনগর সরকারের সঙ্গে সরাসরি পরামর্শ করে পাকিস্তানে সাহায্য প্রদানকারী সংস্থাগুলিকে পাকিস্তানে সাহায্য প্রদান বন্ধ করতে আপ্রাণ চেষ্টা করেন। তাছাড়া লন্ডনে ও নিউইয়র্কে আমার সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা করেছেন এবং আমাদের আয়োজিত

কয়েকটি সভায় যোগদান করেছেন। তিনি ওয়ার্ল্ড ব্যাংক, এইড কনসর্টিয়াম ইত্যাদি সংস্থার কাজে এত ব্যস্ত ছিলেন যে তাঁর পক্ষে প্রতিনিধিদলের সঙ্গে কাজ করার তেমন সময় হয়ে ওঠেনি। প্রতিনিধিদল নিউইয়র্কে আসার অনেক আগে থেকেই তিনি এ, এম, এ, মুহিত, হারুন-অর রশীদ প্রমুখের সহযোগিতায় অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে পাকিস্তানকে সমস্যার কবলে ফেলতে খুবই চেষ্টা করছিলেন। এ ক্ষেত্রে অর্থনীতিতে তাঁর প্রগাঢ় জ্ঞান ও বুৎপত্তি খুবই কাজে লেগেছে।

রাষ্ট্রদূত এ, এফ, এম আবুল ফতেহ'র কথা আমি আগেই লিখেছি। তিনি ইরাকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রদূত থাকাকালে ২৫ হাজার ব্রিটিশ পাউন্ড মুজিবনগরে পাঠিয়ে লন্ডনে চলে এসেছিলেন। ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতি নজরুল ইসলামের আহ্বানে লন্ডনে আসার অব্যবহিত পরেই মুজিবনগর চলে যান। ব্রিটিশ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের নিকট পঁচিশ হাজার ইরাকী দিনার মুজিবনগরে প্রেরণের ব্যাপারে পাকিস্তান দূতাবাস প্রতিবাদ করেছিল, কিন্তু তিনি তাতে ভ্রুক্ষেপ করেননি এবং কয়েকবার লন্ডনে যাতায়াত করেছেন। তাঁর মত অভিজ্ঞ রাষ্ট্রদূত ও নির্ভীক দেশপ্রেমিককে সহকর্মীরূপে পেয়ে আমরা আনন্দিত হই।

খুররম খান পন্নী ফিলিপিনসে পাকিস্তানের রাষ্ট্রদূত ছিলেন। একাত্তরের মাঝামাঝি সময়ে তিনি সেখান থেকে মুজিবনগর চলে যান এবং আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন। ম্যানিলায় থাকতেও তিনি লন্ডনে আমার সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলেন। ছাত্রজীবনে তাঁর মধ্যে যে উৎসাহ-উদ্দীপনা ও অনুপ্রেরণা দেখেছিলাম একাত্তরেও তা অক্ষুণ্ণ রয়েছে দেখে খুবই আনন্দিত হই। তাঁর বুদ্ধিমত্তা, কর্মতৎপরতা এবং সর্বোপরি দেশপ্রেম তাঁকে সকলের নিকট খুবই প্রিয় করে। ব্যক্তিগতভাবে আমি তাঁর নিকট আন্তরিক সহযোগিতা পেয়েছি। কর্মক্লান্ত দিনের শেষে তিনি প্রায়ই আমার কক্ষে এসে নানা বিষয়ে আলোচনা করতেন এবং পুরনো দিনের নানা গল্প করতেন। তাঁর পিতামহ ওয়াজেদ আলী খান পন্নী (চাঁদ মিঞা) ইংরেজের বিরুদ্ধে সংগ্রামে লিপ্ত হয়ে কারাবরণ করেছিলেন আর তিনি এসেছেন পাকিস্তানের লৌহনিগড় থেকে মুক্তি কামনায়।

সৈয়দ আনোয়ারুল করিম ভদ্র, বিনয়ী এবং সুরুচিসম্পন্ন মানুষ। তিনি নিউইয়র্কস্থিত পাকিস্তান দূতাবাসে উপস্থায়ী প্রতিনিধি ছিলেন। তিনি আনুষ্ঠানিকভাবে ৪ঠা আগষ্ট পদত্যাগ করেন। তবে তিনি মে মাসেই আমার সঙ্গে দেখা করে পাকিস্তানের পদ যথাসময়ে ত্যাগ করবেন বলে জানিয়েছিলেন। সে সময়ে তিনি আফ্রিকায় একটি সম্মেলনে পাকিস্তানের খরচে যাচ্ছিলেন এবং সেখানে আমাদের হয়ে কাজ করেছিলেন। এ, এম, এ মুহিতের কথা আগেই বলেছি। তিনি একজন কর্মচঞ্চল মানুষ এবং আনুষ্ঠানিকভাবে পদত্যাগ ৪ঠা আগষ্ট করলেও তিনি একরূপ প্রকাশ্যেই শুরু থেকে স্বাধীনতা আন্দোলনের পক্ষে কাজ করে যাচ্ছিলেন। ওয়াশিংটনে আন্দোলনের কাজে তাঁর উপস্থিতির এত প্রয়োজন ছিল যে, নিয়মিতভাবে তাঁর পক্ষে আমাদের প্রতিনিধিদলের সঙ্গে কাজ করা সম্ভব হয়নি। তবে তিনি মাঝে মাঝেই নিউইয়র্কে আসতেন।

এ, এইচ মাহমুদ আলীর প্রাণশক্তির কথা আগেই বলেছি। তিনি ২৫শে এপ্রিল পাকিস্তানের সঙ্গে সকল সম্পর্ক ছিন্ন করেন। সেই থেকে তিনি ও তাঁর স্ত্রী শাহীন মাহমুদ আলী

দৃঢ়প্রত্যয়ের সঙ্গে সকল বাধা অতিক্রম করে চলেছেন। তাঁদের নির্ভীকতা ও দেশবাসীর প্রতি আস্থা সকলের প্রীতি ও শ্রদ্ধা অর্জন করেছে। মাহমুদ আলী জীবনের প্রতিটি সচেতন মুহূর্ত দেশকে উৎসর্গ করেছেন।

পয়ষট্টি

আমেরিকায় আমাদের বেশ কয়েকজন বন্ধু ছিলেন। তাঁরা নিজ নিজ কর্মক্ষেত্রে ও অঞ্চলে আমাদের আন্দোলনে সক্রিয় অংশ নিচ্ছিলেন। নিউইয়র্কে যাঁরা আমাদের সঙ্গে প্রথম থেকেই প্রতিনিয়ত সম্পর্ক রেখেছেন, সাহায্য করেছেন তাঁদের মধ্যে বিশেষ করে মনে পড়ে ডঃ হোমার জ্যাক, অধ্যাপক এ্যালবার্ট ব্লস্টাইন, রিচার্ড জীফ এবং জন সলসবার্গের কথা।

হোমার জ্যাক খুবই শান্তিপ্রিয় মানুষ। তাঁর আচার-ব্যবহারে, কথাবার্তায় শান্তির প্রতি অকুণ্ঠ নিষ্ঠা ফুটে ওঠে। বাংলাদেশের মানুষের দুর্দশা তাঁকে গভীরভাবে নাড়া দিয়েছিল। তিনি পঁচিশে মার্চের গণহত্যার খবর পেয়েই দু'বার ভারতে শরণার্থী শিবিরে ছুটে গিয়েছিলেন। তিনি ওয়ার্ল্ড কনফারেন্স অব রিলিজিয়ন ফর পীসের জেনারেল সেক্রেটারী। মে মাসেই তাঁর সঙ্গে মাহমুদ আলী আমাকে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন। তখন থেকে তিনি বিভিন্ন সময়ে পত্র-পত্রিকায় আমাদের সমর্থনে যে বিবৃতি দিতেন সেগুলো নিয়মিতভাবে গোরিং স্ট্রীটের অফিসে পাঠাতেন। আমি নিউইয়র্কে পৌঁছানোর অল্পদিন আগে, অর্থাৎ সেপ্টেম্বরের প্রথম দিকে অল্প সময়ের জন্য তিনি ঢাকায় গিয়েছিলেন এবং গিয়ে উপলব্ধি করে এসেছেন যে স্বাধীনতা ছাড়া এই সাড়ে সাত কোটি মানুষের মুক্তির আর কোন উপায় নেই।

এ্যালবার্ট ব্লস্টাইন রাটগারস বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের প্রধান। আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন এই আইনবিদ আইন বিষয়ে অনেক গ্রন্থ রচনা করে আইনের জগতে খ্যাতি অর্জন করেছেন। তিনি শাসনতান্ত্রিক আইনের বিশেষজ্ঞ বলে পরিচিত। শাসনতান্ত্রিক অধিকারসমূহের নিদারুণ লঙ্ঘন এবং নির্লজ্জ অবমাননার কথা তাঁকে স্বভাবতঃই অস্থির করে তোলে এবং তিনিও ছুটে যান ভারতের শরণার্থী শিবিরে। ফেরার পথে লন্ডনে আমাদের গোরিং স্ট্রীটের অফিসেও এসেছিলেন। সে সময় তাঁর সঙ্গে প্রথম আলাপেই আমার বেশ বন্ধুত্ব হয়। সেপ্টেম্বরে আমাদের প্রতিনিধি দল নিউইয়র্কে এলে তিনি প্রায়ই আমাদের সঙ্গে দেখা করতে আসতেন। বিভিন্ন সংবাদ সংস্থা ও সাংবাদিকদের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ আমাদের বেশ কাজে এসেছিল। তাঁর অফিসকে আমাদের অফিস মনে করতে অনুরোধ করতেন।

রিচার্ড জীফ একজন আইনজীবী। তিনি নিউইয়র্কের একটি বিখ্যাত আইন ফার্মের সদস্য। মে মাসেই মাহমুদ আলী আমাকে তাঁর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন। সেবারেই আমি তাঁদের

অফিসে গিয়েছিলাম। আমাদের আন্দোলনের মাত্র দেড় মাস অতিবাহিত হয়েছে, আমাদের সংগঠন গড়ে উঠছে মাত্র। সেই সময়ে তিনি তার যৌবনসুলভ কর্মোদ্যেম নিয়ে বাংলাদেশের নিপীড়িত মানুষের সাহায্যে এগিয়ে আসেন এবং মাহমুদ আলীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ স্থাপন করেন। সে সময় তাঁর অফিসকে মাহমুদ আলীও বাংলাদেশের অফিসরূপে ব্যবহার করেন। সেদিনকার সে সাহায্যের খুবই প্রয়োজন ছিল। আমার মে মাসে এবং সেপ্টেমবর মাসে নিউইয়র্কে আগমনের পর রিচার্ড জীফের সহায়তায় অনেকগুলো টেলিভিশন ও রেডিও সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা করা হয়। শুধু আয়োজন করেই ক্ষান্ত হতেন না, তিনি অনেকদিন আমার হোটেলে এসে টেলিভিশনের ষ্টুডিওতে আমাকে তাঁর গাড়ীতে করে নিয়ে গেছেন।

জন সলসবার্গ একজন উৎসাহী যুবক, তিনিও আইনবিদ। নিউইয়র্কে ইন্টারন্যাশনাল কমিশন অব টুরিস্টস-এর প্রতিনিধি। এই আন্তর্জাতিক আইন সংস্থার প্রধান কার্যালয় জেনেভায় অবস্থিত। আমার জেনেভা ভ্রমণের সময় এই সংস্থার সেক্রেটারী জেনারেল ম্যাকডারমোটের সঙ্গে সাক্ষাৎকার ও তাঁর তৎপরতার কথা উল্লেখ করেছি। সলসবার্গ এই কমিশনের নিউইয়র্ক অফিসের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী ছিলেন। তাঁর এবং হোমার জ্যাকের অফিস একই অট্টালিকায় অবস্থিত ছিল। সলসবার্গ আমাদের নানাভাবে সাহায্য করেছেন। সেজন্য আমরা তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ। আমাদের দেশের মানুষের নিপীড়নের সংবাদে তাঁর মধ্যে যে উৎকণ্ঠা দেখেছি তা আমাদের স্বভাবতঃই অভিভূত করেছে।

উনত্রিশে সেপ্টেমবর সকাল এগারটায় WOR Radio-তে আমার আনুষ্ঠানিক সাক্ষাৎকার হয়। সে সময়ে রেডিও ষ্টেশনে সৈয়দ আবদুস সুলতান এবং মাহমুদ আলী উপস্থিত ছিলেন। এই সাক্ষাৎকারে আমি মুজিবনগর সরকার কর্তৃক প্রতিনিধিদলের আগমনের উদ্দেশ্য এবং মুক্তিযুদ্ধের অগ্রগতির কথা তুলে ধরি।

এবারে নিউইয়র্কে আমাদের প্রতিনিধিদল বা আমার আগমনের বা অব্যবহিত পরে সংগ্রামের সার্বিক পরিস্থিতি সম্বন্ধে কিছুটা বলতে চাই। জয় সুনিশ্চিত এ কথা মনের দিক থেকে আমি চিরদিন জেনে এসেছি। এখন মনে হচ্ছে পূর্ণ বিজয়ের পূর্ব লক্ষণ দেখতে পাচ্ছি, বিজয় অধ্যায়ের সূচনা হয়েছে, চার দিকে কর্মচাঞ্চল্য, একাগ্রতা ও নিষ্ঠার খবর আসছে। প্রতিদিন বুঝতে পারছি আমরা পরিত্যক্ত নই, একা নই, বিশ্বজনমত আমাদের সমর্থনে, বিশ্ববিবেক উৎকন্ঠিত–উচ্চকিত। দিকে দিকে আজ প্রার্থনা ঃ বাংলার নিপীড়িত মানুষের জয় হোক, আত্মশক্তিতে উদ্বুদ্ধ এই জাতির কল্যাণ হোক। মরণ সংগ্রামে লিপ্ত বাঙালী মরণজয়ী হোক।

সতেরই সেপ্টেম্বর প্যারিস থেকে দেয়া এক বিবৃতিতে সুবিখ্যাত ফরাসী চিন্তাবিদ ও দার্শনিক আঁদ্রে মালরো উনসত্তর বৎসর বয়সে বজ্রকন্ঠে বলেছেন,"আমি পূর্ব পাকিস্তানে যেয়ে বাঙালী সমর নায়কের আদেশ অনুসারে তাদের স্বাধীনতা সংগ্রামে যোগ দিতে প্রস্তুত।" খবরটি ১৮-ই সেপ্টেমবর লন্ডনের দৈনিক টাইমস এবং অন্যান্য পত্রিকায় প্রকাশিত হওয়া মাত্রই আমি বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে কৃতজ্ঞতা এবং অভিনন্দন জানাই। ইচ্ছা ছিল ব্যক্তিগতভাবে শ্রদ্ধা জ্ঞাপনার্থে প্যারিসে চলে যাব ; কিন্তু ইতিমধ্যে বাংলাদেশ প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব দেয়ার অনুরোধ পাওয়ায় নিউইয়র্কে চলে আসতে হয়।

শিল্পচর্চার সঙ্গে সঙ্গে আঁদ্রে মালরো যুদ্ধও করেছেন নানা সময়ে নানা প্রয়োজনে। তিনি স্পেন এবং চীনেও গৃহযুদ্ধের সময় উপস্থিত ছিলেন। তিনি ফ্রান্সেও প্রতিরক্ষা বাহিনীতে যোগ দিয়েছিলেন এবং তিনি দ্যগলের মন্ত্রিসভার ইনফরমেশন মিনিষ্টার ছিলেন।

ঐ তারিখেই লন্ডনের বিখ্যাত দৈনিক পত্রিকা গার্ডিয়ানে মার্টিন উল্লাকটের একটি উৎসাহোদ্দীপক প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়। এতে তিনি নিজে আমাদের গেরিলা যোদ্ধাদের একটি আক্রমণের সময় তাদের সঙ্গে ছিলেন সেকথা উল্লেখ করে তাদের রণনৈপুণ্যের ভূয়সী প্রশংসা করেন।

২২শে সেপ্টেম্বরের হেরাল্ড ট্রিবিউনের একটি খবরে পাকিস্তানের দুর্বলতার প্রকাশ ঘটে। তাতে বলা হয়েছে যে, রাজনৈতিক সমাধানের জন্য ইয়াহিয়া খান শেখ মুজিবের সঙ্গে আলোচনা করতে চাচ্ছেন। আমরা দৃঢ়তার সঙ্গে জানতাম শেখ মুজিব, বাংলাদেশ সরকার এবং বাংলাদেশের জনগণ পূর্ণ স্বাধীনতা ব্যতীত কোন সমাধানে রাজী হবেন না। সে প্রশ্ন ওঠেই না। এই সংবাদটির একটি মাত্র বিষয় উল্লেখযোগ্য, সেটি হল, পাকিস্তানের দুর্বলতার প্রমাণ।

২৪শে সেপ্টেম্বরের গার্ডিয়ানের একটি খবরে বলা হয় যে, ব্রিটিশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেছেন যে, তিনি জাতিসংঘের সেক্রেটারী জেনারেলের সঙ্গে এবং অন্যান্য পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের সঙ্গে বাংলাদেশ নিয়ে আলোচনা করবেন এবং কেবলমাত্র শরণার্থীদের সাহায্য করে এই অবস্থার সমাধান করা যাবে না। তার জন্য চাই রাজনৈতিক সমাধান এবং সে সমাধান অবশ্যই জাতীয় সংসদে বাংলাদেশের নির্বাচিত সদস্যদের নিকট গ্রহণযোগ্য হওয়া চাই।

২৭শে সেপ্টেম্বরের গার্ডিয়ানে প্রকাশিত একটি সংবাদ থেকে যথেষ্ট আশার খবর পাওয়া যায়। এতে বলা হয়েছে যে, পূর্ব পাকিস্তান সমস্যার সমাধান না হওয়া পর্যন্ত পাকিস্তানকে কোনরূপ অর্থ সাহায্য করা উচিত হবে কি না, সেটা বিবেচনা করে দেখতে হবে।

ঠিক এই সময়টায় শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী বাংলাদেশ এবং অন্যান্য বিষয় নিয়ে আলোচনার জন্য সোভিয়েট ইউনিয়নে গমন করেন।

তাছাড়া ২৭শে সেপ্টেম্বরেই জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী শরণ সিংহ বাংলাদেশের অবস্থা বর্ণনা করে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ দেন। তিনি বাংলাদেশের গুরুতর সমস্যা সৃষ্টির জন্য ন্যায়সঙ্গতভাবেই পাকিস্তানকে দায়ী করেন। তিনি বলেন যে, পূর্ব পাকিস্তানে পশ্চিম পাকিস্তানের সামরিক শাসকগোষ্ঠী সন্ত্রাসের রাজ্য স্থাপন করেছে। তাঁর বক্তৃতায় বাধা দিয়ে পাকিস্তানের রাষ্ট্রদূত আগাশাহী বৈধতার প্রশ্ন তোলেন। আগাশাহী বলেন, জাতিসংঘে কোন দেশের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে আলোচনা হতে পারে না। এই সময় সৌদি আরবের রাষ্ট্রদূত বলেন, তিনি এই বৈধতার প্রশ্নে মনে করেন যে, ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রীকে তাঁর বক্তৃতা দিতে বাধা দেয়া যায় না। তবে তাঁর বক্তৃতার যে অংশে পূর্ব পাকিস্তানের উল্লেখ আছে সে অংশ বাদ দিলে কোনরূপ আপত্তির কারণ থাকবে না। তিনি ভারতে শরণার্থীদের কথা বলতে পারবেন কিন্তু পূর্ব পাকিস্তানের অবস্থা সম্বন্ধে আলোচনা বাদ দিলে ভাল হয়। সে বছর জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের সভাপতি ছিলেন ইন্দোনেশিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী

আদম মালিক। তিনি রাষ্ট্রদূত জাগিল বারুদির কথা শরণ সিংহ মেনে নিতে রাজি আছেন কিনা জানতে চান। এর উত্তরে শরণ সিংহ বলেন, "আমি আমার বক্তব্য অত্যন্ত সর্তকতার সঙ্গে লিখেছি। পাকিস্তানে নিপীড়ন এবং নির্যাতনের ফলে যখন অন্য রাষ্ট্রকে নিতান্তই অসুবিধায় পড়তে হয় তখন কিছুতেই বলা চলে না যে, সেটি একটি আভ্যন্তরীণ ব্যাপার। পাকিস্তানের সীমহীন নিপীড়ন ও নির্যাতনের ফলে বিষয়টি আন্তর্জাতিক সমস্যায় পরিণত হয়েছে এবং এর সমাধান করার পবিত্র দায়িত্ব জাতিসংঘকে অবশ্যই বহন করতে হবে। একে আভ্যন্তরীণ ব্যাপার বললে আন্তর্জাতিক আইনকে উপহাস করা হবে। কেননা, পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠীর কার্যকলাপের দ্বারা সৃষ্ট অবস্থায় বিশ্বের বহু রাষ্ট্রকেই বাংলাদেশের শরণার্থীদের সাহয্যের জন্য অর্থ বরাদ্দ করতে হচ্ছে।" তিনি এই সমস্যার সমাধানকল্পে অবিলম্বে শেখ মুজিবের মুক্তির দাবী জানান। তিনি বলেন যে, পূর্ব পাকিস্তানের যে কোন সমস্যার সমাধান করতে হলেই সেটিকে শেখ মুজিব এবং অন্যান্য নির্বাচিত সদস্যদের নিকট গ্রহণযোগ্য হতে হবে। তিনি শেখ মুজিবের আশু মুক্তি দাবী করেন। তিনি বলেন, "বাংলাদেশে অত্যাচারের ফলে এক কোটি মানুষ দেশত্যাগ করে ভারতে আশ্রয় নিয়েছে। এর জন্য ভারতে সামাজিক এবং অর্থনৈতিক সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে। এবং ভারতের বহু বিদ্যায়তন বন্ধ করে দিতে হয়েছে এবং হাসপাতালগুলো হয়েছে জনাকীর্ণ। এরপরেও একে আভ্যন্তরীণ ব্যাপার বলা হাস্যকর ছাড়া আর কিছু নয়।"

এদিন এই আলোচনার সময় বাংলাদেশ প্রতিনিধিদলের প্রায় সকল সদস্যসহ আমি দর্শকের গ্যালারিতে উপস্থিত ছিলাম। আগাশাহি শরণ সিংহকে বাধা দেয়া এবং শরণ সিংহ কোনরূপ বিচলিত না হয়ে শান্ত ও দৃঢ়প্রত্যয়ের সঙ্গে উত্তর দেয়ায় আমরা স্বভাবতই আনন্দিত হই।

সেদিনকার অধিবেশন শেষে সৈয়দ আব্দুস সুলতান, এ, এইচ মাহমুদ আলী এবং আমি শরণ সিংহের হোটেলে যেয়ে তাঁকে ধন্যবাদ জানিয়ে আসি।

২৯শে সেপ্টেম্বরের পত্রিকাগুলোতে শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধীর সম্মানার্থে সোভিয়েত সরকার কর্তৃক প্রদত্ত ভোজসভার বিবরণী বের হয়। তাতে সোভিয়েত প্রধানমন্ত্রী কোসিগিন খুব শক্ত ভাষায় বাংলাদেশের সমস্যার রাজনৈতিক সমাধান কামনা করেন। লন্ডনের টাইমস পত্রিকায় বলা হয়, "কোন সোভিয়েত নেতা ইতিপূর্বে এত শক্ত ভাষায় এ বিষয়ের উল্লেখ করেননি।" সোভিয়েত প্রধানমন্ত্রী বলেন, "পাকিস্তানের কার্যকলাপ একেবারেই সমর্থনীয় নয়। কেননা, এই কার্যকলাপের ফলেই প্রায় এক কোটি লোক দেশ, বাড়ী-ঘর, জায়গা-জমি, বিষয়-সম্পত্তি ত্যাগ করে ভারতে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছে। অত্যাচারের ফলে পূর্ব পাকিস্তান আবাস অযোগ্য হয়ে গিয়েছে।" প্রধানমন্ত্রী কোসিগিন আরো বলেন যে, "সকলের ওপরে পাকিস্তানের কর্তব্য এই, এমন অবস্থার সৃষ্টি করা যাতে করে শরণার্থীগণ বিনা ভয়ে দেশে ফিরতে পারে এবং বিশ্বাস সৃষ্টি করা যে ভবিষ্যতেও তাদের ওপর অত্যাচার হবে না।"

উত্তরে শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী বলেন, "বাংলাদেশের ক্রমবর্ধমান যন্ত্রণা পৃথিবীর অনেক রাষ্ট্রকে এখনও স্পর্শ করেনি। এ ব্যাপারে আমরা যথাসম্ভব নিজেদের সংযত রেখেছি। আমরা আশা করবো পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী এই সমস্যার যুক্তিসঙ্গত এবং গ্রহণযোগ্য সমাধানের

ব্যবস্থা করে বিশ্বশান্তি রক্ষা করবেন।”

মিসেস গান্ধীর সফরের পরে একটি বিবৃতি (কেমিউনিকে) প্রকাশিত হয়। উক্ত কমিউনিকেও বাংলাদেশের সমস্যার রাজনৈতিক সমাধানের উপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে বলা হয় যে, সমাধানটি পূর্ব বঙ্গের মানুষের ইচ্ছানুযায়ী করতে হবে। তাদের মন থেকে সকল প্রকার শঙ্কার অবসান করে মানুষের অধিকারকে নিশ্চিত করতে হবে।

৩০শে সেপ্টেম্বর গার্ডিয়ান-এ প্রকাশিত একটি খবরে বলা হয় যে, ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী বাংলাদেশ সম্বন্ধে সোভিয়েত ইউনিয়নের পূর্ণ সমর্থনের আশ্বাস নিয়েই দেশে ফিরে এসেছেন।

১লা অক্টোবরের ডেইলি টেলিগ্রাফ-এ বাংলাদেশ মুক্তিবাহিনীর কর্মতৎপরতার উল্লেখ করা হয় এবং তারা পাকিস্তানী সৈন্যদের পরাজিত করে তাদের আধুনিক অস্ত্র ব্যবহার করছে—এ কথাও বলা হয়। এসব খবরে আমি এবং আমার সহকর্মীগণ নতুন করে অনুভব করি, “দিন আগত ঐ।”

বাংলাদেশে এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আমাদের জয়যাত্রা যখন এরূপ একটি অনুপ্রেরণাময় পরিস্থিতিতে পৌঁছেছে সেই সময় অর্থাৎ ১লা অক্টোবর আমাদের প্রতিনিধিদলের একটি পূর্ণাঙ্গ সাংবাদিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনটি হয়েছিল হোমার জ্যাকের অফিসের অট্টালিকাতেই অবস্থিত চার্চ সেন্টারের একটি বড় হলে। হোমার জ্যাকের অফিসটি ৭৭৭ নম্বর ইউ, এন প্লাজার অর্থাৎ জাতিসংঘের একবারে বিপরীত দিকে। এই সম্মেলনে প্রতিনিধিদলের প্রায় সকল সদস্যই উপস্থিত ছিলেন। জাতিসংঘের এত কাছে অনুষ্ঠিত হওয়ায় সাংবাদিকদের যোগদানের খুব সুবিধা ছিল। হোমার জ্যাকের সহায়তায় এই হলটি পাওয়া গিয়েছিল। বাংলাদেশ সম্বন্ধে জানার আকাঙ্ক্ষাবশতঃ আমাদের সম্মেলনটিতে সাংবাদিকদের সমাবেশ খুবই সন্তোষজনক হয়েছিল।

প্রশ্নোত্তরের পূর্বে সাংবাদিকদের সম্বোধন করে আমি বলি, “পাকিস্তানের জন্মলগ্ন থেকে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে আমাদের শোষণ করা হয়, করা হয় রাজনৈতিক ক্ষেত্রে দমন। আইনের মাধ্যমে তেইশ বছর এই অবস্থার অবসান প্রচেষ্টা হয়েছে ব্যর্থ। সত্তরের নির্বাচনের পর আমাদের প্রত্যাশা ছিল জনগণ আকাঙ্ক্ষিত শাসনতন্ত্র। কিন্তু, যখন পশ্চিম পাকিস্তানের সামরিক জান্তা দেখতে পেল ১৬৯টি আসনের মধ্যে শেখ মুজিব পেয়েছেন ১৬৭টি আসন, শুরু হলো গণ-আকাঙ্ক্ষা ব্যর্থ করার ষড়যন্ত্র। একাত্তরের তেসরা মার্চ আহুত জাতীয় সংসদ অধিবেশন বাতিল করা হলো। শেখ মুজিবকে ইয়াহিয়া খানের সঙ্গে আলোচনায় ব্যস্ত রেখে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে সৈন্য আমদানী শুরু হলো। কিন্তু আলোচনার অবসানের কোন ঘোষণা না করেই পশ্চিম পাকিস্তানের সামরিক বাহিনীকে ধর্ষণ, লুট এবং অগ্নিসংযোগের কাজে ছেড়ে দেয়া হলো। স্তব্ধ ও বেদনাহত বিশ্ববাসী দেখতে পেল পঁচিশে মার্চের রাতে ও তারপরে অনুষ্ঠিত মানব ইতিহাসের একটি জঘন্যতম গণহত্যা। এর ভেতর দিয়েই বঙ্গবন্ধু ঘোষণা করেছেন স্বাধীনতা, আনুষ্ঠানিকভাবে সরকার গঠিত হয়েছে ১৭ই এপ্রিল।”

উপস্থিত সাংবাদিকদের স্মরণ করিয়ে দিলাম, “গণহত্যার ফলে এক কোটি বাঙালী

প্রতিবেশী ভারতে আশ্রয় নিয়েছে। এদের অবর্ণনীয় দুঃখকষ্ট সর্বজনবিদিত। বাংলাদেশ সরকার বিশ্ব সরকারসমূহের কাছে শরণার্থীদের মুক্তহস্তে সাহায্যের জন্য কৃতজ্ঞ। কিন্তু উপসর্গের চিকিৎসায় লাভ নেই। বিশ্ব শান্তির প্রয়োজনে চাই মূল রোগের অবলুপ্তি। রোগ এখানে ইয়াহিয়া খানের সামরিক বাহিনীর উপস্থিতি। শান্তি স্থাপন এবং বিশ্ব শান্তির প্রতি হুমকির অবসান কামনা করে বাংলার পবিত্র মাটি থেকে তাদের অপসারণ চাই।

আমাদের প্রিয় নেতা শেখ মুজিবুর রহমানকে আজ অবৈধ কারা যন্ত্রণা ভোগ করতে হচ্ছে। তাঁর আশু মুক্তি সকল শান্তিকামী মানুষের দাবী। তাঁর বিন্দুমাত্র ক্ষতি করলে বাঙালী জাতি চিরকালের জন্য ক্ষমা ভুলে যাবে।

আমরাও বলতে পারি এত অল্প সময়ে এত বিপুল সংখ্যক মানুষ আর কখনো স্বাধীনতার জন্য আত্মাহুতি দেয়নি।"

রণাঙ্গনের বিবরণী দিয়ে বললাম, "বাঙালীর জয়যাত্রা চলেছে প্রতিটি রণক্ষেত্রে। চলাচলের রাস্তা হয়েছে বন্ধ। জাহাজ হয়েছে নিমজ্জিত, ইয়াহিয়া খানের প্রশাসন আজ ভগ্নপ্রায়। আমাদের যুদ্ধরত সংগ্রামী ভাইদের জানাই সশ্রদ্ধ সালাম। "উই হ্যাভ রিচড এ পয়েন্ট অব নো রিটার্ণ।"

বাংলাদেশের সমস্যার সমাধান তিনটি পূর্বশর্তের ওপর নির্ভরশীল।

১। গণ-প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশকে স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্ররূপে স্বীকৃতি।
২। অবিলম্বে এবং বিনাশর্তে গণতান্ত্রিক পন্থায় নির্বাচিত বাংলাদেশের নেতা শেখ মুজিবুর রহমানের মুক্তি।
৩। ইয়াহিয়া খানের হানাদার বাহিনীকে বাংলার মাটি থেকে অবিলম্বে অপসারণ।

বাংলাদেশ ও পশ্চিম পাকিস্তানের ভিন্নতার উল্লেখ করে বললামঃ "বাংলাদেশ পশ্চিম পাকিস্তান থেকে এক হাজার মাইলেরও বেশী দূরে অবস্থিত। আমাদের ভাষা, অভ্যাস, চিন্তাধারা, আদর্শ এবং সংস্কৃতি ভিন্ন। অতএব জাতিসংঘের সংজ্ঞায় আমরা একটি সম্পূর্ণ ভিন্ন জাতি। প্রত্যেক জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার জাতিসংঘের সনদে ঘোষিত হয়েছে। একটি স্বতন্ত্র জাতিরূপে সেই ধারা অনুসারে বাঙালী জাতি স্বাধীনতা ঘোষণা করেছে। জাতিসংঘের কর্তব্য ইয়াহিয়া খানের নিষ্ঠুর নিপীড়নের বিরুদ্ধে আমাদের সাহায্যে এগিয়ে আসা।

বাংলাদেশের স্থিতিশীলতা সন্দেহাতীত। অনেক বছর থেকেই আমাদের অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রার তিন-চতুর্থাংশ ব্যয়িত হয় পশ্চিম পাকিস্তানে। এবার থেকে আমাদের অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রা আমাদেরই থাকবে এবং তাই দিয়ে আমরা সমৃদ্ধিশালী বাংলাদেশ গড়ে তুলব।"

আমাদের রাজনৈতিক দর্শন ব্যাখ্যা করতে যেয়ে বললাম, "বাংলাদেশে গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্র সুপ্রতিষ্ঠিত হবে। এই রাজ্যে হিন্দু মুসলমান খৃষ্টান বৌদ্ধ—অর্থাৎ সকল সম্প্রদায়ের লোক ধর্মীয় এবং অন্যান্য অধিকার সমভাবে ভোগ করবে।

আমরা গণহত্যা বন্ধ করার জন্য পাকিস্তানের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য আবেদন জানাই। আমরা বিশ্বাস করি জাতিসংঘ মানবাধিকার লঙ্ঘন, ঔপনিবেশিকতা,

সামাজিক বৈষম্যের অবসান ঘটাবে বাংলাদেশে। আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের জয় সুনিশ্চিত।

বিশ্ববাসীর কাছে বাংলার বাণী পৌঁছে দেয়ার জন্যই এই প্রতিনিধিদলের আগমন। এতে রয়েছেন একটি রাজনৈতিক দলের সভাপতি, সংসদের আটজন নির্বাচিত সদস্য, দু'জন রাষ্ট্রদূত, দু'জন ভাইস চ্যান্সেলর, একজন বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ এবং অভিজ্ঞ কূটনীতিবিদগণ।

আমরা আশা করছি অদূর ভবিষ্যতে বিশ্বের রাষ্ট্রসমূহ আমাদের স্বীকৃতি দেবে এবং জাতিসংঘের সদস্যরূপে আমরা বিশ্ব সংস্থায় যোগদান করব।"

এই সম্মেলনটি খুবই সাফল্যমন্ডিত হয়েছিল। আমেরিকার সাংবাদিকদের প্রশ্ন থেকে বন্ধুত্বপূর্ণ মনোভাব প্রকাশিত হয়। এই সম্মেলনের বিবরণী আমেরিকায় এবং অন্যান্য দেশে ছাপা হয়।

আমাদের এই প্রেস কনফারেন্সের পরে যুক্তরাষ্ট্রে প্রবাসী বাঙালীদের মধ্যে উৎসাহ ও কর্মোদ্যম খুবই বেড়ে যায়। সব সংগ্রামেই সুসংহত প্রচেষ্টার নিদর্শন উদ্দীপনা বৃদ্ধি করে। আমি এই সময়ে আমেরিকার নানা প্রান্ত থেকে তাঁদের কাছে যাবার জন্য টেলিফোন পেতে থাকি। ইংল্যান্ডে কয়েকটি সভায় যোগদান এবং কয়েকটি বিশেষ কাজের জন্য আমাকে লন্ডনে ফিরতে হচ্ছিল। প্রতিনিধিদলকে নিউইয়র্কে রেখে কয়েকদিনের জন্য আমাকে লন্ডনে আসতে হয়। তবে মে মাসে দেখা হওয়ার পরই রেজাউল হাসান ও অন্যান্য সহকর্মী হার্ভাড এবং এম আই টি, ইয়েল ইত্যাদি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকদের সঙ্গে আমার আলোচনার ব্যবস্থা করেছিলেন। ঠিক হল, লন্ডন থেকে ফিরে এসে সেসব বিশ্ববিদ্যালয়ে যাব। ইতিমধ্যে ওয়াশিংটন থেকে আমাদের বাঙালী কূটনীতিবিদদের অনেকেই এসেছিলেন। তাঁদের সঙ্গে ঠিক হল ফিরে এসেই ওয়াশিংটনে যেতে হবে।

এ সময় ডঃ এফ, আর খান আমাদের সঙ্গে টেলিফোনে প্রত্যহ যোগাযোগ রক্ষা করেছেন এবং এত ব্যস্ততার মধ্যে এসে দেখাও করেছেন।

ওয়াহাইয়ো স্টেট ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক আমিনুল ইসলামও এসেছিলেন আমাদের সঙ্গে দেখা করে সাক্ষাতে আন্দোলন পরিচালনা কার্যক্রম নির্ধারণের জন্য। তিনি গত মে মাসেও আমার সঙ্গে দেখা করেছিলেন এবং টেলিফোনে ঘন ঘন যোগাযোগ রাখতেন। সেপ্টেম্বরে আমি আবার এলে তিনি দেখা করে গত কয়েক মাসের কার্যবিবরণী দিলেন এবং জানালেন যে, সিনেটর, সাংবাদিক এবং অন্যান্য প্রতিপত্তিশালী আমেরিকানদের সঙ্গে দেখা করে বাংলাদেশের অবস্থা জানাচ্ছিলেন। ধীরস্থির শান্ত প্রকৃতির এই শিক্ষাবিদ দেশের জন্য নিরন্তর কাজ করে যাচ্ছিলেন। তিনি আমাকে তাঁর বিশ্ববিদ্যালয়ে যাওয়ার জন্যও অনুরোধ করেন। তাঁর সহকর্মীগণও সারাক্ষণ কাজ করে যাচ্ছিলেন। আমেরিকার একেকটি অঞ্চলে অল্পসংখ্যক বাঙালী তাঁদের এলাকায় আমেরিকানদের মধ্যে বাঙালী নিপীড়নের কাহিনী যথাযথভাবে তুলে ধরে তাঁদের মধ্যে সহানুভূতি জাগ্রত করতে সক্ষম হন। এভাবেই আমেরিকার জনগণ আমাদের প্রতি সহমর্মিতা ও সমর্থন জ্ঞাপন করেন।

পরিশিষ্ট

সংক্ষিপ্ত ঘটনাপঞ্জী
সেপ্টেম্বর-ডিসেম্বর ১৯৭১

সেপ্টেম্বর ১-৬ : নরওয়েতে অবস্থান।

সেপ্টেম্বর ১ : অসলো যাত্রা – সফরসঙ্গী রাজিউল হাসান রঞ্জু।

সেপ্টেম্বর ২ : নরওয়ের প্রধান বিচারপতি পিয়ের অড-য়ের সাথে সাক্ষাৎ।

———— অসলো রোটারী ক্লাবের সভায় প্রধান অতিথির ভাষণ।

———— নরওয়ের পার্লামেন্টের আন্তর্জাতিক কমিটির সদস্যদের সঙ্গে বাংলাদেশ সম্পর্কে আলোচনা।

সেপ্টেম্বর ৩ : অসলোর মেয়রের সাথে সাক্ষাৎ।

———— নরওয়ের পররাষ্ট্র দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী স্টলটেন বার্গের সঙ্গে বাংলাদেশের পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা।

সেপ্টেম্বর ৪-৫ : অসলোর বিভিন্ন সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের সদস্যদের সঙ্গে বাংলাদেশ পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা।

সেপ্টেম্বর ৬ : সাংবাদিক সম্মেলনে বাংলাদেশের সংগ্রামের উদ্দেশ্য, বর্তমান পরিস্থিতি এবং সংগ্রামের অগ্রগতি সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য পেশ।

———— অসলো বিশ্ববিদ্যালয়ের এক বিরাট ছাত্র সমাবেশে ভাষণ দান।

সেপ্টেম্বর ৭ : অসলো থেকে স্টকহোম যাত্রা।

———— নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্ত অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক গুনার মীরডালের সাথে সাক্ষাৎ এবং বাংলাদেশ আন্দোলনের আদর্শ ও উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা। বিচারপতি চৌধুরী অধ্যাপক মীরডালকে স্থানীয় বাংলাদেশ এ্যাকশন কমিটির চেয়ারম্যান পদ গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ জানান। অধ্যাপক মীরডাল এতে সানন্দে সম্মত হন।

———— সুইডিশ সোস্যালিষ্ট পার্টির সেক্রেটারী জেনারেল স্টেন এন্ড এ্যান্ডারসনের সঙ্গে সাক্ষাৎ এবং বাংলাদেশের পরিস্থিতি ব্যাখ্যা।

———— সুইডিশ প্রধানমন্ত্রী দেশের বাইরে থাকায় পররাষ্ট্রমন্ত্রী ক্যালবার্গ এবং প্রধানমন্ত্রীর প্রিন্সিপাল সেক্রেটারী পিয়ের শোরীর সঙ্গে সাক্ষাৎকার।

সেপ্টেম্বর ৮ : সুইডিশ সুপ্রীম কোর্টের অস্থায়ী প্রধান বিচারপতি মিসেস ইনগ্রিড গার্ডেওয়াইডেমারের সঙ্গে সাক্ষাৎকার।

———— সুইডিশ পার্লামেন্ট হাউজে লিবারেল পার্টির চীফ হুইপ ইয়ান স্টিফেনসনের সঙ্গে বাংলাদেশের সংগ্রাম নিয়ে আলোচনা।

———— *এক্সপ্রেসেন ইভিনিং ডেইলি* পত্রিকার সম্পাদক টমাস হ্যামানবার্গের সঙ্গে বাংলাদেশ পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা।

সেপ্টেম্বর ৯ : *সভেনসকা ডাগ ব্লাডেট* পত্রিকায় একান্ত সাক্ষাৎকার প্রদান।

সেপ্টেম্বর ১০ : *এ্যাফটন ব্লাডেট* পত্রিকার খ্যাতনামা সাংবাদিক ফ্রেডারিকসেনের সঙ্গে বাংলাদেশ আন্দোলন সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা।

সেপ্টেম্বর ১১-১২ : সুইডেনের বাংলাদেশ এ্যাকশান কমিটির কর্মকর্তা ও কর্মীদের সঙ্গে বাংলাদেশ আন্দোলনের উদ্দেশ্য ও গতিপ্রকৃতি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা।

সেপ্টেম্বর ১৩ : ফিনল্যান্ড। সুইডেন থেকে বিমানযোগে হেলসিংকি যাত্রা।

———— বিশ্ব শান্তি পরিষদের সেক্রেটারী-জেনারেল রমেশচন্দ্রের সঙ্গে সাক্ষাৎ।

সেপ্টেম্বর ১৪ : ফিনিশ টেলিভিশনে সাক্ষাৎকার প্রদান এবং বিস্তারিতভাবে বাংলাদেশ আন্দোলনের উদ্দেশ্য ও তৎকালীন রাজনৈতিক পরিস্থিতি ব্যাখ্যা।

———— পার্লামেন্ট ভবনে গিয়ে বিভিন্ন সদস্যদের সঙ্গে আলোচনা।

———— পররাষ্ট্র দপ্তরের কর্মকর্তাদের সঙ্গে বাংলাদেশ পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা।

———— *সয়োম্যন সোস্তিয়লি ডেমোক্রাত* পত্রিকার সম্পাদক এবং ফিনিশ সুপ্রীম কোর্টের জজ ও জাতি সংঘের মানবাধিকার কমিশনের সদস্য ভ্যাটিওসারিয়োর সঙ্গে সাক্ষাৎ।

———— ডেনমার্ক। বিমানযোগে হেলসিংকি থেকে কোপেনহেগেন যাত্রা।

সেপ্টেম্বর ১৫ : বহুল প্রচারিত সংবাদপত্র *ইনফরমেশন* পত্রিকার সম্পাদক নিয়েলসেনের সঙ্গে সাক্ষাৎ।

———— ডেনিশ পার্লামেন্ট ভবনে গিয়ে স্পীকার এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক দলভুক্ত সদস্যদের সঙ্গে বাংলাদেশ সম্পর্কে আলোচনা।

———— কোপেনহেগেনের একটি টেলিভিশন নেটওয়ার্কে সাক্ষাৎকার প্রদান।

সেপ্টেম্বর ১৬ : জাতি সংঘের আসন্ন অধিবেশনে যোগদানের জন্য মনোনীত ডেনিশ প্রতিনিধি দলের নেতার সঙ্গে সাক্ষাৎ এবং বাংলাদেশ পরিস্থিতি ব্যাখ্যা।

———— *পলিটিকেন* পত্রিকায় সাক্ষাৎকার প্রদান।

———— সাংবাদিক সম্মেলনে বাংলাদেশ পরিস্থিতি ব্যাখ্যা।

———— লন্ডন প্রত্যাবর্তন।

সেপ্টেম্বর ২৩ : জাতি সংঘের আসন্ন সাধারণ অধিবেশনে বাংলাদেশের পক্ষে কাজ করার জন্যে মুজিবনগর সরকার কর্তৃক গঠিত ১৬ জন সদস্য বিশিষ্ট প্রতিনিধিদলের নেতা হিসেবে নিউ ইয়র্ক যাত্রা।

সেপ্টেম্বর ২৩–৩০ : জাতিসংঘের সদর দপ্তরে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধি দলের সঙ্গে সাক্ষাৎ এবং বাংলাদেশ পরিস্থিতি ব্যাখ্যা।

অক্টোবর ১ : জাতি সংঘের ভবনের বিপরীত দিকে অবস্থিত চার্চ সেন্টারে আয়োজিত একটি সাংবাদিক সম্মেলনে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের উদ্দেশ্য ও আদর্শ ব্যাখ্যা।

অক্টোবর ৪ : লন্ডন প্রত্যাবর্তন।

অক্টোবর ২৬ : মারিশাসের কৃষিমন্ত্রী স্যার আবদুর রাজ্জাকের সঙ্গে সাক্ষাৎ এবং বাংলাদেশ পরিস্থিতি ব্যাখ্যা।

অক্টোবর ২৯ : লন্ডন সফররত ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী মিসেস ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে সাক্ষাৎ।

অক্টোবর ৩০ : লন্ডনে অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ ছাত্র সম্মেলনের উদ্বোধন।

নভেম্বর ২৭ : লন্ডন থেকে পুনরায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে গমন।

নভেম্বর ২৮ – ডিসেম্বর ৬ : হার্ভাড, নিউ ইয়র্ক সিটি, কলম্বিয়া এবং ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম সম্পর্কে বক্তৃতা প্রদান।

———— বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত এম আর সিদ্দিকী এবং বাংলাদেশ প্রতিনিধি দলের অন্যান্য সদস্যদের নিয়ে সিনেটর এডওয়ার্ড কেনেডী ও সিনেটর স্যাকসবীসহ কয়েকজন সিনেটর এবং কংগ্রেসম্যান গ্যালাঘারের সঙ্গে বাংলাদেশ পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা।

———— ওয়াশিংটন ডিসি'র একটি টেলিভিশন চ্যানেলে সাক্ষাৎকার প্রদান এবং বাংলাদেশের বিরাজমান পরিস্থিতি ব্যাখ্যা।

———— জাতি সংঘের সদর দপ্তরে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের সপক্ষে প্রচারণা।

ডিসেম্বর ৭–১৬ : জাতি সংঘ সদর দপ্তরে মার্কিন প্রতিনিধি দলের নেতা জর্জ বুশের সঙ্গে সাক্ষাৎ এবং বাংলাদেশ পরিস্থিতি ব্যাখ্যা।

———— জাতি সংঘ কর্তৃক ভারত-পাকিস্তানের মধ্যে যুদ্ধ বিরতির প্রস্তাব আলোচনাকালে জাতি সংঘের সদর দপ্তরে প্রচারিত এক বিবৃতির মাধ্যমে বাংলাদেশের ব্যাপারে জাতি সংঘের ভূমিকা সম্পর্কে মুজিবনগর সরকারের বক্তব্য ব্যাখ্যা।

ডিসেম্বর ২২–২৪ : লন্ডন প্রত্যাবর্তন।

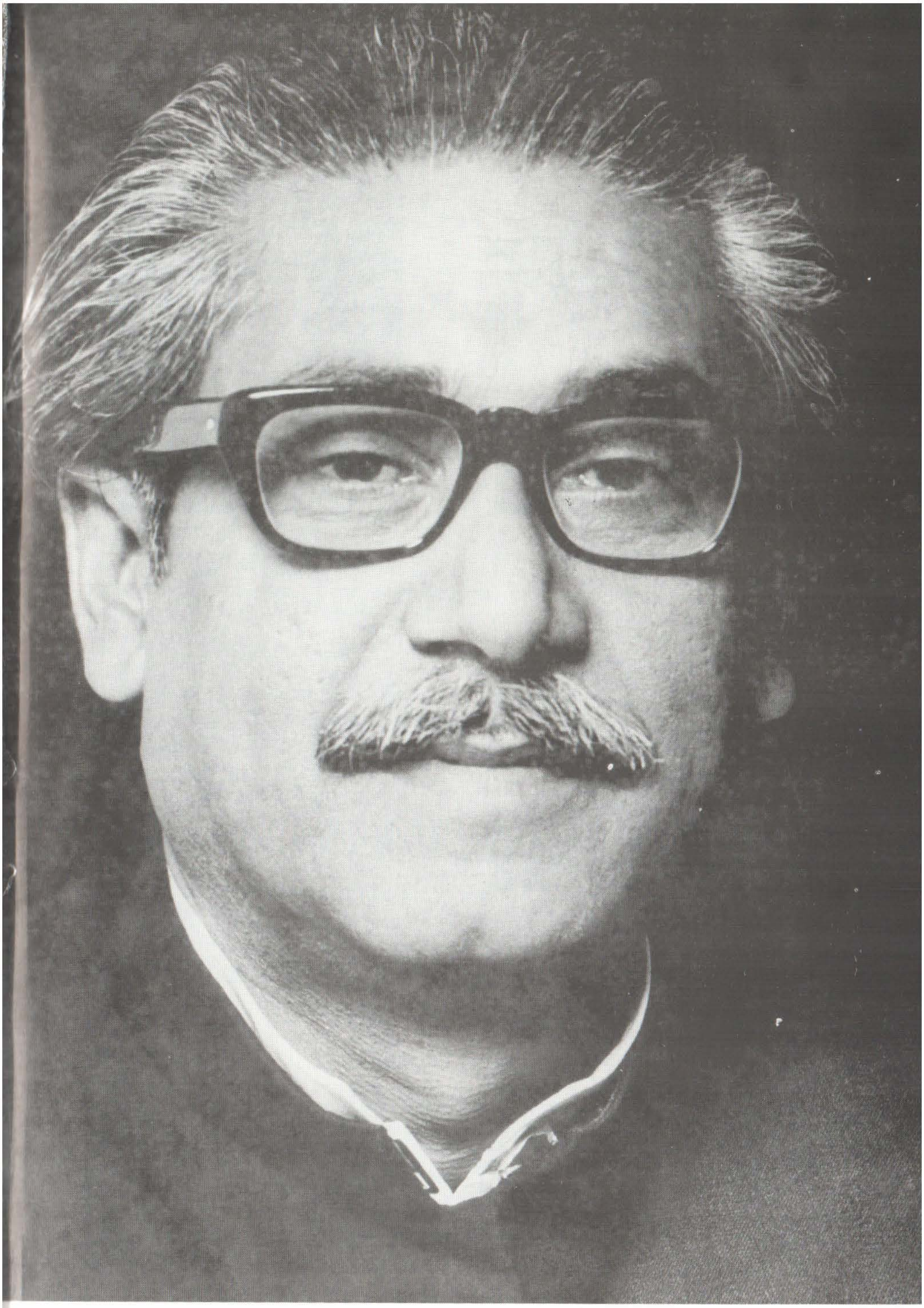
———— বাংলাদেশের অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলামের নিকট থেকে জরুরী তারবার্তা লাভ। এই তারবার্তায় তাঁকে অবিলম্বে দেশে ফেরার জন্য অনুরোধ করা হয়।

জানুয়ারী ২, ১৯৭২ : লন্ডনের হাইড পার্কে বাংলাদেশ স্টিয়ারিং কমিটির উদ্যোগে আয়োজিত বিরাট জনসভায় স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশগ্রহণকারী প্রবাসী বাঙালী ও সমর্থনকারী বিটিশ নাগরিকদের অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন।

———— বাংলাদেশ ফান্ডের জন্য সংগৃহীত অর্থের সংক্ষিপ্ত হিসাব প্রদান।

জানুয়ারী ৬ : অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলামের অনুরোধে ঢাকার পথে লন্ডন ত্যাগ।

জানুয়ারী ১২ : গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের রাষ্ট্রপতি হিসেবে শপথ গ্রহণ।



স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম রাষ্ট্রপতি, মুক্তিযুদ্ধের সর্বাধিনায়ক,
জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

মুজিবনগর সরকার



সৈয়দ নজরুল ইসলাম, অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি



তাজউদ্দিন আহমদ, প্রধানমন্ত্রী



ক্যাপ্টেন এম মনসুর আলী, অর্থমন্ত্রী



এ এইচ এম কামরুজ্জামান, ত্রাণ ও পুনর্বাসন মন্ত্রী



জেনারেল এম এ জি ওসমানী, মুক্তিবাহিনীর প্রধান সেনাপতি



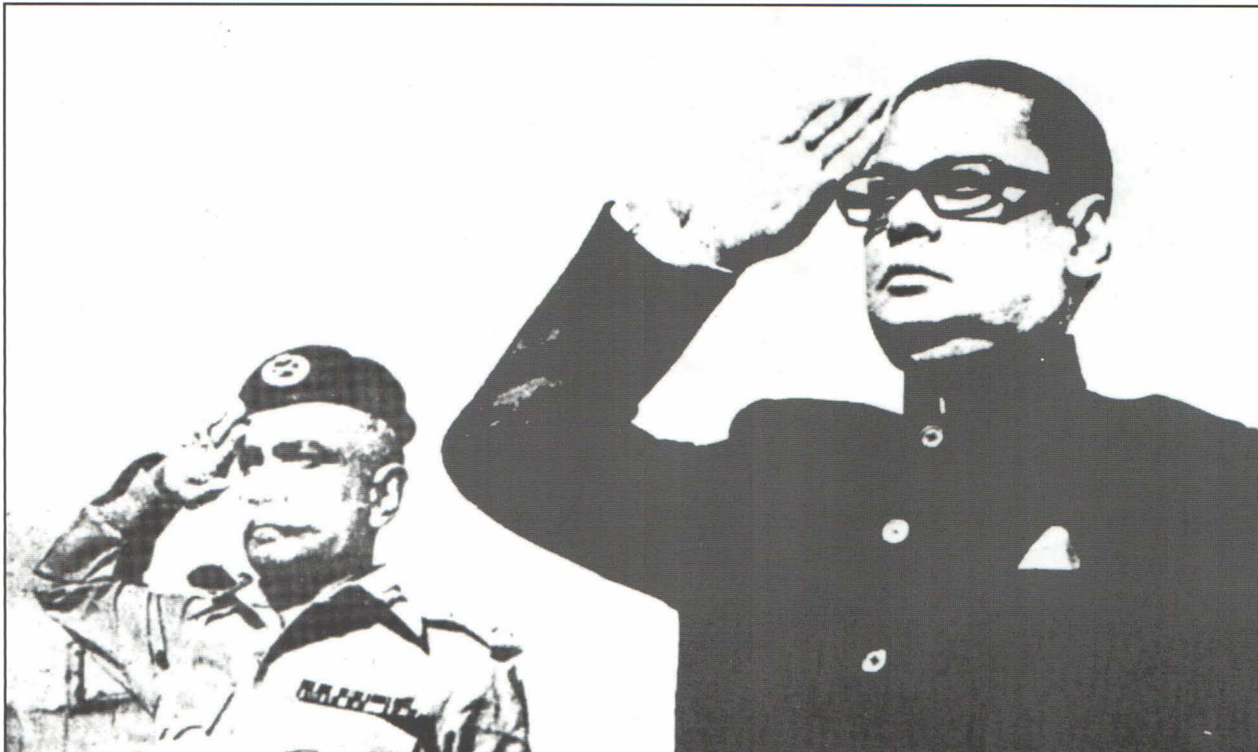
'৭১-এ গণহত্যা



লন্ডনের হাইড পার্কে ভাষণদানরত লেখক



বঙ্গবন্ধুকে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথবাক্য পাঠ করাচ্ছেন লেখক



স্বাধীনতা দিবসে জেনারেল ওসমানী ও লেখক



লেখকের স্বাধীনতা-উত্তর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন



লন্ডনের ২৪ নং পেমব্রিজ গার্ডেনে বাংলাদেশ মিশন উদ্বোধন প্রাক্কালে লেখক